সমুদ্রতীরে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০ / এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

☐ প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৬৩

☐ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

☐ মুদ্রাকর : অনিল কুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

☐ প্রচ্ছদ : অনুপ রায়

জানলা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়ে মনে হলো, এখন আর ঘরে বসে থাকার কেনো মানে হয় না। বিকেল শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আকাশের আলো মিলিয়ে যায়নি।

আজ সারা দুপুর বইয়ের পাতায় ডুবে ছিলাম। এক একদিন পড়াশোনায় খুব মন বসে যায়, এক একদিন কিছুটা অস্থির ভাব থাকে। আজ খুব বেশি হাওয়া ছিল না, গরমও ছিল না। বই পড়তে পড়তে আজ একবারও খেয়াল হয়নি যে কাছেই একটা সমুদ্র আছে।

বেরুবার আগে জানলা দুটো মনে করে বন্ধ করে দিতে হয়, নইলে হাওয়ায় সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। টেবিলের ওপর গোটা চারেক কলা পড়ে আছে, খোসার ওপর কালচে-কালচে ছোপ পড়েছে। এগুলো ফেলে দেওয়াই ভালো। আমি কলা তেমন একটা ভালোবাসি না, তবু কিনেছিলাম অসম্ভব সস্তা বলে। ছ'খানা মর্তমান কলার দাম মাত্র এক টাকা।

কলাগুলো হাতে নিয়ে বেরুতে গিয়ে আমি একটু হাসলাম। মানুষ একা একা নিজের কাছেও মিথ্যে বলে! শুধু শস্তাই বলেই কি আধডজন কলা কিনেছিলাম? না, তা ঠিক নয়।

কিশোর কলা বিক্রেতাটি এসে বসেছিল বাঁচের ওপর। সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজকেও ছাড়িয়ে সে তীক্ষ্ম কণ্ঠে চিৎকার করছিল, কেলা, কেলা, কেলা! আস্তে আস্তে ছোটাখাটো একটা ভিড় জমে গেল তাকে কেন্দ্র করে। আমি তখনও যাইনি, বসেছিলাম তটরেখার একেবারে ধার ঘেঁসে। চমৎকার রোদ-ঝকঝকে সকাল। খুব জোর হাওয়া তখন। এরকম প্রবল হাওয়ায় মেয়েরা শাড়ি সামলাতে খুব বিব্রত হয়ে পড়ে, দেখতে বেশ লাগে।

সেই মেয়েটি, তার নাম চন্দ্রা, সে-ও দাঁড়িয়েছিল কলাওয়ালার

সামনে। তার সবুজ রঙের শাড়ির আঁচলটা উড়ছিল পত পত করে। সকালবেলার পক্ষে বড়ো বেশি উজ্জ্বল রঙ তার শাড়ির। তবে ওরা ঐরকমই বেশি রঙচঙে, ঝলমলে পোশাক পরে, সকালবেলাতেও প্রসাধন না করে বাইরে বেরোয় না।

চন্দ্রা এক হাতে ধরেছিল উড়ন্ত আঁচল, অন্য হাতে এক থোকা কলা। 'থোকা' কথাটা বোধহয় ঠিক হলো না, ফুলের থোকা হয়, কলার কি হয়? সবুজ শাড়ি পরা চন্দ্রার হাতে সেই নিখুঁত হলুদ রঙের কলাগুলো ফুলের মতনই দেখাচ্ছিল। রঙের সেই সমন্বয় আমার পছন্দ হলো। সেই দৃশ্যটার কাছাকাছি যাওয়ার জন্যই আমার কলা কেনার কথা মনে হয়েছিল। আমি চন্দ্রার একেবারে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

চন্দ্রার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা।

বাইরে এসে কলাগুলো ফেলতে গিয়েও মনে হলো, এখনো ঠিক পচেনি শুধু শুধু নষ্ট না করে খেয়ে নিলেও তো হয়। একটার খোসা ছাড়িয়ে খানিকটা মুখে দিয়েই ফেলে দিলাম থুঃ থুঃ করে। পচে যায়নি বটে কিন্তু বেশি মজে গেছে, তলতলে ভাব, এই স্বাদটা আমার ঘোরতর অপছন্দ। নাঃ, খাওয়া যাবে না।

অনেক সময় কাছাকাছি ভিখিরিরা ঘুর ঘুর করে। তাদের কারুকে দিয়ে দেওয়া যেত। এখন কেউ নেই।

চন্দ্রাকে আমি বলেছিলাম, আমার জন্য কয়েকটা বেছে দাও তো।

চন্দ্রা নিজের হাতে এই কলাগুলো তুলে দিয়েছিল। আমি তার হাতের আঙুল ও স্বর্ণাভ মুখখানা দেখছিলাম।

তিন দিনেই কলাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বালির ওপর। তারপর আবার এগিয়ে গিয়ে সেগুলো তুলে একটু-খানি ডান দিকে যেতে হলো। সেদিন ঠিক এই জায়গায় বসেছিল কলাওয়ালাটি। বালির ওপর কারুর পায়ের ছাপ থাকে না, কিন্তু চন্দ্রা কোথায় দাঁড়িয়েছিল, তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেখানেই ফিরিয়ে দিলাম কলাগুলো।

॥ ২ ॥

সমুদ্রে সূর্যাস্ত আমার দেখতে ভালো লাগে না। বড়ো বেশি জমকালো। ক্যালেণ্ডারের ছবির মতন। বরং সূর্য ডুবে যাবার পর যে কিছুক্ষণ মধুর-বিষণ্ন আলো, তখনকার আকাশের দিকে চোখ চলে যায়। এই আলোটা গায়ে মাখলেও বেশ আরাম বোধ হয়।

এরপর অন্ধকার হয়ে গেলে ঢেউয়ের ফণাগুলো জ্বলবে। গোপালপুরে আমি যতবার এসেছি, রাত্তিরের দিকে ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলতে দেখেছি। মাইকেলের সেই লাইনটা মনে পড়ে যায়, 'কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ···।" মাইকেলের আসল লাইনটা ছিল সমুদ্রের প্রতি বিদ্রূপের, এখানে সেটা প্রশস্তি হয়ে যায়।

চটি খুলে রেখে আমি জলে পা দিলাম। ঢেউ এসে পায়ের ওপর ঝাপটা মারে, আবার সরে যায়। এই সময় নিজেকে বেশ রাজা রাজা মনে হয়। এত বড় সমুদ্র, সে আমার পায়ে এসে লুটোচ্ছে। আমার পাদবন্দনা করে যাচ্ছে।

একজন ভদ্রলোক এই অসময়ে জাঙ্গিয়া পরে স্নান করতে নামছেন। আমার পাশ দিয়ে খানিকটা জলের মধ্যে এগিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর কিছু শুনলেন?

আমি দু'দিকে ঘাড় নাড়লাম।

এখন আর এখানে দাঁড়াবার কোনো মানে হয় না। একজন মাঝ বয়েসী পুরুষের স্নানের দৃশ্য কে দেখতে চায়?

সাদা ফেনা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি হাঁটতে লাগলাম ডান দিকে। কিছু কিছু মানুষজন বসে আছে বালির ওপর। অনেকেরই মুখ চেনা। আকাশ শুষে নিচ্ছে শেষ আলো, মুখগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

হঠাৎ খেয়াল হলো, আমি পাম বীচ হোটেলের দিকে যাচ্ছি কেন? উল্টোদিকে জেলেদের বস্তির দিকে গেলে ভালো হতো। কিন্তু এদিকে চলে এসেছি অনেকটা।

পাজামার ওপর পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে পড়েছি, পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, টাকা-পয়সার খামটা রয়েছে। আমার মানি ব্যাগ বা যাকে পার্স বলে, তা ব্যবহার করার অভ্যেস আজও হলো না। পাম বীচ হোটেলে গিয়ে চা খাওয়া যেতে পারে, ওরা চিকেনপ্যাটিও খুব ভালো বানায়। কিন্তু ওখানে গেলে সিনেমার লোকজনদের সঙ্গে দেখা হবেই, তাদের সঙ্গে গল্প করতে হবে।

কিংবা তাদের সঙ্গে গল্প করার লোভেই কি আমি এদিকে চলে এসেছি? কৌতূহল আমাকে টেনে এনেছে?

আমি গোপালপুরে পেঁছিবার পর দিন তিনেক জায়গাটা বেশ নিরিবিলি ছিল। এখানে কোনো তীর্থস্থান নেই, কখনো খুব বেশি ভিড় হয় না, সেটাই গোপালপুরের বৈশিষ্ট্য।

এখানে এসে আমি কখনো হোটেলে উঠি না। অনেক কটেজ ভাড়া পাওয়া যায়। খুব ছোটবেলায় যখন প্রথমবার আসি, তখন প্রচুর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দেখেছি। আমার শৈশবের চোখে তারা ছিল সাহেব-মেম। বুড়ো-বুড়ি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা এখানে বাড়ি বানিয়ে শেষ জীবন কাটাতো, একখানা-দু'খানা ঘর ভাড়া দিত। এখন তারা আর নেই।

অনেক বাড়ির ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ে। দেয়াল ভাঙা, জানলা-দরজা নেই। কোস্ট লাইন খানিকটা এগিয়ে এসেছে, জোয়ারের সময় প্রথম সারির অনেক বাড়িতে ছলাত ছলাত করে ঢেউ ধাক্কা মারে।

আমি একটা পুরো বাড়িই ভাড়া নিয়েছি, কারণ একা থাকাই আমার উদ্দেশ্য। যখন ইচ্ছে হবে না, কারুর সঙ্গে কথা বলবো না, কোনো মানুষের মুখও দেখবো না। রান্নাবান্নারও ঝামেলা রাখিনি। বেশ কাছেই একটা গেস্ট হাউস রয়েছে। গোটা ছয়েক পরিবার থাকার মতন, সেখানে বললেই চা থেকে সব কিছু পাঠিয়ে দেয়। একটি তেলেঙ্গি স্ত্রীলোক দু'বার আমার ঘর ঝাঁট দিয়ে, খাবার জল তুলে দিয়ে যায়। তার স্বামীই বাড়িটির কেয়ারটেকার। স্বামীটি মাছ ধরার নৌকো নিয়ে চলে যায় সমুদ্রের অনেকখানি গভীরে।

তিন দিন পর সিনেমার বিরাট দলটি এসে উঠলো পাম বীচ হোটেলে। তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, হোটেলটাও

বেশ দূরে, তবু বেশ বিরক্ত বোধ করেছিলাম আমি। তারা যে খুব একটা হৈ-হট্টগোল করে তাও না। কিন্তু এই ছিমছাম নিরিবিলি জায়গায় একসঙ্গে অনেক লোক এসে পড়েছে, যখন তখন গাড়ি হাঁকিয়ে তারা ঘোরাঘুরি করছে। এটাই যেন অসহ্য বোধ হয়।

সিনেমার শুটিং-এর মতন বিরক্তিকর জিনিস আমি কখনো দেখতে যাই না। মনে আছে, একবার থাকতে গিয়েছিলাম চিল্কার এক গেস্ট হাউজে। খুবই সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু হঠাৎ পরদিন সেখানে শুরু হলো একটা তামিল ফিলমের শুটিং। একটা গান বাজানো হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা যুবতী নাচ দেখাবে। সেই গান বারবার বাজানো হচ্ছে, যুবতীটি বারবার নাচতে শুরু করছে, আর পরিচালক হেঁকে উঠছে কাট, কাট! একই গান, একই নাচ, শুরু হচ্ছে আর থামছে, এই রকম চললো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সেই দিনই বিকেলে আমি পালিয়েছিলাম চিল্কা থেকে।

এখানেও একদিন শুটিং হচ্ছিল আমার বাড়ির খুব কাছেই। আমার দেখতে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। এরা অবশ্য মাইকে গান-টান কিছু বাজাচ্ছে না, জলের ধারে প্রেমালাপের দৃশ্য, তারপর স্নান। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আমি একবার শুটিং পার্টি'টি দেখেই জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর আর কিছুতেই লেখাপড়ায় মন বসে না। জানলা বন্ধ, তবু যেন আমি দেখতে পাচ্ছি, ক্যামেরা, লোকজন, নায়ক-নায়িকা। সে এক মহা জ্বালা।

পরদিন আমি দুপুরে স্নান করতে নেমেছি, তখনই আবার কাছাকাছি এসে উপস্থিত হলো সিনেমার দলবল।

সেদিন আবার জলের মধ্যে মারামারির দৃশ্য। ওরা অন্য লোক-জনদের সরিয়ে দিচ্ছে। আমি বেশ রেগে গিয়ে রোঁয়া ফোলাচ্ছি। আমাকে একবার সরে যেতে বলুক না, দেখিয়ে দেবো মজা। আমি স্নান করতে এসেছি, আমার যখন ইচ্ছে উঠবো। এই সমুদ্রটা সিনেমার লোকদের বাবার সম্পত্তি নয়। ওরা ফাঁকা জায়গায় যাক না!

কিন্তু ঘটনাটা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল।

সাদা টুপি পরা একজন লোক আমার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে, সুনীলবাবু না? কবে এসেছেন আপনি?

সঙ্গে সঙ্গে রাগের বদলে আমাকে পেয়ে বসলো একরাশ লজ্জা। এখন মেয়েদের সামনে দিয়ে আমাকে খালি গায়ে উঠতে হবে।

॥ ৩ ॥

পাম বীচ হোটেলের আলো দেখা যাচ্ছে, ওখানে যাবো কিনা এখনো মনঃস্থির করতে পারছি না। এক এক সময় মানুষের সংসর্গের জন্য মন আনচান করে, তবু মানুষের কাছাকাছি যেতে ইচ্ছে করে না। মুখটা ফেরাতেই চমকে উঠলাম। শুধু চমক নয়, বুকটা ধক করে উঠলো। ঠিক ভয়ের অনুভূতি।

একটা ডিঙি নৌকো গলুইয়ের কাছে বসে আছে একটি মেয়ে। কালো রঙের শাড়ি পরা। কিংবা শাড়ির রঙ গাঢ় নীলও হতে পারে। মুখটা জলের দিকে, আমি দেখতে পাচ্ছি না।

প্রথমে আমার মনে হয়েছিল চন্দ্রা, এবং সেই জন্যই ভয় পেয়েছিলাম। অথবা চন্দ্রা হতেই পারে না। চন্দ্রা যদি ফিরে আসে কোনোক্রমে, তাহলে কি আমি ভয় পাবো?

অবিকল চন্দ্রার মতন ভঙ্গিমায় এখানে এখন কে বসে থাকতে পারে? এই দৃশ্যটার মধ্যে বেশ অস্বাভাবিকতা আছে। প্রায় অলৌকিকের কাছাকাছি। এই সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই, তবু বুক তো কেঁপে উঠলো একবার।

আমি এতখানি রাস্তা হেঁটে আসছি, নৌকোগুলোতে আগেই দেখেছি, কেউ ছিল না। মেয়েটি হঠাৎ কী করে এলো? ঠিক আছে, ধরা যাক, ওর নীল রঙের শাড়ি অন্ধকারে মিশে গেছে বলে ওকে আমি আগে দেখতে পাইনি। তাহলেও, সন্ধ্যের পর কোনো মেয়ে তো এখানে এমনভাবে একা বসে থাকে না। স্থানীয় মেয়ে নয়, কোনো জেলের বউ নয়, মেয়েটির দু' হাঁটু জড়িয়ে বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যেই একটা শহুরে ছাপ আছে।

তীব্র কৌতূহল আমাকে টেনে রেখেছে, জায়গাটা ছেড়ে নড়তে পারছি না। হাওয়া বাঁচিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম।

নৌকোগুলোর তলায় জলের ছলাত ছলাত শব্দ হচ্ছে, জল বাড়ছে। শুরু হয়েছে জোয়ার। যে-নৌকোগুলোর অর্ধেক বালির ওপর ওঠানো থাকে, জোয়ারের সময় সেগুলোই অনেকখানি জলের মধ্যে চলে যায়। মেয়েটি কি তা জানে না?

তিনদিন আগে সন্ধ্যের সময় চন্দ্রাও এরকমভাবে একা বসে ছিল একটা নৌকোয়।

কাছাকাছি আর কোনো মানুষজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, একটি মেয়েকে দেখে আমি থমকে গিয়ে সিগারেট টানছি, এটা বেশ বিসদৃশ ব্যাপার।

তবু আমার মনে হলো মেয়েটিকে সাবধান করে দেওয়া উচিত। আমি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে এগুতেই মেয়েটি নেমে পড়লো নৌকো থেকে। আমার উপস্থিতি সে টের পেয়েছে কিনা বোঝা গেল না, একবারও তাকালো না পেছন ফিরে, সোজা হাঁটতে লাগলো জলের ধার ঘেঁসে।

এরপর আর মেয়েটিকে অনুসরণ করা যায় না।

তবু আমি তাকিয়ে রইলাম সেই অপাস্রিয়মাণ নারীর দিকে। মেঘলা আকাশ, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবু আকাশের কিছুটা নিজস্ব আলো আছে। একসময় মেয়েটি কি জলে নামতে শুরু করলো না অন্ধকারে মিলিয়ে গেল? স্পষ্ট মনে হলো, মেয়েটি সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে, হাঁটু জল ছাড়িয়ে বুক জলে, তারপর ডুব দিল, আর উঠলো না।

আমি সেদিকে ছুটে যাবার জন্য উদ্যত হয়েও থেমে গেলাম। এসব কী ছেলেমানুষি করছি আমি? একটা মেয়ে সত্যি সত্যি জলের মধ্যে নেমে মিলিয়ে যেতে পারে? জলকন্যা? ভূত? যতই অবিশ্বাস করি, তবু ভেতরে ভেতরে কিছু সংস্কার রয়েই গেছে। ওসব কিছু না! ওদিকটায় খানিকটা কুয়াশা জমেছে। মেয়েটি কুয়াশার আড়ালে চলে গেল। তা ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না।

নিজের এরকম দুর্বলতায় নিজের ওপরে চটে গেলাম খুব।

এই অবস্থায় আর কারুর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাওয়া যায় না। অন্যদের কাছেও আমার দুর্বলতা ধরা পড়ে যেতে পারে।

॥ ৪ ॥

রবীন ঘোষ যে একজন পুলিশ অফিসার, সে কথা তিনি আমার কাছে একবারও গোপন করেননি। যদিও অন্য আর কেউই বোধহয় তা জানে না। ভদ্রলোক এখানে সপরিবারে ছুটি কাটাতে এসেছেন। ওঁর স্ত্রীর কিছু একটা অসুখ আছে। যদিও ওঁর স্ত্রী প্রতিমা বেশ বিদুষী ও পরিচ্ছন্ন চেহারার মহিলা, কথা-বার্তায় কোনো আড়ষ্টতা নেই, অসুস্থ বলেও বোঝা যায় না। ওঁদের সঙ্গে দশ বছরের মেয়েও এসেছে, বড় ছেলে হস্টেলে থাকে।

রবীন ঘোষ ইংরিজি সাহিত্যের খুব ভক্ত। দুর্গাপুরে কোনো একটা সভায় উনি আমাকে দেখেছিলেন, সামান্য পরিচয়ও হয়েছিল, আমার অবশ্য সে কথা একেবারেই মনে নেই। আমি পুরুষদের মুখ মনে রাখতে পারি না। এখানে ওঁরা উঠেছেন পাশের গেস্ট হাউসে, একদিন নিজে থেকেই আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে।

প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে আপনি কিছু লিখতে এসেছেন বুঝি? নতুন উপন্যাস?

আমি উত্তর না দিয়ে হেসেছিলাম। লোককে বোঝানো শক্ত। লেখার জন্য আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হয় না, নির্জনতাও খুঁজতে হয় না। নিজের বাড়িতে কিংবা অফিসে নানা গোলমাল, হৈচৈ, লোকজনের আসা যাওয়া, দরজার বেল, টেলিফোনের যখন তখন ঝংকার, স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি, বাজার করা, নাটকের রিহার্সাল দেওয়া, এর মধ্যেও দিব্যি লেখা এগিয়ে চলে। কিন্তু কখনো কখনো আমার না-লেখা নিজস্ব সময় দরকার। লেখার থেকে পুরোপুরি ছুটি নেবার জন্যই নির্জনতা খুঁজি। যখন এই রকম বাইরে চলে আসি একা, সঙ্গে কাগজ-কলমও রাখি না। কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি একজন লেখক বটে, কিন্তু আমার কোনো কলম নেই।

গেস্ট হাউজে আমার খাবারের কথা বলতে গেলে রবীন ঘোষ আমাকে ধরে ফেললেন।

উনি অবশ্য একেবারেই জোর করেন না, কথা বলেন মৃদু গলায়। বললেন, আসুন, ওপরে গিয়ে একটু বসা যাক। পরে এক সময় খেয়ে নিলেই হবে।

গেস্ট হাউজটি দোতলা। রবীনবাবুরা একটা সুন্দর সুইট পেয়েছেন। শোবার ঘরের সংলগ্ন একটা বেশ চওড়া বারান্দা, সেখানে বসলে সমুদ্রের সম্পূর্ণ বিস্তার দেখা যায়।

প্রতিমা আগে থেকেই সেখানে একটা বেতের চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গান গাইছিলেন।

এসব ক্ষেত্রে ভদ্রতা করে বলতে হয়, থামলেন কেন? আপনার তো বেশ ভালো গলা। গানটা করুন।

প্রতিমা তবু গান থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বললেন, কিছু কিছু গান থাকে একলা গাইবার। ও আপনাকে নিশ্চয়ই গল্প করার জন্য টেনে এনেছে, বউয়ের গান শোনাবার জন্য নয়।

আমি আর জোর করলুম না। সত্যিই তো কিছু কিছু গান মানুষ শুধু নিজেকে শোনাবার জন্যই গায়।

রবীনবাবু আমাকে ডেকে আনায় খুশিই হয়েছি। আমি মানুষের সঙ্গ চাইছিলাম, কিন্তু নিজে থেকে কারুর কাছে যেতে পারি না এটা আমার স্বভাব-দোষ। কেউ ডাকলে মনে হয়, এই ডাকের প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

ওদের মেয়েটি বসবার ঘরে খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করছে।

আমরা বারান্দায় বসার পর প্রতিমা একটা ছোট টেবল এনে রাখলেন, তারপর নিয়ে এলেন গেলাস, জলের জাগ ও হুইস্কির বোতল।

রবীনবাবু বললেন, নীচে ওদের বললে সোডা পাওয়া যেতে পারে।

প্রতিমা আমার দিকে তাকাতেই আমি বললাম, আমার সোডার দরকার নেই।

প্রতিমা তিনটি গেলাসে হুইস্কি ঢাললেন।

আগেই একদিন লক্ষ করেছি যে ওঁকে মদ খাওয়াবার জন্য পেড়া

পিড়ি করতে হয় না, উনি নিজেই নিজেরটা নিয়ে নেন। কিন্তু একবারই। মদ্যপান বিষয়ে ওঁর কোনো সংস্কার নেই, অথচ নেশাও করতে চান না।

দূরের অন্ধকার সমুদ্রের ঢেউগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কারণ তাদের মাথায় দুলছে ফসফরাসের মালা। বেশ দেখায়। এদিকে জাহাজ চলাচল করে কদাচিৎ। একদিন শুধু একটা আলো ঝলমল জাহাজ দেখা গিয়েছিল এর মধ্যে। রাত্রিরবেলা জাহাজ দেখার জন্য আমি ছেলেমানুষের মতন উৎসুক হয়ে থাকি।

রবীনবাবু বললেন, ওরা আজ থেকে আবার শুটিং শুরু করেছে, জানেন তো?

কথাটা আমার একটা আঘাতের মতন লাগে। আবার শুটিং শুরু হয়ে গেছে? পরিচালক সন্তোষ মজুমদারের সঙ্গে আমার সকালেই একবার দেখা হয়েছিল, উনি তখন কিছু বলেননি।

রবীনবাবু বললেন, এখন ওরা হোটেলের মধ্যেই কিছু কিছু শট নেবে। পরশু থেকে আবার আউটডোর।

রবীন ঘোষ আর্ট ফিলমের ভক্ত। পৃথিবীর নানান দেশের ভালো ভালো ফিলমের খবরাখবর রাখেন। সেইজন্যেই শুটিং-এর ব্যাপারে ওঁর খুব উৎসাহ। যদিও সন্তোষ মজুমদার যে-ফিলমের শুটিং-এর জন্য গোপালপুরে এসেছেন, সেটা একটা রদ্দি গল্প। ওঁদের ধারণা, এই সব ছবি কমার্শিয়াল হিট করবে, আবার এই সব ছবিই রিলিজ করার পর দু এক সপ্তাহের মধোই উঠে যায়। সন্তোষ মজুমদার আমার একটা গল্প নিয়ে ফিল্ম করতে চেয়েছিলেন, প্রথমেই বলেছিলেন, আমি দাদা প্রাইজ ফ্রাইজ পাওয়ার জন্য কিংবা ফরেনে যাবার জন্য সিনেমা তুলি না, আমি চাই দর্শকদের খুশি করতে। বেশ কয়েকদিন আমার বাড়িতে যাওয়া-আসা করেছিলেন উনি, আমার কয়েকটি সকালের কাজ নষ্ট করলেন, এক হাজার টাকা অ্যাডভান্স দেওয়ালেন এক বাচ্চা প্রোডিউসারকে দিয়ে, তারপর হঠাৎ একদিন সবাই অদৃশ্য, সে ফিল্মের মহরতও হলো না। সিনেমা-জগতে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। সন্তোষ মজুমদার মানুষটিকে অবশ্য আমার খারাপ লাগে না, বেশ খোলামেলা, হাসি-

খুশি ধরনের, নিজের বোকামি কিংবা মূর্খতা চাপা দেবারও কোনো চেষ্টা নেই।

প্রতিমা বললেন, আমরা ভেবেছিলাম, ওরা বুঝি দলবল নিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু সিনেমা তোলা তো অনেক টাকার ব্যাপার, শুটিং বন্ধ করে দিলে প্রচুর ক্ষতি হয়ে যাবে। টাকার হিসেব করলে মানুষের সেন্টিমেন্টের কোনো দাম নেই।

রবীনবাবু বললেন, চন্দ্রার বডি এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ অবশ্য ম্যাড্রাস থেকে আরও দু'জন ডুবুরি আনাচ্ছে। তবে, এর মধ্যে তিনটে জোয়ার-ভাটা হয়ে গেছে, এর পর বডি রিকভার করার আশা খুব কম।

প্রতিমা ধমক দিয়ে বললেন, অ্যাই! তুমি আবার পুলিশি ভাষায় কথা বলছো? তোমায় এখানে ডিউটিতে পাঠানো হয়নি। তোমায় বলেছি না, তুমি ঐ নিয়ে একদম মাথা ঘামাবে না। এটা স্বর্গ নয়, তুমিও ঢেঁকি নও!

রবীনবাবু হেসে ফেলে বললেন, ডিউটি না করলেও সাধারণ কৌতূহল থাকবে না? এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেল···এই যে সুনীলবাবু, ওঁরও কি কৌতূহল নেই? আচ্ছা সুনীলবাবু, আপনি ঠিক করে বলুন তো, আপনার মতে, এটা খুন না আত্মহত্যা?

আমি বললুম, কী জানি, আমি এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রবীনবাবু বললেন, তবু, মনে মনে একটা কিছু ধারণা তো তৈরি হয়। সেটাই বলুন না। আপনার মতামতের একটা মূল্য আছে।

আমি বললুম, কেন? আমার মতামতের আবার কিসের মূল্য?

রবীনবাবু বললেন, আপনি মানুষের চরিত্র স্টাডি করেন তো। সামারসেট মম তাঁর আত্মজীবনীতে কী লিখেছেন জানেন? লেখক, ইস্কুল মাস্টার আর ডিটেকটিভ, এদের মধ্যে একটা মিল আছে। এরা মানুষের চরিত্র ভালো বোঝে।

প্রতিমা বললেন, এখানে একজন মাস্টারও রয়েছে।

রবীনবাবু বললেন, ও হ্যাঁ, তাই তো!

তখনই আমি জানলাম যে প্রতিমা একটি কলেজের অধ্যাপিকা। তিনি দর্শন পড়ান।

রবীনবাবু বললেন, তা হলে আমরা তিনজনে মিলে এই ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার একটা বিশ্লেষণ করতে পারি। পুলিশ হিসেবে এই তদন্তে আমার কোনো ভূমিকা নেই, কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে কৌতূহল তো থাকবেই। আচ্ছা, সুনীলবাবু আপনিই আগে বলুন, আপনার ইনটুইশন কী বলছে, এটা খুন না আত্মহত্যা?

আমি মাটির দিকে চেয়ে রইলাম। চন্দ্রাকে আমি ভালো করে চিনিই না। গোপালপুর আসবার আগে তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না, কোনো ফিলমেও তার অভিনয় দেখিনি। সন্তোষ মজুমদার আমার সঙ্গে চন্দ্রার পরিচয় করিয়ে দিলেন, সেদিন পাম বীচ হোটেলে ফিল্ম ইউনিটের সঙ্গে আমাকে খেতে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। চন্দ্রা তখন বসে ছিল আমার ঠিক পাশে। চন্দ্রা এই ফিলমের নায়িকা নয়, নায়কের ছোট বোন, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নয়, তবে কাহিনীর ভিলেন একবার তাকে কিডন্যাপ করবে, তারপর নায়ক এসে বীরত্ব দেখাবে। এই ফিলমের নায়িকার চেয়ে কিন্তু চন্দ্রা অনেক বেশি রূপসী।

আমার পাশে বসেছিল বলেই চন্দ্রার সঙ্গে আমার ভাব জমে গিয়েছিল তাড়াতাড়ি। সে বইটই পড়ে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম. এ পাশ করেছে। তা ছাড়া সে হাসতে জানে, সমস্ত মজার কথায় সে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

যাদের রসবোধ আছে, যারা জীবনের উপভোগটাকে বেশি মূল্য দেয়, তারা কি আত্মহত্যা করে?

আমি বললাম, চন্দ্রার মতন মেয়ে আত্মহত্যা করবে, এটা আমার কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সবেমাত্র তার ফিলম কেরিয়ার শুরু হয়েছে, সামনে ভবিষ্যৎ পড়ে আছে।

রবীনবাবু বললেন, বয়েসটা তো অল্প, এই বয়েসের মেয়েরা খুব ইমোশনাল আর ইমপালসিভ হয়, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু একটা করে ফেলতে চায়। এর মধ্যে আবার ব্যর্থ প্রেমের অ্যাঙ্গেল আছে কি না, তা অবশ্য জানা যায়নি এখনো।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, না, না, ব্যর্থ প্রেম ট্রেম···ফিল্মের মেয়েরা কি সেসবের কোনো গুরুত্ব দেয় ? চন্দ্রার ব্যবহারে আমি সেরকম কোনো ছায়া দেখিনি, নাঃ, আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। চন্দ্রা এমন প্রাণ খুলে হাসে, ঠিক ব্রুড করার টাইপই নয়।

প্রতিমা বললেন, আপনি চন্দ্রা সম্পর্কে পাস্ট টেন্‌স ব্যবহার করছেন না। আপনি এখনো চন্দ্রার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেন নি, তাই না ?

আমি অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সন্ধ্যেবেলা নৌকোর ওপর বসে থাকা নীল শাড়ি পরা রহস্যময়ীর কথা কিছুতেই এঁদের সামনে বলবো না ঠিক করে ফেলেছি।

চন্দ্রার জলে-ডোবা শরীর কেউ এখনো দেখেনি। অমন সুন্দর একটি যৌবনবন্ত শরীর শেষ পর্যন্ত মাছেদের খাদ্য হলো ?

রবীনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ন্যাটালি উডের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই ? ন্যাটালি উডের ঘটনাটা জানেন ?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই প্রতিমা বললেন, ন্যাটালি আবার কী ? মেয়েটির নাম নেটালি উড। ওয়েস্ট সাইড স্টোরির নায়িকা ছিল।

রবীনবাবু ঈষৎ ক্ষুণ্ণভাবে বললেন, আবার তুমি মাস্টারি শুরু করলে ? আমিও যেমন এখানে পুলিশ অফিসার নই, তুমিও মাস্টারণী সাজতে পারবে না। বাঙালীরা ন্যাটালিই বলে। উচ্চারণের ব্যাপারে অত খুঁতখুঁতে হবার কী আছে ? বিদেশীরা আমাদের নামের উচ্চারণ ভুল করে না ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, নেটালি উড···সেও জলে ডুবে মারা গিয়েছিল না ?

একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে রবীনবাবুর চলচ্চিত্র জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি হলিউডের চিত্রতারকাদের জীবনীর খুঁটিনাটিরও খবর রাখেন।

তিনি বললেন, লস এঞ্জেলিস শহরে প্যাসিফিক মহাসাগর, জেটি ঘাটে অনেক অল্প বয়েসী ছেলেমেয়ে সার্ফিং করে, পাল তোলা নৌকোও বাঁধা থাকে, অনেক লোকেরই প্রাইভেট বোট থাকে জানেন নিশ্চয়ই, আপনি তো ওদেশে গেছেন, তাই না, আমি যাইনি

অবশ্য, কিন্তু এত ছবি দেখেছি, তা ন্যাটালি···ওঃ, ন্যাটালি না, নেটালি উড একদিন শুটিং-এর রিসেস-এর সময় কারুকে কিছু না জানিয়ে···ওর কী বকম সুন্দর চেহারা ছিল মনে আছে? কিছুতেই যেন বয়েস বাড়তো না, রবার্ট রেডফোর্ডের সঙ্গে একটা ছবিতে নামলো, তখনও ও নায়িকা, কী যেন নাম ছবিটার?

প্রতিমা বললেন, 'দিস প্রপার্টি ইজ কনডেম্‌ন্‌ড', টেনেসি উইলিয়ামের কাহিনী, পরিচালক সিডনি পোলাক।

আমি মুগ্ধভাবে প্রতিমার দিকে তাকালাম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ কারুর চেয়ে কম নয়!

রবীনবাবু বললেন, নেটালি উডের মনে কোনো ক্ষোভ থাকার কথা নয়, রূপ-খ্যাতি-অর্থ সবই আছে, তবু একদিন শুটিং-এর ফাঁকে সে চলে এলো সমুদ্রের ধারে, চড়ে বসলো একটা নৌকোয়, ভাসতে ভাসতে চলে গেল অনেক দূরে, গভীর সমুদ্রে, আর ফিরে এলো না। অ্যাকসিডেন্ট হলেও হতে পারে, কিন্তু প্রায় সবাই আত্মহত্যা বলেই মেনে নিয়েছে।

প্রতিমা বললেন, নেটালি ড্রাগ অ্যাডিক্‌ট ছিল, সেই সঙ্গে বীয়ার খেতো খুব। অনেকের ধারণা সে নৌকায় মাতাল অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, নৌকোটা বহু দূরে চলে যায়, আর ফিরতে পারেনি।

রবীনবাবু বললেন, চন্দ্রা ড্রাগ অ্যাডিক্‌ট ছিল কিনা, সেটা খুঁটিয়ে দেখা দরকার। আজকাল ফিলম লাইনের অনেকে, শোনা যায় স্মিতা পাতিলও···

আমি বললাম, না, চন্দ্রার ড্রাগের নেশা ছিল না!

রবীনবাবু ঝট করে মুখ তুলে তীক্ষ্ম গলায় বললেন, আপনি কী করে জানলেন? এখানে আসবার আগে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়নি বলেছিলেন।

আমি বললাম, সেটা ঠিক, তবু, ঐ যে আপনি বললেন, মানব চরিত্র বোঝার ক্ষমতা? চন্দ্রার সঙ্গে দু' একদিন মিশেই, যে-কোনো মানুষের সঙ্গে খানিকটা মিশেই এসব বুঝতে পারি। চন্দ্রার টাইপটা ওরকম ছিল না।

রবীনবাবু বললেন, উধাও হয়ে যাবার আগের দিন চন্দ্রা

আপনার বাড়িতে এসেছিল। একা এসেছিল। আপনার কাছে নিশ্চয়ই সে অনেক কথা বলেছে।

প্রতিমা বললেন, আবার তুমি ওভাবে···ঠিক পুলিশি জেরার মতন কথা বলছো ?

রবীনবাবু লজ্জা পেয়ে হেসে বললেন, আই অ্যাম সরি। অভ্যেস সহজে কাটানো যায় না। তাহলে সুনীলবাবু, আপনি বলছেন, চন্দ্রা আত্মহত্যা করেনি ?

আমি আস্তে আস্তে দু-দিকে মাথা নাড়লাম। যদিও আত্মহত্যার চেয়ে খুন অনেক বেশি জঘন্য ব্যাপার।

প্রতিমা বললেন, চন্দ্রার অবশ্য ফ্রাসট্রেশানের অনেক কারণ থাকতে পারে।

রবীনবাবু সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তা জানলে কী করে ? তুমি কি চন্দ্রার সঙ্গে একদিনও কথা বলেছো ?

প্রতিমা বললেন, না, বলিনি। দূর থেকে দেখেছি। তবে পত্র-পত্রিকা পড়ে আমি এই সব মেয়েদের কেরিয়ার ফলো করি। একটি অল্পবয়েসী মেয়ে মেল ডমিনেটেড ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রীতে কী করে আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে, কী ভাবে সেই মেয়েটিকে অন্যরা ব্যবহার করে, সেগুলো নোট করা আমার অভ্যেস। চন্দ্রার দু' তিনটে ইণ্টারভিউ আমি পড়েছি শস্তা সিনেমার কাগজে। ওর অনেক অভিযোগ। এ পর্যন্ত চন্দ্রা মোট আট-দশটা ফিলমে অভিনয় করেছে, সবই ছোট ইনসিগনিফিকেণ্ট রোল। কেউ এ পর্যন্ত ওকে ভালো সুযোগ দেয়নি। শিক্ষিত ভালো পরিবারের মেয়ে, ওর নিজস্ব রুচিবোধ ছিল, প্রোডিউসার-ডিরেক্টরদের অন্যায় আবদার মেনে নেয়নি বলেই বোধহয় ও ভালো রোল পায়নি। তাছাড়া বেচারা সত্যজিৎ-মৃণাল-গৌতমের মতন কোনো বড় পরিচালকের নজরেও পড়েনি।

রবীনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চন্দ্রার অভিনয় কোনো ফিলমে দেখেছো ? দ্যাখোনি নিশ্চয়ই !

প্রতিমা বললেন, না, বাবা রক্ষে করো। এই সব বাংলা ন্যাকা নাকো ছবি আমার একেবারেই সহ্য হয় না।

রবীনবাবু বললেন, আমিও আগে দেখিনি, তবে এই ছবির শুটিং-এ আমি কয়েক জায়গায় উপস্থিত ছিলাম। চন্দ্রা দেখতে যে-রকম ভালো, চেহারায় যত চাকচিক্য, সেই তুলনায় অভিনয় প্রায় কিছুই জানতো না, কেমন যেন কাঠপুতুলের মতন। সেইজন্যেই পরিচালকরা ওকে ইমপর্টাণ্ট রোল দিতে চায় না, ওর শরীরটাকেই বেশি করে দেখায়। এই ছবিতে সন্তোষ মজুমদারও তো ওর এক একটা সীন পাঁচ-ছ'বার করে টেক করতে হতো বলে খুব বিরক্ত হয়ে যেতেন মাঝে মাঝে; শুনেছি উনি চন্দ্রার রোল খানিকটা ছেঁটে আরও ছোট করে দেবেন ভাবছিলেন।

প্রতিমা বললেন, এতে চন্দ্রার মন ভেঙে যেতে তো পারেই।

রবীনবাবু বললেন, ফিলম লাইনে এরকম স্ট্রাগল করতে হয় অনেককেই। হঠাৎ একটা ব্রেক আসে। এইটুকু ফ্রাসট্রেশানের জন্য কেউ আত্মহত্যা করে না।

ওঁদের মেয়ে টিনা পড়াশুনো শেষ করে উঠে এসে বললো, মা, তোমরা খেতে যাবে না? আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।

রবীনবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার খেতে যাবো। তুই নিচে ডাইনিং রুমে গিয়ে অর্ডার দে তো আগে। এই সুনীল আংক্‌লও আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন।

প্রতিমা বললেন, তোমরা তাড়াতাড়ি শেষ করে নাও!

তারপর তিনি উঠে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

আস্তে আস্তে আপনমনে বললেন, যদি আত্মহত্যা করতেই হয়, তাহলে নেটালি উডের মতনই, কী সুন্দর, আস্তে আস্তে একটা নৌকোয় ভেসে যাওয়া, দূরে, গভীর সমুদ্রে, চারপাশে আর কেউ নেই, কেউ আমাকে দেখতে পাবে না, যেন প্রকৃতির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া...

॥ ৫ ॥

চন্দ্রা আমার সঙ্গে নিজে থেকেই একবার দেখা করতে এসেছিল ঠিকই।

চন্দ্রার ব্যবহারে ফিলম অ্যাকট্রেসসুলভ কোনো ভাব ছিল না। যেন এমনই একজন উচ্ছল তরুণী, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।

যেদিন ঘটনাটা ঘটলো, তরে আগের দিনই বিকেলের দিকে হঠাৎ চন্দ্রা উপস্থিত হয়েছিল আমার বাড়িতে। সেদিন প্রায় সারাদিন ধরেই বেলাভূমির এখানে সেখানে শুটিং চলছিল বলে আমি আর বাইরে বেরুইনি, এমনকি স্নান করতেও যাইনি।

চন্দ্রা এসে বললো, আমি কোনদিন কোনো লেখকের ঘর দেখিনি, একবার আপনার লেখার টেব্‌লটা দেখবো। আপনি এখন কী লিখছেন?

এই বাড়িখানায় তিনটে ঘর, তার মধ্যে একটা তালা দেওয়া, সেখানে মালিকের জিনিসপত্র আছে। আর দুটি ঘরেই খাট-বিছানা পাতা, অর্থাৎ বেডরুম। একটা বড় ঘেরা বারান্দাই বসবার জায়গা। আমি পুরো বাড়িটা ভাড়া নিলেও একখানা মাত্র ঘর ব্যবহার করি। কোনো ঘরেই কোনো লেখার টেব্‌ল নেই।

কিছু লেখা তো দূরের কথা, আমার কাছে যে একটা সাদা পৃষ্ঠাও নেই, তা চন্দ্রা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না।

খাটের ওপর অনেক বইপত্র ছড়ানো। চন্দ্রা বইগুলো তুলে তুলে দেখছিল। আমার একটা বিচিত্র স্বভাব আছে। আমি একটানা একখানা বই পড়ে শেষ করার বদলে, একই সঙ্গে চার পাঁচখানা বই একটু একটু পড়ি। সব বইগুলো সেইভাবে ওল্টানো। সেই সব বই দেখে চন্দ্রা প্রথমে ভুরু তুললো, তারপর হাসতে হাসতে বললো, আপনি এইগুলো পড়ছেন?

যদুনাথ সরকারের অ্যানেকডোটস অব আওরঙ্গজেব, বৈষ্ণব পদাবলী, বশীর আল হেলালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, রাজশেখর বসুর মহাভারত, নীরোদ সি চৌধুরীর দাই হ্যান্ড গ্রেট

অ্যানার্ক', ইনিড স্টার্কি'র বদলেয়ারের জীবনী এইসব বইয়ের পরস্পরের মধ্যে কোনো মিল নেই। আমিও তো কোনো কাজের জন্য পড়ছি না, পড়ার জন্যই পড়া, আসবার সময় হাতের কাছে এগুলোই পেয়েছি। কেউ দেখে ফেললে লজ্জা লাগে।

বিকেলের পর চন্দ্রার আর শুটিং নেই, তাই সে চলে এসেছিল, বেশ হাসিখুশির মুডে ছিল, কোনোরকম ফ্রাসট্রেশানের চিহ্নই আমার চোখে পড়েনি।

চন্দ্রা আমার কাছে কোনো গোপন কথা কিংবা তার জীবনী শোনাতেও আসেনি, কোনো ফিলমের প্রসঙ্গই তোলেনি। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে কীভাবে কাড়াকাড়ি করে বই পড়তো সেই গল্প শোনাচ্ছিল।

চন্দ্রা আমার বাড়িতে একা এসেছিল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ একা থাকেনি। মিনিট পনেরো পরেই ওদের ফিলম ইউনিটের আর দুটি ছেলেমেয়ে চন্দ্রাকে খুঁজতে চলে এলো। ওরা সেই রাতেই একবার বেরহামপুরে কী সব কেনাকাটা করতে যাবে। পল্লব আর সুনেত্রা, ওরা স্বামী-স্ত্রী। পল্লব অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান আর সুনেত্রা আছে প্রোডাকশানে, কনটিনিউটি নোট করাই তার প্রধান কাজ।

পল্লব আর সুনেত্রা আমার সঙ্গে গল্প করার ব্যাপারে উৎসাহী ছিল না, এরা প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল চন্দ্রাকে।

এই পল্লবই পরের সন্ধ্যেবেলা চন্দ্রাকে জীবিত অবস্থায় শেষ দেখে।

সমুদ্রের ধারে একটা ডিঙি নৌকোয় একা বসেছিল চন্দ্রা। আকাশে তখন ফ্যাকাশে জ্যোৎস্না। চন্দ্রার পা দুটো ঝোলানো ছিল জলের মধ্যে। পল্লব তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এই তুই এখানে একা বসে আছিস যে ?

চন্দ্রা বলেছিল, এমনিই।

পল্লবের হাতে তখন একটা মদের বোতল, পাম বীচ হোটেলের পেছন দিকে একটা নিরিবিলি জায়গায় তাদের আসর বসবে। পল্লব চন্দ্রাকে বলেছিল, তুই ওখানে চলে আয় না !

চন্দ্রা বলেছিল, তুই যা। তোরা গিয়ে বোস। আমি একটু পরে জয়েন করব।

পল্লবের জন্য অন্যরা অপেক্ষা করছিল, সে আর দাঁড়ায়নি। চন্দ্রাকে জোর করে সেই নৌকা থেকে নামানো কিংবা কোনো বিপদের সম্ভাবনার কথা তার মাথাতেই আসেনি। ওড়িশার পুলিশ এখনো প্রত্যেকদিন পল্লবকে জেরায় জেরায় নাজেহাল করছে।

চন্দ্রার অদৃশ্য হয়ে যাবার কথা মাঝরাত্তিরের আগে কারুর খেয়ালই হয়নি।

রাত্তিরেও কিছু কিছু শুটিং ছিল। ইউনিটের সবাই খেতে বসেছিল রাত সাড়ে বারোটায়। তখন দু-একজন জিজ্ঞেস করেছিল, চন্দ্রা কোথায়?

চন্দ্রা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে সুনেত্রা তার ঘরেও খুঁজে দেখতে গিয়েছিল। না পেয়ে ঠোঁট উল্টেছে। ইউনিটের অন্য অনেকে মুচকি হেসেছে। একটি যুবতী মেয়ের গতিবিধি সম্পর্কে অনেকেরই মাথায় রসালো চিন্তা আসে। চন্দ্রার বয়েসী অভিনেত্রীদের সঙ্গে অনেক সময় তাদের মা কিংবা ভাই-বোন কেউ এসে পাহারা দেবার জন্য। চন্দ্রার সঙ্গে সে রকম কেউ নেই। সুতরাং সকলে ধরেই নিয়েছিল, চন্দ্রা হোটেল ছেড়ে গোপালপুরের অন্য কোনো বাড়িতে রাত কাটাতে গেছে। পল্লব-সুনেত্রার মাথায় আমার নামটাও ঝিলিক দিয়েছিল নিশ্চিত॥

পরদিন সকাল নটায় সন্তোষ মজুমদার এসেছিলেন আমার কাছে। তারও দু'ঘণ্টা বাদে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। চন্দ্রার ঘরে তার ব্যবহারের জিনিসপত্র, এমনকি সোনার গয়না ও টাকাকড়িও পড়ে আছে, এসব ছেড়ে চন্দ্রা নিশ্চিত একা একা কোথাও চলে যাবে না।

পল্লবের পর চন্দ্রাকে আর কেউ দেখেনি, অন্তত আর কেউ সে রকম কিছু স্বীকার করেনি, সুতরাং চন্দ্রা সমুদ্রে ভেসে গেছে, এটাই হলো একমাত্র থিয়োরি।

দরজা বন্ধ করে আমি শুয়ে পড়লাম। এমন সমুদ্রের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। সমুদ্রের শব্দ আমার কখনো একঘেয়ে লাগে না। আসলে গাড়ি, ট্রেন, কলকারখানা, এই সব মেকানিক্যাল শব্দে মানুষ এখনও অভ্যস্ত হয়নি, এখনও কানে পীড়া দেয়, কিন্তু প্রকৃতির নিজস্ব শব্দ আমাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে।

আমার একা থাকার অভ্যেস আছে। ছেলেবেলায় আমি ইচ্ছে করে ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে গেছি। জঙ্গলের মধ্যে ডাক-বাংলোয় দিনের পর দিন থেকেছি একা। গোপালপুরেও তো বেশ কয়েকটা দিন হয়ে গেল। এক এক রাতে ঘুম আসতে চায় না। তাতেও আমার কোনো অসুবিধে নেই। একটা পুরো রাত না ঘুমোলেও মানুষের কিছু যায় আসে না। একরাত না ঘুমোলে পরের রাতে শরীর ঠিক ঘুম আদায় করে নেবে।

ঘুম না এলে ছটফট করার বদলে আমি বই পড়ি। একটু কঠিন ধরনের বই হলেই সুবিধে। এক সময় চোখ টেনে আসবেই।

জানালায় একটা শব্দ হতেই আমি বিছানা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। বুকের মধ্যে জয়ঢাকের মতন দমাস দমাস শব্দ হচ্ছে।

নিজের ওপর অসম্ভব রাগ।

এটা কী ব্যাপার, আমি ভয় পাচ্ছি কেন শুধু শুধু! আমার ঠিক পায়ের কাছে জানলাটার একটা কপাট আলগা। মাঝে মাঝে যে এরকম বন্ধ হয়ে যায়; তা তো আমি জানিই। জানলাটা পুরো বন্ধ করে দিলে হাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। ফ্যানের হাওয়ার বদলে সমুদ্রের হাওয়া খাবার জন্যই তো এখানে আসা।

আজ সেই জানলার আওয়াজে এমন বুক কাঁপার কী আছে?

আজ সমুদ্রের ধারে সন্ধেবেলা নৌকোর ওপর বসা সেই রহস্যময়ী তরুণীটির কথা কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। হয়তো কিছু রহস্য নেই, এমনিই একটি সাধারণ মেয়ে। বাঁধা নৌকোর ওপর উঠে একটুখানি বসা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। চন্দ্রার সঙ্গে যে মিলে গেছে, সেটাও কাকতালীয় হতে পারে।

কিন্তু মেয়েটি কে? ফিলিম ইউনিটের কেউ না, ওদের সবাই-কেই মোটামুটি চিনে গেছি। তাছাড়া মেয়েটি পাম বীচ হোটেলের দিকেও গেল না। অন্য কোনো টুরিস্ট হতে পারে। কিন্তু ঐ বয়েসী কোনো মেয়ে কি একা আসে? চন্দ্রার ঘটনা কিছুই শোনেনি।

আমার যে মনে হয়েছিল, ওই নীল শাড়ি পরা মেয়েটি সমুদ্রের জলে নেমে মিলিয়ে গেল, এ কথা আমার বন্ধু-বান্ধবেরা শুনলে

হাসবে। অথচ মনে হয়েছিল, তা-ও ঠিক। এবং এখন এ-ও জানি, ওরকম কিছু হতেই পারে না।

আবার জানলাটা বন্ধ হলো, আবার আমার বুক কাঁপলো। এ তো দেখছি মহা জ্বালা! আমার বুকের মধ্যে কোথাও খানিকটা ভয় জমে আছে। এটা তাড়ানো দরকার।

প্রথমে মনে হলো, উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।

জানলার ধারে এসে আমি সন্তর্পণে বাইরে তাকালাম। কেন যে মনে হচ্ছে, ঠিক বাইরেই কারুকে দেখতে পাবো।

দূর ছাই, মানুষের আত্মা-ফাত্মা কিছু নেই, চন্দ্রা আর কোনো-দিনই ফিরে আসবে না। চন্দ্রার সঙ্গে আমার কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। চন্দ্রা বেঁচে থাকলে তার সঙ্গে আমার হয়তো কখনো আর দেখাও হতো না। চন্দ্রা অমনভাবে সমুদ্রে চলে গেছে বলেই সে প্রায় সর্বক্ষণ আমার মন জুড়ে আছে। শুধু আমার নয়, আরও অনেকের।

বেশ জোর হাওয়া দিচ্ছে, ঢেউয়ের শব্দও খুব বেশি। বেলাভূমি একেবারে শুনশান। জানলা বন্ধ করার বদলে আমি দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম পায়ে চটি গলিয়ে।

ভয় কাটাতে হলে এখন এই রাত্রির নির্জনতায় কিছুক্ষণ বাইরে ঘুরে আসা দরকার।

॥ ৬ ॥

রবীনবাবুর কথাই ঠিক, এরা পুরোদমে আবার শুটিং শুরু করে দিয়েছে। সকাল থেকেই শুনতে পাচ্ছি বেশ হট্টগোল।

আমার বাড়ির বেশ কাছাকাছি একটা খড়ের ঘরের সেট বানিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। ওখানে ঘর দিয়ে কী হবে তা কে জানে! বালির ওপর বসানো হয়েছে ট্রলি, এদিকে-ওদিকে অনেকগুলি রিফ্লেকটর, আজ সারাদিনই শুটিং চলবে মনে হয়।

জানলা দিয়ে ওদের ব্যাপার স্যাপার দেখেই ঠিক করলাম, আজ আর ওদিকে যাবোই না। চন্দ্রা নেই বলেই এই ফিলমটার ব্যাপারে আমার কেমন যেন একটা বিদ্বেষ জন্মে গেছে। অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার, প্রায় পঞ্চাশ ভাগের কাজ আগেই হয়ে গেছে। এখন এ ফিলম শেষ না করে ওদের উপায় নেই, তা ঠিক, কিন্তু একটি মেয়ে এমনি এমনি হঠাৎ হারিয়ে গেল, তার চিহ্ন কোথাও থাকবে না?

চন্দ্রার ভূমিকাটা কী হবে? বাকিটা হয়তো বাদই দিয়ে দেবে। এই সব গাঁজাখুরি গল্পের তো কোনো মা-বাপ নেই, যে কোনো চরিত্র যে-কোনো জায়গায় হারিয়ে যেতে পারে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমি বৈষ্ণব পদাবলী পড়তে লাগলাম।

এগারোটা আন্দাজ মনে হলো, এক কাপ চা পেলে মন্দ হয় না। আবার বাড়িতে চা-তৈরিরও ব্যবস্থা নেই। সকালের চা-ব্রেকফাস্ট পাশের গেস্ট হাউজ থেকেই দিয়ে যায়। দ্বিতীয়বার নিজে গিয়ে চাইতে হয়। তেলেঙ্গি মেয়েটি একটু আগে ঘর মুছছিল, সে চলে গেল নাকি? তাকে দিয়ে আনানো যেতে পারে চা।

মেয়েটি চলেই গেছে। আমাকেই উঠতে হলো।

বাইরে বেরুতেই প্রতিমার সঙ্গে দেখা! আর একজন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে চোখাখোখি হলো, আমি সামান্য সৌজন্যের হাসি দিয়ে চলে এলাম গেস্ট হাউজের দিকে।

এদের ডাইনিং রুমে পাঁচ সাতজন নারী-পুরুষ বসে আছে, কেউ কেউ চায়ের বদলে বীয়ার খাচ্ছে। দু'জন মুখচেনা, কিন্তু এখন কারুর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। মুখখানা উৎকট গম্ভীর করে রাখলাম। একটু কান পাতলেই বোঝা যায়, অন্য সবাই চন্দ্রার বিষয়েই আলোচনা করছে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম চা শেষ করে। ওদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, চন্দ্রার বাবা আর ছোট বোন এসে পৌঁছেছে গতকাল, চন্দ্রার মা নেই। চন্দ্রার বাবা নাকি কান্নাকাটি করছেন খুব। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঠিক করে নিয়েছি, কিছুতেই চন্দ্রার বাবার সামনে পড়তে চাই না।

একটা ভাঙা বাড়ির সামনে প্রতিমা এখনো কথা বলছেন অচেনা

ব্যক্তিটির সঙ্গে। এবারও আমার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হলো, কোনো কথা হলো না, আমি ঢুকে গেলাম নিজের বাড়িতে।

মিনিট পাঁচেক পরেই প্রতিমা আমার দরজায় উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন, আসতে পারি?

আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে বললাম, আসুন, আসুন। রবীনবাবু কোথায়?

প্রতিমা বললেন, ও শুটিং দেখতে গেছে। আপনি গেলেন না?

আমি হেসে দু'দিকে ঘাড় নাড়লাম।

প্রতিমা একটা চেয়ারে বসে বললেন, আজ চড়া রোদ। এর মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে শুটিং দেখা, খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। রবীন গেছে, আমার মন হয়, আরও কিছু খবর-টবর জোগাড় করার আশায়। আসলে পুলিশ তো! ওর এখনো ধারণা, এটা আত্মহত্যা নয়, এর মধ্যে কিছু ফাউল প্লে আছে।

আমি বললাম, রবীনবাবু যদি মিস্ট্রি সুলভ করতে পারেন তা হলে দারুণ ব্যাপার হয়। এখানকার পুলিশ তো কোনো খেই পাচ্ছে না।

প্রতিমা হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, অনেকদিন আগে 'জীবন যে রকম' নামে একটা বাংলা ছবি হয়েছিল, তার কাহিনীটা আপনার লেখা?

আমি বেশ তীব্র চোখে প্রতিমার দিকে তাকালাম। এই প্রসঙ্গটা কেউ তুললেই আমার রাগ এসে যায়, এত কাল বাদেও।

আমি বললাম, আমি কখনো কোনো সিনেমার কাহিনী লিখি না। আমার লেখা গল্প-উপন্যাস থেকে মাঝে মাঝে কেউ ফিল্ম করেন। 'জীবন যে রকম' আমার একটা উপন্যাস, সেটা অবলম্বন করে একটা বাংলা ছবি হয়েছিল। সে ছবি আমি নিজে অবশ্য দেখিনি। অন্যদের মুখে শুনেছি। সে ছবি দেখলে আমার উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের চেনাই যায় না।

প্রতিমা বললেন, আমি যে-ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলুম, ওকে আপনি চেনেন?

আমি বললাম, না!

প্রতিমা বললেন, আমি ইচ্ছে করেই তখন আপনাকে ডাকিনি।

ওর নাম সুগত মজুমদার। একটি সিনেমা পত্রিকার রিপোর্টার। আপনাকে পেলে ছাড়তো না, অনেকক্ষণ ধরে ভ্যাজর ভ্যাজর করতো। ঐ ভদ্রলোকের বোন আমার সঙ্গে কলেজে পড়তো, সেই সূত্রে চেনা। তবে আপনাকে এসে ধরবে ঠিকই।

আমি বললাম, আমি এবার কেটে পড়বো ভাবছি।

প্রতিমা বললেন, ঐ সুগতই জীবন যে-রকমের প্রসঙ্গ তুললো। আপনার লেখা গল্প, তা আমার খেয়াল ছিল না। সেই ছবিরও শুটিং-এর সময় জলে ডুবে কেয়া চক্রবর্তী···সেই সময় খুব তোলপাড় হয়েছিল ঘটনাটা নিয়ে। এখন আবার কেউ কেউ সেই প্রসঙ্গটা টানবেই। প্রায় একই রকম ব্যাপার তো!

আমি ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম, কেয়া চক্রবর্তীর ঘটনাটা বাংলা সিনেমার একটা কলঙ্ক। আমাদের থিয়েটার জগতের কী বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল বলুন তো! কেয়া বাংলা মঞ্চে ইদানীংকার সবচেয়ে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, শুধু তাই নয়, গ্রুপ থিয়েটারের জন্য সে ছিল ডেডিকেটেড। কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল পর্যন্ত। সেই কেয়াকে কত তুচ্ছ কারণে প্রাণ দিতে হলো। একটা রাবিশ বাংলা সিনেমার জন্য।

প্রতিমা সামান্য হেসে বললেন, আপনারই লেখা কাহিনী, তবু আপনি রাবিশ বললেন?

—আমার উপন্যাসটাকে কেটে, ছিঁড়ে, ওলোট-পালোট করে যা খুশি করেছে। কাহিনীর নায়ক-নায়িকা পর্যন্ত বদলে গেছে।

—সিনেমার লোকরা ইচ্ছে মতন এরকম বদলাতে পারে, আপনারা কিছু বলেন না?

—আমাদের কথা কি ওরা শোনে?

—আপনারা আপত্তি করতে পারেন না?

—মৌখিক আপত্তি গ্রাহ্যই করে না। অনেক সময় সিনেমার লোকেরা গল্পের রাইট কিনে সেই যে উধাও হয়, আর কোনো যোগাযোগই রাখে না লেখকের সঙ্গে। তা ছাড়া কণ্টাক্ট ফর্মে এক জায়গায় লেখা থাকে যে চলচ্চিত্রে রূপ দেবার জন্য কিছু কিছু পরিবর্তন-পরিবর্জন করা যাবে। ওরা সুযোগটা নেয়।

—আমাদের ধারণা, লেখকরা টাকার জন্য আজে-বাজে সিনেমার জন্যও কাহিনী বিক্রি করে দেন!

—বাংলা সিনেমার জন্য কী সামান্য টাকা পাওয়া যায় তা তো আপনারা জানেন না। অনেক সময় চুক্তিতে যা লেখা থাকে, সেটাও পুরো পাওয়া যায় না।

—কেয়ার ঠিক কী হয়েছিল? দুর্ঘটনা না কেউ ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছিল?

—মামলা টামলা হয়েছিল শুনেছি, শেষ পর্যন্ত কেউ শাস্তি পেয়েছিল কি না জানি না। সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানেন, ঐ জীবন যে-রকমে যে ভূমিকায় কেয়াকে মরতে হলো, সেই ভূমিকাটা আমার লেখাই নয়, উপন্যাসে ওরকম চরিত্রই নেই। সেণ্টিমেণ্টে শুড়শুড়ি দেবার জন্য চিত্রনাট্যে একটি অন্ধ মেয়ে আমদানি করা হয়েছিল, গল্পের সঙ্গে তার বিশেষ যোগই নেই।

—ঐ রকম এলেবেলে ভূমিকা নিতে কেয়া রাজি হয়েছিল কেন?

—গ্রুপ থিয়েটারের সেই সময়টা ছিল খুব স্ট্রাগলিং পীরিয়ড। ওরা অভিনয়ের জন্য ভালো হল পেত না। নান্দীকার গ্রুপকে বোধহয় সেই সময় রঙ্গনা থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। সেইজন্যই কেয়া, অজিতেশ, রুদ্রপ্রসাদ এরা ঠিক করেছিল, সিনেমাতে ছোট-খাটো অভিনয় করে টাকা তুলে নিজস্ব একটা রঙ্গমঞ্চ বানাবে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন অত বড় একজন অভিনেতাকেও কত বাজে সিনেমায় অভিনয় করতে হয়েছে, মনে নেই?

—কেয়া কি ইচ্ছে করে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল?

—সেটা আমি কী করে জানবো বলুন! সুন্দরবনের দিককার নদীগুলো সাংঘাতিক, ওখানে কেউ স্নানই করতে নামে না, সেখানে ঝাঁপ দেবার কোনো মানে হয়? অন্য কতভাবে দেখানো যেত। জলে ঝাঁপ দিলেও জাল টাল পেতে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

—কেয়া আত্মহত্যা করেছে, এরকম একটা কথাও উঠেছিল না?

—অসম্ভব! কেয়াকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। ওরকম তেজী, বুদ্ধিমতী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। সব সময় সে উৎসাহে

টগবগ করতো। সবচেয়ে দুঃখের কথা কী জানেন, দুর্ঘটনা হোক বা যাই-ই হোক, কত অকিঞ্চিৎকর একটা কারণে ওরকম একজন প্রতিভাময়ী মেয়েকে প্রাণ দিতে হলো। কী নিদারুণ অপচয়! ছি ছি ছি ছি কী বিরাট অন্যায়!

—আপনি তখন খুব কষ্ট পেয়েছিলেন?

—এখনও পাই। কেয়ার প্রসঙ্গ উঠলেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে।

—কেয়া আর চন্দ্রা, চন্দ্রা অবশ্য তেমন কিছু বড় অভিনেত্রী নয়, তবু তো একটা সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাণ, সবেমাত্র শুরু হয়েছিল তার যৌবন ও কেরিয়ার···। নেটালি উড অবশ্য পরিপূর্ণতায় পেঁছেছিল, সিনেমা জগৎ থেকে তার আর বিশেষ কিছু পাবার ছিল না।

—চন্দ্রা কি নেটালি উডের ঘটনাটা জানতো?

—চন্দ্রার সঙ্গে আমার পরিচয়ই হয়নি। তার মনের কথা আমি কী করে জানবো বলুন! তবে, আমাদের চেয়ে যারা দশ পনেরো বছরের ছোট, তারা হলিউডের ঐ সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রায় চেনেই না বলতে গেলে, গ্রেগরি পেক-এর জন্য কি আর এখানকার মেয়েদের বুক কাঁপে? আমার দিদির মেয়ে, তার একুশ বছর বয়েস, সে রোনালড কোলম্যান কিংবা ইনগ্রিড বার্গম্যানের নামই শোনেনি। ওদের ফিলম তো আজকাল দেখতেই পাওয়া যায় না! অবশ্য ভি সি আর-এর দৌলতে এসব ফিলম আবার কিছু কিছু ফিরে আসছে, কিন্তু ঐসব স্টার সম্পর্কে তেমন কৌতূহল কিংবা উন্মাদনা তো আর হবে না! আমি এবার উঠি। মেয়েটা একলা রয়েছে।

—আপনার মেয়ে খুব পড়ুয়া, সব সময় ওকে বই পড়তে দেখি।

—হ্যাঁ, গল্পের বই পড়তেই বেশি ভালবাসে। ছোটবেলায় যারা সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, অবন ঠাকুর পড়ে না, তাদের সম্পর্কে আমার যা মায়া হয়!

প্রতিমা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রতিমার স্বভাবে এমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে, যাতে ওঁর সঙ্গে ঠিক যেন ঠাট্টা ইয়ার্কি করা যায় না।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, আপনাকে একটা খবর দিই।

এটা আমার স্বামীই খুঁজে বার করেছে। সুনেত্রার সঙ্গে চন্দ্রার এক-দিন বেশ বিটার ধরনের ঝগড়া হয়েছিল। এটা আপনি শুনেছেন?

আমি বললাম, না তো! ওদের দু'জনের তো বেশ ভাবই মনে হতো!

প্রতিমা বললেন, এর আগের একটা ছবির শুটিং হয়েছিল এলাহাবাদে। তাতে চন্দ্রা ছিল, পল্লবও সেই ছবিতে ক্যামেরার কাজ করেছিল। সুনেত্রা সেবার এলাহাবাদ যায়নি। পল্লব প্রত্যেকদিনই বেশি ড্রিংক করে, খানিক বাদে তার ভালো মন্দ জ্ঞান থাকে না। এলাহাবাদে সে নাকি চন্দ্রার সঙ্গে অ্যাফেয়ার করার চেষ্টা করেছিল। চন্দ্রা তখন জানতো না যে পল্লব বিবাহিত। সেই ঘটনা সুনেত্রা এখানে এসে শুনেছে।

—কে বললো?

—ওদেরই ইউনিটের অন্য কেউ। এই সব কথা জানিয়ে দিয়ে এক ধরনের লোক খুব আনন্দ পায়। তার ফলে ব্যাপারটা আর একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে গেল না?

আমি চুপ করে রইলাম।

প্রতিমা আবার বললেন, পল্লবই চন্দ্রাকে শেষ দেখেছিল। তার সঙ্গে চন্দ্রার কী কথা হয়েছে কেউ জানে না। চন্দ্রা সাঁতার জানতো না। পল্লব নৌকোর দড়ি খুলে নৌকোটা সমুদ্রের মধ্যে যদি ঠেলে দিয়ে থাকে······সেটা অসম্ভব কিছু না।

আমি তবু চুপ করে রইলাম।

প্রতিমা দরজার বাইরে গিয়ে আবার বললেন, আমার পুলিশ স্বামীটির ধারণা, সেক্স অ্যাঙ্গেলটা খুব ইমপর্টান্ট। যে-সব মেয়েরা খুন হয়, তাদের অধিকাংশেরই প্রাণ যায় পুরুষদের বিকৃত যৌন তাড়নায়।

প্রতিমার মুখে সেক্স কথাটা কেমন যেন বেমানান লাগে।

ঘটনাটা ক্রমশই যেন একটা রোমহর্ষক রহস্য কাহিনীর দিকে যাচ্ছে আমার হাসি পেল এই এই ভেবে যে এই কাহিনীতে আমি নিজেও একটা ছোটোখাটো চরিত্র।

॥ ৭ ॥

দুপুরবেলা আকাশ কাঁপিয়ে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা এসে জাগিয়ে দিল আমাকে। ধড়মড় করে উঠে জানলা বন্ধ করতে আমার ইচ্ছে হলো না। ভিজুক না বিছানাটা। এমন কিছু ক্ষতি হবে না। শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম বিদ্যুতের লকলকে রেখা।

মিনিট পাঁচেকের বেশি অবশ্য শুয়ে থাকা যায় না। ভেতরের সাবধানী মনটা বলে ওঠে, বিছানা একেবারে জবজবে ভিজে গেলে রাত্তিরে শোবে কী করে? এর মধ্যেই চাদর-টাদর বেশ ভিজে গেছে।

একা থাকার এই মজা। কলকাতায় নিজের বাড়িতে কি এক মিনিটও এমন বৃষ্টির মধ্যে জানলা খুলে শুয়ে থাকতে পারতাম? স্বাতী এসে বকুনি দিত।

এখানে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো ইচ্ছে মতন মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলতে পারি। চায়ের কাপে ছাই ঝাড়লে আপত্তি করার কেউ নেই। সদর দরজাটা বন্ধ থাকলে পা-জামার দড়ি একেবারে আলগা করে শুয়ে থাকা যায়। বাথরুম থেকে স্নান সেরে আমি সোজা উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসি। কয়েকদিনের জন্য এই একটা অন্যরকম জীবন।

উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম জানালার সামনে।

ফিলম ইউনিটের লোকেরা ছোটাছুটি করছে। বৃষ্টি ও ঝড় এসে পড়েছে একেবারে জানান না দিয়ে। ক্যামেরার ওপর কম্বল চাপা দিয়ে কাঁধে করে দৌড়াচ্ছে পল্লব, বড় বড় রিফ্লেকটরগুলো সরানো হচ্ছে তাড়াতাড়ি। খড়ের ঘরের যে-সেটটা ওরা বানিয়েছিল, সেটা হেলে পড়েছে ঝড়ের ধাক্কায়।

আজ আর শুটিং হবার আশা নেই।

এতে আমার আনন্দ হচ্ছে কেন? এক একদিন শুটিং বন্ধ হয়ে গেলেই অনেক টাকা ক্ষতি হয়ে যায়। অপরের ক্ষতি দেখে কেন আমার এই বিকৃত উল্লাস? না, এদের লাভ-লোকসানের

সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবু, বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, এই রকম একটা ভাব আমার মনের মধ্যে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। লোকজনের ছুটোছুটি দেখতে মজাই লাগছে বেশ।

সমুদ্রের ওপর অজস্র রুমালের মতন উড়ছে বৃষ্টি।

এক সময় সমস্ত বেলাভূমি জনশূন্য হয়ে গেল। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আমার গেঞ্জি-পাজামা পরা সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে, আমি নিমগ্ন হয়ে দেখছি শূন্যতা। ঠিক শূন্যতা নয়, বৃষ্টি যেন জীবন্ত প্রাণী। এখন এই সমুদ্রকে নিয়ে বৃষ্টির খেলা করার সময়।

বেশ কিছুক্ষণ পর আবার একটি দৃশ্য দেখে আমার বুকটা ধক করে উঠলো।

একটা লাল রঙের ছাতা মাথায় দিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে যাচ্ছে একটি যুবতী।

সেই মুহূর্তে আমি এক লক্ষ টাকা বাজি ফেলে বলতে পারতাম, ঐ নারীটি নিশ্চয়ই চন্দ্রা। ঠিক চন্দ্রার মতন হাঁটার ভঙ্গি, তার মুখখানা যদিও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, তবু চন্দ্রারই মতন, এই লাল ছাতা মাথায় দিয়ে আমি চন্দ্রাকে ঠিক এইরকমভাবে হাঁটতে দেখেছি।

তবে, শুধু এক মুহূর্তের জন্যই আমার এরকম মনে হয়। পরের মুহূর্তেই আমি নিজেকে চোখ রাঙিয়ে বলি, দিনে-দুপুরে ভূত দেখছো নাকি, সুনীল ?

এমনও তো হতে পারে, চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়া গেছে ? সে ফিরে এসেছে কোনো জায়গা থেকে ! তা হলে কি রবীনবাবু তখনি এসে সে খবর আমাকে জানাতেন না ?

মেয়েটি আমার চোখের আড়ালে চলে যেতেই আমি ছটফটিয়ে উঠলাম। প্রকৃত ব্যাপারটা আমাকে জানতেই হবে। আমার কি দৃষ্টিবিভ্রম হচ্ছে ? চন্দ্রার মতন অন্য একজনকে আমি দেখছি কেন ?

ছুটে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

আমার এই বাড়িটার পেছন দিকেই একটা দেয়াল, সেখানে বালি জমতে জমতে অনেকটা উঁচু হয়ে গেছে। অনেকটা খাড়া মতন বালির স্তূপ। সেখান থেকেই একটা লাফ দিলাম আমি। কেউ তো দেখছে না, একটু ছেলেমানুষি করলেই বা ক্ষতি কী ?

লাল ছাতা মাথায় মেয়েটি একটু দূরে চলে গেছে, সে যাচ্ছে পাম বীচ হোটেলের দিকে। এখনো তাকে চন্দ্রাই মনে হচ্ছে আমার। যে-যাই মনে করুক, একবার ঐ মেয়েটির কাছে গিয়ে ওর মুখ দেখে, ওর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতেই হবে।

ঝড় থেমে গেলেও বৃষ্টি পড়ছে সমানে। বীচে আর কেউ নেই। আমি ছাতা আনিনি, সারা গা এমনিতেই ভেজা। দৌড়ে না গেলে মেয়েটিকে ধরা যাবে না।

অন্য বাড়িগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। কোনো বারান্দাতেই কোনো মানুষ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু দিনের বেলা অনেকেই জেগে আছে, জানলা দিয়ে কেউ কেউ আমাকে দৌড়োতে দেখতে পেয়ে যেতে পারে। একটা মেয়ের পেছনে আমি ছুটছি? মন্দ কী, মেয়েদের পেছনে ছোটা মোটেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

একটু জোরে পা চালাতেই পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো একজন লোক। মাথায় কালো ছাতা। চেঁচিয়ে ডাকলো, ও সুনীলদা, একবার শুনুন!

সকালবেলা প্রতিমা এর সঙ্গেই কথা বলছিলেন। সিনেমার কাগজের লোক।

সে এসে আমার সামনেটা জুড়ে দাঁড়িয়ে বললো, আমায় চিনতে পারছেন, সুনীলদা? আমার নাম সুগত মজুমদার। সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে-বাইরে' ছবির প্রিভিউয়ের দিনে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনি আপনার প্যাকেট থেকে আমাকে একটা সিগারেট দিয়েছিলেন। কোথায় যাচ্ছেন, পাম বীচে? চলুন, আমিও ঐদিকেই যাবো, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

ভিজে গায়ে, গেঞ্জি-পাজামা পরে আমি যাবো পাম বীচ হোটেলে? কিন্তু আমি অন্য কোথায় যাচ্ছি, সে কথাও কি বলা যায়?

সুগত আবার বললে, দাদা, আপনার একটা ছোট্ট ইণ্টারভিউ নেবো!

আমি চিবিয়ে বললাম, এই বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতেই ইণ্টারভিউ হবে বুঝি?

সুগত বললো, না, না, মানে, আপনি যখন সময় দেবেন। চলুন, ওদের হোটেলে গিয়ে বসা যাক। আজ তো শুটিং প্যাক আপ হয়ে গেছে, ওখানে আড্ডা জমবে।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি ওদের হোটেলে যাচ্ছি না।

লাল ছাতা মাথায় মেয়েটি ক্রমশ চলে যাচ্ছে দূরে। একবার সে নিচু হয়ে বালি থেকে একটা কিছু কুড়োলো। হয়তো ঝিনুক। দূর থেকেও ওকে ঠিক চন্দ্রা বলেই মনে হচ্ছে। আর একটু পরেই চোখের আড়ালে চলে যাবে। কিছুতেই কি ওর কাছে গিয়ে মুখখানা দেখা যাবে না? আগের দিন সন্ধ্যেবেলা একেই কি দেখেছিলাম?

সুগতকে যে কী অজুহাত দেবো, তা মনেই এলো না। ওকে এড়িয়ে কী করে ছুটে যাই মেয়েটির কাছে? তা হলে সুগত নিশ্চয়ই মনে মনে একটা রসালো গল্প বানিয়ে নেবে। কাগজে একটা কিছু লিখে দিলেই হলো। গোপালপুরে সমুদ্রের ধারে দুপুরবেলায় বৃষ্টির মধ্যে আমি একটি মেয়ের পেছনে ছুটোছুটি করছি।

সুগত জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, সুনীলদা, কেয়া চক্রবর্তীর যখন অ্যাকসিডেন্টটা হয়, তখন, মানে, 'জীবন যে-রকম'-এর শুটিং-এর সেই দিনে আপনি কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

আমি গর্জন করে বলে উঠলাম, না!

তারপর পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম নিজের বাড়ির দিকে।

॥ ৮ ॥

বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলাম পনেরো দিনের জন্য, আরও ছ'দিন বাকি আছে। কিন্তু আমার আর এখানে মন টিকছে না। নির্জনতার সুখ উপভোগ করার আর কোনো আশা নেই। আগামীকালই তল্পি-তল্পা গুটিয়ে সরে পড়বো ঠিক করে ফেললাম।

চন্দ্রা উধাও রহস্য নিয়ে আমার আর মাথা ঘামাবার আগ্রহ নেই।

রবীনবাবু আর প্রতিমা অবশ্য এখনো নানারকম থিয়োরি নিয়ে প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু একটা বেশ অসুবিধেতেও পড়েছেন রবীনবাবু।

এখানকার থানাটা ছোট। সাধারণ খুন-টুনের ব্যাপার হলে বিশেষ কেউ মাথা ঘামতো না। কিন্তু একজন যুবতী অভিনেত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ অনেক কাগজেই ফলাও করে খবরটা ছাপা হয়েছে। ভুবনেশ্বর থেকে এসেছেন তিনজন পুলিশ অফিসার। এই রহস্যের কিনারা করার ভার ওড়িশার পুলিশ দফতরের। ওড়িশার অফিসারদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমাদের আলাপও হয়েছে, তাঁর নাম অর্জুন মহাপাত্র। বেশ দক্ষ অফিসার বলে মনে হয়। ব্যবহারও খুব ভদ্র।

তবে, অর্জুন মহাপাত্র ইংরিজিতে ছাড়া কথা বলেন না। আমরা ওড়িয়া ভাষা মোটামুটি বুঝতে পারি, আমাদের বাংলাও স্থানীয় লোক ঠিক বুঝে নেয়। অন্যদের সঙ্গে ওড়িয়া-বাংলা মিলিয়ে মিশিয়ে আলোচনা চালাতে কোনো অসুবিধে হয় না, কিন্তু অর্জুন মহাপাত্র খুবই ইংরিজিওয়ালা!

অর্জুনবাবু এখানে রবীনবাবুর উপস্থিতি খুব একটা পছন্দ করেন নি। তাঁর ধারণা পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ওড়িশার ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে। রবীনবাবু যে এখানে ছুটিতে এসেছেন, তাঁর অফিসিয়াল পজিশান নিয়ে তদন্ত করছেন না, এটা অর্জুন মহাপাত্র ঠিক বিশ্বাস করছেন না। তিনি মুখে অবশ্য বলছেন, অফ কোর্স আপনার মত একজন অভিজ্ঞ অফিসারের পরামর্শ ও সাহায্য পেলে আমরা খুশিই হবো।

অর্জুন মহাপাত্র ছ' ফুটেরও বেশি লম্বা, চোখ দুটি উজ্জ্বল এবং চঞ্চল। সকলের সঙ্গেই তিনি ভালো ব্যবহার করেন, অথচ সকলকেই তিনি সন্দেহ করেন বলে মনে হয়। টিপিক্যাল ডিটেক-টিভ। আমার ওপরেও তাঁর কোনো সন্দেহ আছে কি না কে জানে?

চন্দ্রা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল আমার বাড়িতে, সেদিন ঠিক কি কি কথা হয়েছিল, তা নিয়ে তিনি আমাকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট জেরা করলেন, সঙ্গে একটা ছোট টেপ রেকর্ডার।

অর্জুন মহাপাত্রই বললেন যে, ম্যাড্রাস থেকে আরও দু'জন ডুবুরি এসেছে, তারা সন্ধ্যেবেলাতেই জলে নেমে পড়েছে।

আমার জবানবন্দী শেষ হবার পর আমি অর্জুনবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি ইচ্ছে করলে এখন গোপালপুর ছেড়ে চলে যেতে পারি? তাতে কোনো অসুবিধে আছে কি?

অর্জুনবাবু খুবই অবাক হয়ে বললেন, আপনি চলে যাবেন কি না, তা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন? অফ কোর্স। আপনাকে হ্যারাস করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য খুবই দুঃখিত। আপনাকে এত কথা জিজ্ঞেস করছিলাম, যদি সিচুয়েশানটার বুঝতে কিছু সাহায্য হয়। অফ কোর্স আপনি যে-কোনো সময় যেখানে খুশি যেতে পারেন।

অফ কোর্স অর্জুন মহাপাত্রর একটা মুদ্রাদোষ।

ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আবার বললেন, যদি খুব অসুবিধে না হয়, আরও দু' একটা দিন থেকে যান না। মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে এসে গল্প করে যাবো। এই ব্যাপারটা সল্‌ভ করতে আর দু' দিনের বেশি লাগবে না। অফকোর্স আপনার যদি অন্য কোনো কাজ থাকে, তা হলে আটকাতে চাই না।

এটা ওঁর অনুরোধ না প্রচ্ছন্ন আদেশ তা বোঝা গেল না।

আমি খানিকটা জেদের সঙ্গেই বললাম, নাঃ, কাল বিকেলেই আমি চলে যাবো ঠিক করেছি। বেরহামপুর থেকে রাত্তিরের ট্রেন ধরবো।

অর্জুন মহাপাত্র এবারে আরও ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, তা হলে আমার গাড়ি আপনাকে বেরহামপুরের স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে। টিকিট কাটা আছে আপনার? নো প্রবলেম···

অর্জুন মহাপাত্র চলে যাবার মিনিট দশেক পর একটা গাড়ি এসে থামলো আমার বাড়ির সামনে। সদর দরজা খোলা, ভেতরে ঢুকে এলেন সন্তোষ মজুমদার, তার সঙ্গে সুনেত্রা ও আরও দুই ব্যক্তি। সুনেত্রার মুখখানায় রাগ ও বিষণ্ণতা মাখা।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, উঠুন স্যার, পায়ে জুতো গলিয়ে নিন, একবার আমাদের হোটেলে চলুন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, কী ব্যাপার ?

সন্তোষ মজুমদার বললেন, চলুন না। একা একা বসে থাকেন, আমাদের জন্য একটু সময় দিতে পারবেন না ? আমরা কি এতই খারাপ লোক ?

—আরে নাঃ, যাঃ কী বলছেন! হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে এসেই আমাকে যেতে বলেছেন, কেন আবার কিছু ঘটেছে !

—নতুন কিছু ঘটেনি। তবে, আমাদের ইউনিটের লোকজন ক্রমশ খেপে যাচ্ছে। সবাইকে আর সামলানো যাচ্ছে না। ওড়িশার পুলিশ আমাদের খুব হ্যারাস করছে।

—তার মানে ?

—মহাপাত্র সাহেব অর্ডার দিয়েছেন যে আমাদের ইউনিটের কোনো একজন লোকও এখন গোপালপুরের বাখরে যেতে পারবে না। আচ্ছা ভাবুন তো, কী মুশকিলের ব্যাপার। ফিলমের এত বড় ইউনিট, সবাই কি এক জায়গায় বেশিদিন পড়ে থাকে ? অনবরত লোক যাতায়াত করে। যার দু' এক দিনের কাজ, সে কাজ শেষ হলেই চলে যায়। আর যেদিন কাজ, তার আগের দিন আনানো হয়, ঠিক কি না ? সবাইকে এক মাস ধরে হোটেলে রেখে খাওয়ালে যে করপোরেশানের বাজেট হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমাদের প্রোডাক-শানের জিনিসপত্তর আনাবার জন্য দু' তিনজনকে প্রায় প্রত্যেকদিন কলকাতায় পাঠাতে হয়, সে-সবও বন্ধ।

আমি সন্তোষবাবুর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলাম। এটা ওঁদের পক্ষে একটা সত্যিকারের সমস্যা বটে, কিন্তু এই সমস্যা সমাধানে আমার তো কোনো হাত নেই।

সন্তোষ মজুমদার আবার বললেন, দেখুন, আমাদের মধ্যে একটা অত্যন্ত স্যাড ব্যাপার ঘটে গেছে। চন্দ্রা ফিলম লাইনে নতুন এলেও সবাই ওকে পছন্দ করতো। ভালো মেয়ে, যথার্থ ভালো মেয়ে, ট্যালেণ্ট ছিল, রাইজ করতে পারতো। তার এইরকম হলো, সেজন্য সবাই খুব জেনুইন দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু কাজও তো করে যেতে হবে। আপনি তো জানেন স্যার, ফিলম প্রোডাকশান মানে একটা বৃহৎ যজ্ঞ। সময় নষ্ট করলেই হাজার হাজার টাকা ক্ষতি।

নিতান্ত কথার কথা হিসেবেই আমি বললাম, আজ তো সারাদিনই প্রায় বৃষ্টির জন্য শুটিং বন্ধ রইলো।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, সেই জন্যই আজ সারা রাত আবার শুটিং সিডিউল রেখেছি। হোটেলের কাছাকাছিই হবে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, নাইট ফর ডে কাজ হবে।

—সন্তোষবাবু, আপনারা সারারাত শুটিং করবেন, সেখানে আমি গিয়ে কী করবো?

—শুটিং দেখতে আপনাকে ডাকছি না। সেসব শুরু হবে রাত দশটা থেকে। লাইটিং করতে, ট্রলি বসাতে অনেক সময় লেগে যাবে। তার আগে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত একটা গেট টুগেদারের ব্যবস্থা করেছি। সেখানে একবার আপনাকে আসতেই হবে যে। পুলিশদের বলেছি, আরও দু' চারজন গণ্যমান্য লোক আসছেন, সেখানে অর্জুন মহাপাত্রর কাছে আমাদের সমস্যাটা তুলবো। আপনাকে আর কিছু করতে হবে না, শুধু একটি মরাল সাপোর্ট দেবেন। সামান্য খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, একবার চলুন।

অন্য দুই ভদ্রলোকের মধ্যে একজন প্রোডাকশান ম্যানেজার ও অন্যজন সহ-পরিচালক, তাঁরাও এমন পেড়াপিড়ি করতে লাগলেন যে আর না বলা গেল না।

আমি বললাম, সাতটা বাজতে তো দেরি আছে, আমি যাচ্ছি আধ ঘণ্টা পরে।

সন্তোষবাবু বললেন, ঠিক আসবেন তো? গাড়ি পাঠাবো?

আমি বললাম, না, হেঁটেই যাবো। সারাদিন একটুও হাঁটা হয়নি সমুদ্রের ধারে।

হঠাৎ অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে চেঁচিয়ে উঠে সন্তোষ মজুমদার বললেন, জানেন, আজ দুপুর থেকে পল্লবকে থানায় ডিটেইন করে রেখেছে? আমরা এই মাত্র তার সঙ্গে দেখা করতে গেসলাম, দেখা করতেই দিল না। এ কি মগের মুল্লুক?

আমি তাকালাম সুনেত্রার দিকে।

সুনেত্রা অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বললো, আপনার বন্ধু রবীনবাবুই ওর নামে লাগিয়েছে।

সন্তোষ মজুমদার বললেন, রবীনবাবু আর ওঁর স্ত্রীকেও গেট-

টুগেদারে ডেকেছি। তুই আবার ওঁদের সামনে কিছু বলে বসিস না।

সুনেত্রা বললো, যদি ওরা পল্লবকে না ছাড়ে, পল্লবের ঘাড়ে মিথ্যে দোষ চাপায়, তা হলে আমি অনেক কিছু ফাঁস করে দেবো। ঐ রবীনবাবুকে আমি ছাড়বো না। উনি চন্দ্রার পিছনে অনেকদিন ধরে ঘুর ঘুর করেছেন।

॥ ৯ ॥

সারাদিন বর্ষার পর বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সমুদ্রের ধারে কিছু কিছু মানুষ রয়েছে আজ। এক জায়গায় পাঁচ ছ' জন যুবক-যুবতীর একটি দল গান গাইছে একসঙ্গে। এরা নতুন এসেছে মনে হয়।

আমি হাঁটছি খুব আস্তে আস্তে। কাল চলো যাবো ঠিক করে ফেলার পর আজ সমুদ্রকে নতুন করে ভালো লাগছে যেন। কাল সকালে অন্তত দু' তিন ঘণ্টা স্নান করতে হবে।

ঠিক চন্দ্রার মতন একটি নারীকে আমি দু' বার দেখেছি এই বেলাভূমিতে। সে কি আমার চোখের ভুল? দু' বারই যুবতীটি মিলিয়ে গেছে আমার চোখের সামনে থেকে। মিলিয়ে গেছে মানে অদৃশ্য হয়ে যায়নি, মেয়েটি রক্তমাংসের জীবন্ত নিশ্চিত, কিন্তু আমি তার মুখ দেখতে পাইনি ভালো করে। চন্দ্রার সঙ্গে এমনই মিল যে আমি ভয় পেয়ে গেছি।

রবীনবাবু আর প্রতিমার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমি খুলে বলতে পারিনি। ব্যাখ্যা করতে পারবো না যে। প্রত্যেকেরই কিছু কিছু গোপন কথা থাকে।

সুনেত্রা বলে গেল, সে রবীনবাবু সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। রবীনবাবু যে চন্দ্রাকে আগে থেকে চিনতেন, সে কথা আমাকে জানান নি। সম্ভবত প্রতিমাও জানেন না।

দূরে দেখা যাচ্ছে আলোকোজ্জ্বল হোটেলটি।

আজও এক জায়গায় বাঁধা আছে দু' তিনটে নৌকো। এখান থেকেই একটা নৌকোয় চন্দ্রা মিলিয়ে গেছে সমুদ্রে। তারপরেও আর একটা নৌকোয় আমি বসে থাকতে দেখেছিলাম চন্দ্রার মতন এক রহস্যময়ী নারীকে। এটাই আমাকে সবচেয়ে অস্বস্তিতে ফেলেছে।

দুপুরবেলা লাল ছাতা মাথায় যে-মেয়েটি হেঁটে গেল, তাকে কি শুধু আমি একাই দেখেছি? যাঃ, এটা হতেই পারে না। এসব আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না. এরকম অভিজ্ঞতাও আমার আগে কখনো হয়নি।

দু' জন বয়স্ক ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে করতে যাচ্ছেন। এঁদের আগে দেখিনি। এঁরা বোধহয় চন্দ্রার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা কিছুই জানেন না।

পুলিশ শেষ পর্যন্ত পল্লবকে অ্যারেস্ট করলো? পল্লবের সঙ্গেই চন্দ্রার শেষ দেখা হয়েছিল, চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের আগে থেকেই কিছু একটা সম্পর্ক ছিল। সুতরাং পল্লবের ওপর প্রথম খানিকটা সন্দেহ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণত খুনের গল্পে দেখা যায়, প্রথমে যার ওপর সন্দেহ হয়, পাঠকরা যাকে খুনী বলে ধরে নেয়, সে আসলে নির্দোষ। ঘটনা হঠাৎ মোড় নেয় অন্য দিকে, আসল খুনী বেরিয়ে আসে।

এখানে পল্লবই যদি শেষ পর্যন্ত ভিলেনই হয় তা হলে ব্যাপারটা বড়ো সাদামাটা হয়ে যাবে।

রবীনবাবু চন্দ্রাকে আগে থেকে চিনতেন, সেটা তাঁর স্ত্রীর কাছেও গোপন করে গেছেন। সেই জন্যই কি চন্দ্রার কেসটা নিয়ে রবীনবাবু এতখানি ইনভল্‌ভড হয়ে পড়েছেন?

উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছেন প্রতিমা আর তাঁর মেয়ে। প্রতিমার হাতে একটা টর্চ।

প্রতিমা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, বৃষ্টির পর আজ আকাশটা কী সুন্দর হয়েছে দেখেছেন? আজ জ্যোৎস্নাও উঠেছে তাড়াতাড়ি।

আমি এতক্ষণ ভালো করে আকাশ দেখিনি, অন্য এলেবেলে বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছিলাম। একটু হেসে বললাম, কাল আমি চলে যাবো, তাই আমার জন্য এত সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটেছে।

প্রতিমা বললেন, কালই যাবেন কেন, আর দু' একদিন থাকুন। অন্তত শনিবার পর্যন্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ শনিবার পর্যন্ত থেকে যান।

—কেন, শনিবার স্পেশাল কিছু আছে?

—আমার মেয়ের জন্মদিন। এখানেই সেলিব্রেট করবো। আপনি থাকলে ভালো লাগবে।

আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নেড়ে বললুম, যদি না থাকি, আগে থেকেই হ্যাপি বার্থ ডে জানিয়ে রাখছি।

মেয়েটির হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। এখানে কোথায় ফুলের দোকান, আমি দেখিনি। প্রতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ফুলগুলো কিনলেন?

প্রতিমা বললেন, না, কিনিনি। 'পেরলস' নামে যে বাড়িটা আছে, সেখানে টবে অনেক রকম ফুল হয়েছে। ঐ বাড়ির এক মহিলা নিজে থেকেই দিলেন। আচ্ছা, আজকে আকাশের জ্যোৎস্না আর এই রজনীগন্ধা, এই নিয়ে কোন্ গানটা মনে পড়ে বলুন তো?

কেউ জিজ্ঞেস করলে তক্ষুনি কোনো গান বা কবিতা আমার মনে পড়ে না। ধাঁধাঁর উত্তর দিতে আমি সব সময় ফেল করি। টিভির কুইজ প্রোগ্রামে অল্প বয়েসী ছেলে-মেয়েরা যখন শক্ত শক্ত প্রশ্নের চটাস চটাস করে উত্তর দেয়, তখন তাদের প্রতি আমার বেশ শ্রদ্ধা হয়।

আমি চুপ করে আছি দেখে প্রতিমা বললেন, পারছেন না? আপনাকে একটা ক্লু দিচ্ছি। গানটা 'উদয়ের পথে' ফিলমে ছিল।

আমার চোখ কপালে উঠলো। 'উদয়ের পথে' তো আমার প্রায় হামাগুড়ি বয়েসের ছবি। সে ছবি আমি দেখিনি, নাম শুনেছি মাত্র। প্রতিমাই বা সেই সিনেমা দেখলেন কী করে?

ছোট মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠলো।

প্রতিমা বললেল, ওকে আমি এইমাত্র গানটা শেখালাম। খুকু, দু' লাইন শুনিয়ে দে তো।

মেয়েটি গেয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো, ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধ সুধা ঢালো, চাঁদের হাসি···

আমি বললাম, বাঃ, আপনার মেয়েরও তো বেশ ভালো গানের গলা।

প্রতিমা বললেন, আমাদের ওখানে একটু পরে চলে আসুন না। বারান্দায় বসে আড্ডা দেওয়া যাবে। ও কোথা থেকে একটা ভালো হুইস্কি জোগাড় করে এনেছে।

আমাকে যে পাম বীচ হোটেলে সিনেমা ইউনিট নেমন্তন্ন করেছে, সেটা বলতে গিয়েও চেপে গেলাম। বোঝাই যাচ্ছে, ওরা রবীন-প্রতিমাকে ডাকেনি। প্রতিমা অবশ্য নেমন্তন্ন পেলেও নিতেন না।

বললাম, দেখি, ঐদিকে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

প্রতিমা বললেন, হ্যাঁ, ঘুরে আসুন, একটু পরে আসুন। রবীনও কোথায় যেন বেরিয়েছে, খানিকক্ষণের মধ্যে ফিরবে নিশ্চয়ই।

প্রতিমা আবার এগিয়ে গেলেন মেয়েকে নিয়ে।

এই পরিবারটি বেশ চমৎকার। স্বামীটি ভদ্র, শিক্ষিত। প্রতিমাও বিদুষী এবং মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। মেয়েটিও বেশ ভালো হয়েছে, পড়াশুনোর দিকে খুব ঝোঁক। ওঁদের ছেলেও বেশ ব্রাইট শুনেছি।

সবাই এঁদের একটি আদর্শ, সুখী পরিবারই মনে করবে। কিন্তু প্রতিমার কোনো একটা গুরুতর অসুখ আছে, বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না। রবীনবাবু ফিলমের অভিনেত্রীদের সঙ্গে গোপনে ঘোরাঘুরি করেন। এই সব গোপন ব্যাপারগুলো না জানলেই ভালো হতো।

চন্দ্রা যেদিন অদৃশ্য হয়ে যায়, সেদিনও আকাশে জ্যোৎস্না ফিনকি দিচ্ছিল। চন্দ্রার স্বভাবটিও ছিল খুব রোমান্টিক ধরণের, সাহিত্যবোধ ছিল, কবিতা পড়েছে অনেক, সেই সব টানেই ও দেখা করতে গিয়েছিল আমার সঙ্গে। চন্দ্রা ফিলম লাইনে না এসে লেখিকা হবার চেষ্টা করলো না কেন? তা হলে ওকে আমরা হারাতাম না।

॥ ১০ ॥

পাম বীচ হোটেলের ভেতর দিকে দুটি লম্বা টানা বারান্দা। মাঝখানের চত্বরে শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। এখানেই চেয়ার পেতে বসেছে অনেকে।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই আমার প্রথমে মনে হলো, চন্দ্রা থাকলে সেই ছুটে এসে আমাকে কোথাও বসাতো। এই ইউনিটের লোকজনের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রার সঙ্গেই আমার বেশি আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীর অনেকেই লেখকদের বিশেষ পাত্তাই দেয় না।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অবশ্য বিশেষ দেখা যাচ্ছে না এখানে। অচেনা লোকজনই বেশি। সন্তোষ মজুমদারকেও দেখতে পাচ্ছি না, কেউ আমাকে অভ্যর্থনা করলো না, আমার বেশ বোকা বোকা লাগতে লাগলো। এখানে না এলেই ভালো হতো। এখনই সরে পড়লে কেমন হয়?

আবার ধরা পড়ে গেলাম সুগত মজুমদারের হাতে। সে একটু দূর থেকে দু' হাত বাড়িয়ে এসে বললো, এই যে দাদা, আসুন, কোথায় বসবেন? ঐ বারান্দার কোণটায় চলুন না, ওখানে দারুণ হাওয়া।

এখন সুগতকে আমার তেমন অপছন্দ হলো না। আমাদের দু'জনেরই কলম নিয়ে কারবার, এই মিলটা তো আছে, সুতরাং আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসতে পারি।

বারান্দার কোণে একটা চেয়ারে আমাকে বসিয়ে সুগত এক দৌড়ে গিয়ে আমার জন্য এক গেলাস হুইস্কি আনতে গেল। আমি চোখ বুলিয়ে দেখলাম, অর্জুন মহাপাত্র কিংবা এখানকার পুলিশ লোকজন কেউই এখনো আসেন নি। তবে একজন ভদ্রলোককে ঘিরে অনেকে খাতির করছে, তাঁর মুখের চাপা অহংকারের ভাব দেখে মনে হয় কোনো উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। কে যেন বলছিল, ওড়িশার হোম সেক্রেটারির গোপালপুরে বেড়াতে আসার কথা আছে।

সুগত ফিরে এসে বললো, দাদা, আর একটু বসুন। সিগারেট জোগাড় করে আনি। আমার প্যাকেটটা ভুলে ফেলে এসেছি।

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, আমার কাছে যথেষ্ট সিগারেট আছে। বসো। তবে, তোমাকে একটা কথা আগেই বলে রাখছি সুগত, তুমি 'জীবন যে-রকম'-এর প্রসঙ্গ আমার কাছে একদম তুলবে না।

সুগত এক গাল হেসে বললো, দুপুরবেলা আপনি অত রেগে গেলেন, বুঝতে পারিনি, আপনি ঐ ব্যাপারে এত টাচি। না, না, ঐ প্রসঙ্গ আর তুলবো না। কেয়া চক্রবর্তীর তো অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল, আর এখানে চন্দ্রার কেসটা তো স্পষ্ট মার্ডার।

আমি ভুরু তুলে বললাম, তাই নাকি। স্পষ্ট?

সুগত মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে বললো, চন্দ্রা সাঁতার জানতো না। কেউ তাকে নৌকোসুদ্ধু জলে ঠেলে দিয়েছে।

—নৌকা বাঁধা থাকে বালির অর্ধেকটা ওপরে।

—জোয়ারের সময় জল বেড়ে যায়।

—তা জানি। কিন্তু সমুদ্র তো হঠাৎ গভীর হয় না। অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাঁটু জল, বুক জল থাকে, সাঁতার না জেনেও কেউ নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ে বেঁচে যেতে পারে।

—কেউ যদি আগেই চন্দ্রাকে গলা মুচড়ে মেরে তারপর নৌকাসুদ্ধু ঠেলে দেয়?

—সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে তো।

—পুলিশ অলরেডি প্রুভ করে ফেলেছে।

—তাই নাকি?

—পল্লব দত্তকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে ভুবনেশ্বরে পাঠিয়ে দিয়েছে জানেন না?

—ওর নামে চার্জ এনেছে?

—ইয়েস। মার্ডার চার্জ। আমি রিলায়েবল সোর্স থেকে জেনে এসেছি।

আমি সুগতর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সাংবাদিকদের অধিকাংশ খবরই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। অনেক সাংবাদিক একেবারে স্পটে গিয়ে যেসব খবর বার করে আনে, সেগুলো আসলে

অর্ধেক গুজব। পল্লব খানিকটা ফুর্তিবাজ ধরনের, বেশি মদ খায়, নারীঘটিত দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু তাকে খুনী বলে কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। মানুষ চিনতে কি আমার এত ভুল হয়?

সঙ্গে সঙ্গে সুনেত্রার রাগী মুখটা মনে পড়লো। সে রবীনবাবু সম্পর্কে এখন কুৎসা ছড়াবে। পল্লব দত্তর তো যা হবার তা হবেই, এখন রবীনবাবুর জীবনেও নেমে আসবে অশান্তি। প্রতিমা কীভাবে গ্রহণ করবেন তাঁর স্বামীর নামে ঐ অভিযোগ।

আমার মনটা বেশ দমে গেল।

হোটেলের বাইরে ডান পাশটায় কিছু গাছপালার মধ্যে তীব্র আলো জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে অনেকগুলি কণ্ঠস্বর। অন্যমনস্ক-ভাবে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওখানে কী হচ্ছে?

সুগত বললো, ওখানে শুটিং-এর জন্য সেট পড়েছে। আজ হোল নাইট শুটিং হবে। সন্তোষবাবু তো বললেন, তিন দিনের মধ্যে আউটডোরের কাজ শেষ করে ফেলবেন।

—এত তাড়াতাড়ি?

—এর পর স্টুডিয়োতে কিছু কাজ আছে। আজ রাত্তিরে আপনি থাকবেন নাকি শুটিং-এ?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লাম।

বাগানের দিক থেকে বারান্দায় উঠে এলেন সন্তোষ মজুমদার। আমাকে এখানে আসার জন্য অত ঝুলোঝুলি করেছিলেন বিকেল-বেলা বাড়িতে গিয়ে, এখন আমাকে দেখতেই পেলেন না। চিন্তিত মুখে চলে গেলেন সামনের দিকে। পরিচালকদের অনেক কিছু সামলাতে হয়, তাদের মাথায় সব সময় দুশ্চিন্তার বোঝা।

সুগত বললো, এ ছবি সুপার হিট হবেই।

—সে কি? তুমি আগে থেকেই কী করে বুঝলে?

—ছবি যতই রদ্দি হোক, কত লাখ টাকার পাবলিসিটি পেয়ে গেল বুঝছেন না? কলকাতার সমস্ত ডেইলি পেপারে ফাস্ট পেজ রিপোর্ট বেরিয়েছে। চন্দ্রার লাস্ট ছবি বহু পাবলিক দেখতে আসবে। চন্দ্রা মার্ডারড হয়ে সন্তোষ মজুমদারের কিন্তু উপকারই করে গেল।

অনেক সাংবাদিক এই ধরনের সিনিক্যাল কথা বলে স্মার্ট হবার চেষ্টা করে। আমি কোনো মন্তব্য করলাম না।

সুগত আবার বললো, বাংলা ফিলমে নায়িকার খুব অভাব। চন্দ্রার অনেক স্কোপ ছিল। আর দু' এক বছরের মধ্যে ওর হিরোইন হবার চান্স খুব ছিল। চন্দ্রা এ পর্যন্ত ঠিক ভালো রোল পায়নি। বেচারাকে নেগলেক্ট করা হচ্ছিল। কেন জানেন? ফিলম লাইনের লোকজনদের সঙ্গে চন্দ্রা যে ঠিক মতন মিশতে পারতো না। বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ে, সেটাই ওর ডিস-কোয়ালিফিকেশান। পল্লব-ফল্লবের মতন বাজে টাইপের লোকরা জ্বালাতন করতো ওকে। আমি চন্দ্রার জন্য গৌতম ঘোষকে রিকোয়েস্ট করেছিলুম, যদি নেকস্ট ছবিতে নেয়।

হোটেলের প্রবেশপথে শোনা গেল অনেকগুলো পায়ের শব্দ। একসঙ্গে সাত-আটজনের একটি দল ঢুকলো। প্রথমে চোখে পড়ে দীর্ঘকায় অর্জুন মহাপাত্রকে। সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা আরও দু'জন অফিসার। তাঁদের পাশে রবীনবাবু এবং তাঁর পেছনে পল্লব দত্ত।

হ্যাঁ, কোনো ভুল নেই, পল্লবকে সঙ্গে করে এনেছেন ওঁরা। সুগতর খবর ভুল। এর মধ্যে পল্লবকে ভুবনেশ্বর নিয়ে যাওয়া, আবার সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

পল্লবের হাতে হাতকড়াও নেই, কেউ তাকে ধরেও রাখেনি। বরং তার মুখখানিতে ক্লান্তির ছাপ থাকলেও তাতে খানিকটা খুশির ভাবও ঝিলিক দিচ্ছে।

আমি সুগতকে বললাম, ঐ তো পল্লব ফিরে এসেছে।

সুগত চোখ বড় বড় করে, ফিরে এসেছে? বলেই এক লাফ দিয়ে চলে গেল সেদিকে। কী জানি, আগের খবরটা এর আগেই সে তার পত্রিকায় পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা?

আমি দূর থেকে দেখতে লাগলাম, অর্জুন মহাপাত্র প্রথমে বড় সরকারি কর্মচারীটির কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বললেন। অনেকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ওঁদের। একটু পরে ওঁরা দু'জন শুধু সন্তোষ মজুমদারকে নিয়ে চলে গেলেন আড়ালে।

বোঝাই যাচ্ছে যে ওখানে কোনো জরুরি কথাবার্তা চলছে।

উল্টো দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সুনেত্রা। সে স্থির

দৃষ্টিতে চেয়ে আছে পল্লবের দিকে। কিন্তু নিজে থেকে এগিয়ে আসছে না। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পল্লব একবার সুনেত্রার দিকে হাত তুললো।

মিনিট পাঁচেক বাদে রবীনবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে আমার পাশে এসে বসলেন। একজন বেয়ারা ট্রে-তে ড্রিংকস সাজিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, রবীনবাবু এক গেলাস বীয়ার তুলে নিয়ে এক চুমুকেই শেষ করলেন অর্ধেকটা।

তারপর খানিকটা হাঁপ ছেড়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নতুন ডেভেলাপমেণ্ট কী হয়েছে, আপনি আন্দাজ করতে পেরেছেন?

আমি দু'দিকে মাথা নেড়ে বললাম, না। পল্লবকে ছেড়ে দিয়েছে দেখছি।

—শুধু ছেড়ে দেয়নি। পল্লবের ওপর থেকে সব সন্দেহও চলে গেছে। হি ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যাবাভ বোর্ড।

—কী করে এটা প্রমাণ হলো?

—চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের দেখা হবার পরেও আর একজন চন্দ্রাকে জীবিত অবস্থায় দেখেছে।

—সত্যি? সেটা এতদিন জানা যায়নি? কে দেখেছে?

রবীনবাবু চেয়ারটা আরও কাছে টেনে এনে বললেন, সেই লোকটিকে আমি খুঁজে বার করেছি। কিন্তু সেই ক্রেডিটটা আমি নিতে চাই না। ওড়িশা পুলিশের ওপর এই কেসের দায়িত্ব, তারাই সলভ করেছে, এটাই সবাই জানবে। আমি শুধু লোকটাকে নিয়ে অর্জুন মহাপাত্রর সামনে দাঁড় করিয়ে বলেছিলুম, এবার আপনি জেরা করুন, ইট্‌স ইয়োর বেবি।

—লোকটি কে?

—পল্লবকেই এখানকার পুলিশ মার্ডারার বলে ধরে নিচ্ছে দেখে আমার খটকা লেগেছিল। চন্দ্রার সঙ্গে পল্লবের ঝগড়াঝাটি হলেও ঝট করে সে তাকে খুন করবে কেন? খুনের মোটিভ আরও অনেক গভীর হয় সাধারণত। সেই জন্যই আমার মনে হলো সামথিং মাস্ট বী ডান। পল্লব নিজেই স্বীকার করেছে যে চন্দ্রাকে সে নৌকোর ওপর বসে থাকতে দেখেছিল।

—সে নিজে স্বীকার না করলে হয়তো এ-কথাটা কেউ জানতেই পারতো না।

—মোস্ট প্রোবাবলি তাই হতো। ফিলম ইউনিটের প্রত্যেককে বিভিন্ন হোটেলের বোর্ডারদের, আপনাকে এবং আমাকেও পুলিশ-এর পর জেরা করেছে যে আর কেউ সেই রাত্রে চন্দ্রাকে দেখেছিল কিনা। কেউ দেখেনি কিংবা স্বীকার করেনি, তাই তো?

—এ পর্যন্ত তাই ছিল।

—আমরা পুলিশরা অত্যন্ত দায়সারা ভাবে কাজ করি। আরও অনেককে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। একটা নৌকায় চন্দ্রা উধাও হয়েছে, নৌকো নিয়ে যাদের কাজ-কারবার।

—নৌকোর মালিক কিছুই জানে না বলেছে। নৌকোটা ভাড়া দেওয়া হতো, সেই নৌকোটাও তো এখনো উদ্ধার হয়নি।

—পল্লবকে ওরা অ্যারেস্ট করছে দেখে আমার মনে হলো, আর একটু খোঁজ করা দরকার। এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা জেলেদের বস্তি আছে, চলে গেলাম সেখানে।

—অত দূরের লোক এখানকার ঘটনা কী করে জানবে? সন্ধ্যের পর জেলেরা তো কেউ এদিকে আসে না।

—অনেক সময় ইমপ্রোবাবল জায়গা থেকেও মূল্যবান খবর পাওয়া যায়। আমি জেলেদের বস্তিতে গিয়ে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জনকে ইন্টারোগেট করেছি। নিজের দায়িত্বে। এর মধ্যে এদের ভাষা খানিকটা লিখে নিয়েছি। সেটা কাজে লেগে গেল। ঐ জেলেরা তেলেগু আর ওড়িয়া মিশিয়ে একটা বিচিত্র ভাষা বলে। চেষ্টা করলে বোঝা যায়।

—সেখানে একজনকে পেলেন?

—জানেন বোধহয় যে এই জেলেরা খুব ভোরে, সূর্যাস্তের আগেই সমুদ্রে ভেসে পড়ে। অনেক দূরে চলে যায়। ফেরে সন্ধ্যের সময়। কারুর কারুর ফিরতে রাত হয়ে যায়। আমি ওদের বস্তিতে গিয়ে দেখলাম, অধিকাংশ পুরুষমানুষই জাল আর নৌকো নিয়ে বেরিয়ে গেছে। রয়েছে শুধু মেয়েরা আর বাচ্চারা, আর কিছু বৃদ্ধ। অনেকগুলো বাড়ি ঘোরার পর এক বাড়িতে একজনকে পাওয়া গেল, সেও প্রায় বৃদ্ধই, তবে কাজের ক্ষমতা আছে, এখনো

মাছ ধরতে যায়। কিন্তু আজ সে যায়নি, তার খুব জ্বর। তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, অন্তত আড়াই-তিন ডিগ্রি জ্বর হবেই। একেই বলে লাকি ব্রেক। লোকটার যদি আজ জ্বর না হতো, তা হলে আমার সব পরিশ্রম ব্যর্থ হতো!

আমি আর উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারছি না। রবীনবাবু সবিস্তারে কাহিনীটি বলতে শুরু করেছেন, আসল কথাটা এখনো যাচ্ছে না। আমি ওঁর হাত চেপে জিজ্ঞেস করলাম, সেই লোকটা কী দেখেছে?

রবীনবাবু আমার চোখে চোখ রেখে বললেন, এই লোকটি সেই রাতে মাছ ধরে একটু দেরি করে ফিরছিল। ওর সঙ্গে আর একজনও ছিল। দ্বিতীয় লোকটির দেখা আমি পাইনি, সে আজ সমুদ্রে গেছে। এরা ফেরবার সময় দেখেছে, পরিষ্কার চাঁদের আলো ছিল, তটরেখা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রে একটা নৌকো ভাসছে, তাতে বসে আছে একটি মেয়ে, সে দাঁড় নিয়ে বাইছে আর গুনগুন করে গান গাইছে। একটু দূরে গেলে আর ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায় না, তাই ওরা গানটাও স্পষ্ট শুনেছে।

আমি অবিশ্বাস ও উত্তেজনার সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে বললাম, ওরা চন্দ্রাকে দেখতে পেয়েছিল? তবু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেনি কেন?

রবীনবাবু বললেন, সে চিন্তাও ওদের মাথায় আসেনি! ওদের নৌকোটা চন্দ্রার নৌকোর খুব কাছ দিয়ে এসেছে, ইন ফ্যাক্ট আমি চন্দ্রার একটা ছবি দেখাতে লোকটি মোটামুটি চিনতেও পারলো। সে বললো, সব ভদ্রলোকের মেয়েদের একইরকম দেখতে লাগে, নৌকোয় মেয়েছেলেটির এইরকমই চেহারা। পাশ দিয়ে আসবার সময় চন্দ্রা ওদের কাছে কোনো সাহায্য চায়নি, সুতরাং ওরা আর মাথা ঘামাবে কেন? এরকম কেউ কেউ তো নৌকো নিয়ে বেড়াতে যায়!

—এ কথা ওরা এত দিন পুলিশকে জানায়নি? কেন?

—জানায়নি, তার কারণ ওদের কেউ জিজ্ঞেস করেনি। ওরা আগ বাড়িয়ে বলতে আসবে কেন? ওদের এই দেখার যে কোনো গুরুত্ব আছে, তাও ওরা জানে না। তাছাড়া, এই সব গরিব

লোকরা এমনিতেই পুলিশকে ভয় পায়, নিজের থেকে পুলিশের কাছে এসে এরা কক্ষনো কিছু বলে না।

—চন্দ্রাকে ওরা জীবন্ত দেখেছে। চন্দ্রার হাতে দাঁড় ছিল, অর্থাৎ চন্দ্রা ইচ্ছে করে নৌকো নিয়ে গেছে!

—এগ্‌জ্যাক্‌টলি! এই বৃদ্ধ জেলেটিই তার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছে।

—চন্দ্রা সাঁতার জানতো না, সে ওভাবে ঝুঁকি নিয়ে গেল কেন?

—সে খুব রোমান্টিক মেয়ে, সাহসও ছিল যথেষ্ট। তা ছাড়া খুব রাগ কিংবা অভিমান হলে তার কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকতো না। জেদের বশে সে এমন অনেক কিছু করে ফেলতে পারতো! গোপালপুরের সমুদ্র এমনিতে ঠাণ্ডা, পুরীর মতন এখানে বড় বড় ঢেউ ওঠে না, ব্রেকার নেই, তাই দেখলে ভয় লাগে না। অনেক দূর পর্যন্ত এমনিতেই যাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ স্রোতের টান আসে। এই সমুদ্রে বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে এর অগেও দু-চারজন ডুবে গেছে। কোনো কারণে হয়তো চন্দ্রার প্রচন্ড অভিমান হয়েছিল, তাই সে একা একা—

আমি চুপ করে মাথা নিচু করে রইলাম। সিগারেটটা বিস্বাদ লাগছে। রবীনবাবু আমার চেয়ে বেশি চিনতেন চন্দ্রাকে, তিনি ওর চরিত্র ভালো বুঝবেন।

আরও একটা চিন্তা আমার মাথায় এসে গেল। রবীনবাবু জেলেদের বস্তিতে গিয়ে অত পরিশ্রম করলেন কেন? নিতান্ত কৌতূহল? পল্লব ধরা পড়ার পরই তিনি বেশি উদ্যমী হয়ে উঠলেন। তাঁর নিজেরও কিছু স্বার্থ ছিল এতে। সুনেত্রা কি রবীনবাবুকেও শাসিয়ে গেছে সামনাসামনি?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার সঙ্গে এর মধ্যে সুনেত্রার দেখা হয়েছিল!

রবীনবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, সুনেত্রা? না তো! হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

আমি একটু থতমতো খেয়ে গেলাম। এই প্রশ্নটা করা আমার উচিত হয়নি। সামলে নেবার জন্য একটু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমি বললাম, সুনেত্রারও দৃঢ় ধারণা ছিল, চন্দ্রা ইচ্ছে করেই নৌকো

নিয়ে ভেসে গেছে। এর আগেও চন্দ্রা এরকম হঠকারী কাজ দু-একবার করতে গিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে গেছে। আজ বিকেলেই সুনেত্রা এই কথা বলে গেছে আমাকে।

রবীনবাবু বললেন, না সুনেত্রার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। এটা আমারই নিজস্ব হানচ কিংবা ইনটিউশন বলতে পারেন। আজ দুপুরেই হঠাৎ আমার ধারণা হলো, জেলেদের বস্তিতে গেলে একটা কিছু পাবোই!

—লোকটি কোনো কারণে মিথ্যে বলছে না?

—শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলবে কেন? এরা এমনিতেই মিথ্যে খুব কম বলে, কিছু একটা বানিয়ে গল্প বলার ক্ষমতাই নেই। মাছ ধরা আর দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া ছাড়া আর কোনো চিন্তাই এদের মাথায় আসে না। এই বুড়োটির নাম ধরণী ধর, খুবই নিরীহ ধরনের মানুষ। থানায় গিয়ে অর্জুন মহাপাত্রদের সামনে সে একই কথা বলেছে। এর সঙ্গে যে লোকটি ছিল, সে ফিরে আসবার পর আলাদাভাবে তাকে জিজ্ঞেস করেও ঠিক এক ঘটনা পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে আর কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই।

দূরে দেখা গেল অর্জুন মহাপাত্র, সন্তোষ মজুমদার ও অন্য ব্যক্তিটি কী সব পরামর্শ করে ফিরে এলেন। সন্তোষ মজুমদারের মুখে বেশ একটা উৎফুল্ল ভাব।

অর্জুন মহাপাত্র একটা উঁচু জায়গায় উঠে দাঁড়ালেন খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে। তারপর হাততালি দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, সাইলেন্স। সাইলেন্স!

সব গুঞ্জন থেমে গেল, সকলে ফিরে তাকালো সেই সুঠাম, সপ্রতিভ পুলিশ অফিসারটির দিকে।

অর্জুন মহাপাত্র বললেন, প্লিজ গিভ মি পেশেন্ট হিয়ারিং ফর আ ফিউ মিনিটস। লেডিজ অ্যান জেন্টেলমেন, ইউ হ্যাভ অ্যান ইমপর্টান্ট অ্যানাউন্সমেন্ট টু মেক…

॥ ১১ ॥

অনেকদিন আগে আমি একটা ফাঁকা বাড়িতে রাত কাটিয়েছিলাম। তখন আমার ছাত্রজীবন চলছে। সব কিছুই যুক্তি দিয়ে বিচার করি। রাজনীতি থেকে প্রেম-ভালোবাসা, সব কিছুর মধ্যেই যুক্তি খুঁজি। যাবতীয় সংস্কারকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিই।

বাড়ির সবাই দেওঘর বেড়াতে গিয়েছিলেন. আমি একা ছিলাম বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। সামনেই আমার পরীক্ষা ছিল।

আমার নিজস্ব ঘরটি ছিল একতলায়, রাস্তার পাশে। চোর-ডাকাত সম্পর্কে আমার মনে একটু একটু ভয়ের ভাব ছিল, ভূত-টুতের ভয় কখনো পাইনি। বিছানার পাশে একটা ভোজালি রাখতাম তখন।

এক দিন অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশুনো করে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। তখন কত রাত তা জানি না, ঘর অন্ধকার, আমার ডান পাশের জানলার একটা পাল্লা খোলা, একটা পাল্লা ভ্যাজানো। সেখান থেকে শব্দ হচ্ছে, ঠক ঠক ঠক। কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে ঠিক তিনবার ঐ রকম শব্দ।

ঝিমঝিম করছে রাত, রাস্তায় আর কোনো শব্দ নেই, তখন যে-কোনো শব্দই বেশ জোর মনে হয়। তবে হাওয়ার শব্দ নয়, কেউ ঐ শব্দটা করছে বিশেষ কারণে।

প্রথমেই মনে হলো, চোর!

কিন্তু চোর এমন শব্দ করে আমাকে জাগাবার চেষ্টা করবে কেন? কিংবা সে দেখতে চাইছে, আমি জেগে আছি কি না!

ছিঁচকে চোর হলে ধমক দিয়ে ভাগিয়ে দেওয়াই উচিত। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি তীব্র গলায় বললাম, কে? কে ওখানে?

শব্দটা কিন্তু থামলো না। কেউ সাড়া দিল না। আবার স্পষ্ট শোনা গেল, ঠক ঠক ঠক। ঠক ঠক ঠক!

জানলার খোলা পাল্লাটা দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আমরা সারা গায়ে শিহরণ হলো। কিসের এই ডাক?

আমি নিজের চক্ষু রগড়ে ভালো করে ঘুমকে তাড়ালাম ও ভয় ভাঙালাম। আমি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। ভূত-প্রেত নিয়ে চমৎকার গল্প হয়, কিন্তু বাস্তবে ওসব কিছু নেই। মৃত্যুর পর মানুষ আবার শরীর ধারণ করে আঙুল ঠোকার মতন ঠক ঠক শব্দ করতে পারে না। অসম্ভব!

উঠে গিয়ে তক্ষুনি জানলার ধারে গিয়ে দেখার বদলে আমি শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, শব্দটা কিসের হতে পারে? আমার যুক্তিবাদী মন কিছুতেই হেরে যেতে রাজি নয়।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতন মনে পড়লো, টিকটিকি!

এবার উঠে গিয়ে বন্ধ পাল্লাটা খুলে ফেললাম এক টানে। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। একটা বেশ গাবদা গোছের টিকটিকি একটা বড়সড় মথ কামড়ে ধরেছে। মথটা তখনো মরেনি, ডানা ঝাপটাচ্ছে। টিকটিকিটা মাথা ঠুকে ঠুকে মথটাকে মারবার চেষ্টা করছে। তাতেই অবিকল আঙুল ঠোকার শব্দ।

সে রাতে আমি অদ্ভুত একটা আনন্দ পেয়েছিলাম। কত লোক রাত্তিরবেলা কলাগাছ কিংবা বেলগাছ দেখে ভয় পায়। কত লোক নিশুতি রাতে অলৌকিক পায়ের শব্দ শোনে। আসলে এসবই সামান্য ব্যাপার। একটু চিন্তা করলেই সহজ সমাধান পাওয়া যায়।

কিন্তু এক এক সময় যুক্তিবোধ আমাকে ছেড়ে যায়। যুক্তি প্রয়োগ করার আগেই চোখ এবং কানকে চমকপ্রদভাবে বিশ্বাস করে বসি। হয়তো, কোনো কোনো জায়গায়, যুক্তির বদলে বিশ্বাস করে নেবার জন্য মনটা আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে।

ঠিক সেইরকমই একটা ঘটনা আচমকা ঘটে গেল এই পাম বীচ হোটেলে, এত লোকজনের মাঝখানে। আমার বুক কাঁপিয়ে দিল শুধু না, আমার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

অর্জুন মহাপাত্রের ঘোষণার পর উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে বেশ একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

চন্দ্রার মৃত্যু এখন পুরনো হয়ে গেছে। তার জন্য শোক করার অবকাশ এখানে কারুর নেই। চন্দ্রার বাবা ও বোনের কথা অবশ্য আলাদা, কিন্তু তাঁরা এখানে আসেননি। অন্য সবাই একটা চাপা আশংকা ও অস্বস্তিতে ভুগছিল। পল্লবকে অ্যারেস্ট করেছিল পুলিশ,

সেই সূত্র ধরে আরও কাকে কাকে হয়রানি করবে তার ঠিক নেই। সকলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে শুটিং-এর ক্ষতি করা হচ্ছিল। এই সব কিছুর জন্যই দায়ী চন্দ্রা। চন্দ্রার বাবাও পুলিশের কাছে নানা অভিযোগ করেছিলেন ফিলম ইউনিটের নামে। মামলা করার ভয় দেখিয়েছেন।

এখন সব কিছু চুকে বুকে গেছে। চন্দ্রা নিজেই বোকার মতন একা একা সমুদ্রে নৌকো বাইতে গিয়েছিল। তার ফলে সে ডুবে মরেছে। এতে অন্য কারুর দায়িত্ব নেই। সবাই এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। এই ক'দিন একটা থমথমে আবহাওয়া ছিল, এখন এখানে বইছে মুক্তির হাওয়া। বেশ কোলাহলের সঙ্গে পানাহার চলছে।

এরই মধ্যে আর একটাও খবর পাওয়া গেল যে ডুবুরিরা উদ্ধার করেছে নৌকোটা। সেটা একটা ডুবো পাথরের খাঁজে আটকে ছিল। চন্দ্রার বডি অবশ্য পাওয়া যায়নি, তবে ডুবুরিরা আশা রাখে, তারা কালকের মধ্যে পেয়ে যাবে ঠিক।

আমি অবশ্য মনে মনে চাইছিলাম, চন্দ্রার শরীরটা যেন পাওয়া না যায়। তার পচা-গলা-বীভৎস দেহটা দেখে আর কী লাভ হবে? বরং তা হাঙর ও মাছেদের খাদ্য হোক।

সারা দুপুর-বিকেল রবীনবাবু অনেক পরিশ্রম করেছেন বলে বেশ খানিকটা বীয়ার পান করে ফেললেন। তাঁর মুখটা লালচে হয়ে গেছে। তিনি অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, কিছুদিন আগেও এক জেলার এস পি ছিলেন, এখন স্পেশাল ব্র্যাঞ্চের ডি আই জি, অপরাধ ও খুন-জখম সম্পর্কে তাঁর যথেষ্টই অভিজ্ঞতা থাকার কথা। তবু তিনি চন্দ্রার মতন একজন অল্পখ্যাত অভিনেত্রীর ব্যাপার নিয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন মনে হচ্ছে।

সুগত এসে আবার যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। সে নানা-রকম বকবক করে যাচ্ছে, সব সময়ই একটা না একটা কিছু পিলে চমকানো খবর তার বানানো চাই-ই। যেমন এইমাত্র সে জানালো যে সন্তোষ মজুমদারের এই ফিলমটির গল্প আলফ্রেড হিচককের একটা সিনেমা থেকে হুবহু টোকা। চন্দ্রা যে ভূমিকাটা করছিল, সেটা অরিজিন্যাল ছবিতে ছিল অড্রি হেপবার্নের।

রবীনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হলিউডের সব ছবিই তাঁর নখদর্পণে। অড্রি হেপবার্ন যে হিচককের কোনো ছবিতেই অভিনয় করেনি, সেটা রবীনবাবুর চোখ দেখেই বোঝা গেল।

তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আমি বাড়ি যাই। প্রতিমাকে কিছু বলে আসিনি। লেটেস্ট ডেভেলাপমেণ্ট শুনলে সে চমকে যাবে, খুশিই হবে।

খুশি শব্দটা আমার কানে লাগলো। এখানে এই শব্দটা কি মানায়?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন, খুশি হবেন কেন!

রবীনবাবু বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরে বললেন, না, মানে চন্দ্রার এরকম পরিণতি খুবই স্যাড। তবে, মিস্ট্রিটা সলভ্ড হয়ে গেল, এটা সকলের পক্ষেই একটা গ্রেট রিলিফ, তাই না?

সুগত বললো, সব কিছু সলভ্ড হয়ে গেছে, কী করে বললেন? চন্দ্রা যদি সুইসাইড করেও থাকে, তা হলেও, সুইসাইডে ইনস্টিগেট করাও একটা ক্রাইম। কেউ যদি চন্দ্রার মনে খুব জোর আঘাত দিয়ে থাকে, তার ফলে যদি চন্দ্রা আত্মহত্যা করতে চায়, তা হলে যে আঘাত দিয়েছে, সে দায়ী হবে না? তরুণী বধূরা নিজেরাই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগালে শাশুড়ি আর দেওরকে ধরা হয় কেন?

রবীনবাবু বললেন, এখন আর এসব কথা শুনতে ভালো লাগছে না। আমি এবার যাই।

আমিও রবীনবাবুর সঙ্গে উঠে পড়তে চাইছিলাম, কিন্তু সুগত আমার হাত চেপে ধরলো জোর করে। ঈষৎ নেশাগ্রস্ত গলায় বললো, আপনার জন্য তো এখানে বাড়িতে আপনার বউ অপেক্ষা করে বসে নেই, আপনার অত তাড়া কিসের?

মাতালের সঙ্গে জোরাজুরি করা মুশকিল, আমাকে আর একটু বসতেই হলো।

এরপর সুগত একে একে পাঁচজনের নামে ছড়াতে লাগলো সন্দেহের বীজ। তারা প্রত্যেকেই চন্দ্রার মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত হতে

পারে, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ে চন্দ্রার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে। এই ছবির অন্যতম প্রোডিউসার নাকি সরাসরি বলে দিয়েছিল, চন্দ্রা একবার অন্তত তার শয্যাসঙ্গিনী না হলে চন্দ্রার বড় রোল পাবার কোনো আশা নেই। সন্তোষ মজুমদারও চন্দ্রাকে বলেছিলেন, তুই একবার মাত্র প্রোডিউসারের ভাগ্নের সঙ্গে শুবি, তাতে এত আপত্তি কিসের? এতে কি তোর শরীরে কোনো দাগ পড়বে?

সিনেমার কাগজে অভিনেত্রীদের নিয়ে এরকম গুল্প-গল্প প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই থাকে। আমি মন দিয়ে সুগতর কথা শুনছিলামই না। তাকিয়ে ছিলাম সমুদ্রের দিকে।

সুগত নিজের বুক চাপড়ে বললো, চন্দ্রাকে সব সময় কে বাঁচাতো জানেন? এই আমি! এই শালা সুগত মজুমদার। চন্দ্রা আমাকে খুব বিশ্বাস করতো। যে-কোনো বিপদ-আপদে ছুটে আসতো আমার কাছে তা জানেন? এবারই আমার পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল···

মাতালদের নিয়ে এই এক মুশকিল, যত নেশা বাড়ে, ততই তারা আমি আমি শুরু করে। পৃথিবীর সব কিছুই যেন সেই আমিকে কেন্দ্র করে ঘোরে।

আমি বাথরুমে যাবার নাম করে উঠে পড়ার চিন্তা করছি, এমন সময় সেই কাণ্ডটি ঘটলো।

বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা খালি চেয়ার পড়েছিল। অনেকক্ষণ থেকেই সেটা খালি দেখছি। হঠাৎ চোখের একটি পলক ফেলতেই দেখলাম, সেখানে একটি নারী মূর্তি বসে আছে। এক মুহূর্ত আগেও চেয়ারটা খালি ছিল, কী করে সেখানে একজন এসে বসে পড়লো?

চন্দ্রা! এবার আমি তার মুখও দেখতে পাচ্ছি। সেই চেহারা, সেই চোখ। না, কোনো ভুল নেই।

আমার শরীর অসাড় হয়ে গেল, আমার গলার কাছে যেন দম আটকে এলো। চন্দ্রা যদি রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ফিরে আসে, তা হলে আমার আনন্দে চিৎকার করে ওঠার কথা। কিন্তু আমার কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না!

আমার যুক্তিবোধ নিঃস্ব হয়ে গেছে। আমি নিজের চোখে চন্দ্রাকে দেখছি, ভয় পাচ্ছি, অথচ পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না।

সুগত অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, সে লক্ষ্য করছে না কিছুই। আমি স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছি চন্দ্রার দিকে। তার সমস্ত চুল খোলা, আগে সব সময় এরকম খোলা চুলেই তাকে দেখছি, তার গাঢ় নীল রঙের শাড়িটাও যেন আমার চেনা।

এক সময় আমি অতি কষ্টে সুগতকে একটা ঠ্যালা মেরে ফ্যাসফেসে গলায় বললাম, সুগত, ও কে ?

সুগত অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, কার কথা বলছেন ?

এবার আমার সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি লাগলো। শুধু আমিই একা দেখবো, আর কেউ দেখতে পাবে না ?

আমি বকলাম, ঐ যে, চেয়ারে বসে আছে, দ্যাখো, দ্যাখো।

সুগত এবার বারান্দার প্রান্ত দেখে হেসে উঠে বললো, ওকে চেনেন না ? ও তো বিশাখা ! আপনার সঙ্গে আলাপ নেই ?

আমি নিজে স্পষ্ট দেখছি চন্দ্রাকে, আর সুগত বলছে, ওর নাম বিশাখা ? এ আবার কীরকম ধাঁধাঁ ? আমার চোখে কি এত ভুল হতে পারে ?

সুগত চেঁচিয়ে ডাকলো, এই বিশাখা, বিশাখা, একবার এদিকে এসো তো।

মেয়েটি ডাক শুনে মুখ ফেরালো, উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। তখনও আমি চন্দ্রাকেই দেখছি। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে ! আশেপাশের সব কিছুই যেন অলীক। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

মেয়েটি কাছে আসবার পর সুগত একটা চেয়ার টেনে বললো, বসো। বিশাখা, তুমি সুনীলদাকে চেনো না ?

মেয়েটি পাতলা করে হেসে বললো, হ্যাঁ, খুব ভালোই চিনি।

আমার সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় চন্দ্রা ঠিক এই কথাই বলেছিল।

সুগত আবার বললো, সুনীলদা, বিশাখাকে কলকাতা থেকে আনানো হয়েছে। ও চন্দ্রার ভূমিকায় বাকি অংশটার শুটিং চালিয়ে

দেবে। বিশাখা খুব ভাল অ্যাকট্রেস! তবে বড্ড মুডি। এক এক সময় আমাদের চিনতেই পারে না। এই বিশাখা, তুমি এরই মধ্যে মেক আপ নিয়ে বসে আছো, এক্ষুনি শুটিং শুরু হবে নাকি?

মেয়েটি বললো, একটু বাদেই। আমাকে দিয়েই প্রথম শট নেবে।

তক্ষুনি সব কিছু জলের মতন সরল হয়ে গেল। চন্দ্রার বদলে তার অসমাপ্ত ভূমিকাটুকু চালিয়ে দেবার জন্য বেছে বেছে অন্য একটি অভিনেত্রীকে নিয়ে আসা হয়েছে। মোটামুটি চন্দ্রার সঙ্গে চেহারার মিল আছে, শরীরের গড়ন, মুখের ভাব অনেকটা একরকম। সিনেমায় এরকম ডাবলের ব্যবহার তো প্রায়ই হয়। ভাল করে মেক আপ দিলে ধরতে পারা শক্ত।

এও সেই টিকটিকির ব্যাপার। কিন্তু আমি আগেই বুঝতে পারিনি কেন? আমার মন প্রস্তুত ছিল না। এমনি এক মুহূর্তের মধ্যে চেয়ারে এসে ওর বসাটাও আমার মনে হয়েছিল অস্বাভাবিক, অলৌকিক! খালি চেয়ারে হঠাৎ একটি মেয়ে এসে বসতে পারে না?

জ্বর ছেড়ে যাবার মতন আমার শরীরে ঘাম ফুটে উঠছে বিন্দু বিন্দু। এই মেয়েটিকেই আমি বৃষ্টির মধ্যে লাল ছাতা মাথায় হেঁটে যেতে দেখেছিলাম, একেই দেখেছিলাম, সন্ধের আবছা আলোয় একটা নৌকোর ওপর বসে থাকতে।

চন্দ্রা একটা নৌকো নিয়ে হারিয়ে গেছে, তা কি বিশাখা জানে না? তবু সে সন্ধেবেলা একা একটা নৌকোয় বসে ছিল কেন? বেশি বেশি সাহস দেখাতে?

মুখখানা পেইন্ট করা, ভুরু দুটি গভীরভাবে আঁকা, গালে লালচে আভা, বিশাখা আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টিতে। আমি অস্বস্তি কাটাতে পারছি না। নিজের কাছেই নিজের পরাজয়ে খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

বিশাখা জিজ্ঞেস করলো, এই গল্পটা বুঝি আপনার লেখা? জানতুম না তো!

আমি আস্তে আস্তে বললাম, না, আমার লেখা নয়।

সুগত বললো, অরিজিন্যাল গল্পটা কার লেখা ভগবান জানেন! বাংলা স্টোরিটা হিচককের ফিলম দেখে মেরে তিনজনে বানিয়েছে। নাম থাকবে সন্তোষ মজুমদারের। আজকাল পরি-

চালকরা একই সঙ্গে কাহিনী, চিত্রনাট্য, সঙ্গীত, রূপসজ্জা, পাবলিসিটি, সব কিছুর ক্রেডিট নেয়। সব্বাই সত্যজিৎ রায়ের এ'টো কলাপাতা! হে-হে-হে!

বিশাখা বললো, ডায়ালগগুলো কে লিখেছে? আমারটা একটু বদলানো দরকার। আমি ঠিক মুড আনতে পারছি না। আচ্ছা সুনীলদা, আমার একটা ডায়ালগ শুনবেন? "দুঃখী মানুষদের সব সময় দুর্বল ভেবো না। দুঃখীদের অভিমান তোমার মতন অত্যাচারীদের এক সময় পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে!" এখানে অভিমান কথাটা কি ঠিক খাটে? ক্রোধ হওয়া উচিত না? আর যদি অভিমান রাখতেই হয়, তা হলে পুড়িয়ে ছারখারের বদলে বন্যার মতন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে বললে ভালো শোনায় না?

একটু আগেই আমার একটা বিরাট ভুল ভেঙেছে, আমি এখনো স্বাভাবিক হতে পারিনি, এই সব ব্যাপারে মতামত দেবার ইচ্ছেও হলো না আমার। শুকনো গলায় বললাম, আগেরটাও চলে যেতে পারে!

বিশাখা তবু ছেলেমানুষি সুরে বললো, না আপনি ঠিক করে বলুন, অভিমান, না ক্রোধ, কোনটা এখানে ঠিক হবে?

—তুমি আমাকে চিনলে কি করে, বিশাখা?

—বাঃ, আপনাকে দেখেছি তো কতবার। কবি সম্মেলনে আপনার কবিতা পাঠ শুনেছি! আমিও অনেক জায়গায় কবিতা আবৃত্তি করি! একদিন শিশির মঞ্চের একটা অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে আমারও ছিল। কিন্তু আপনি গোড়ার দিকে নিজেরটা পাঠ করেই চলে গেলেন, আমাদেরগুলো শুনলেন না। সেদিন আমার খুব রাগ হয়েছিল!

সুগত বললো, অভিমান না রাগ?

বিশাখা বললো, সুনীলদার সঙ্গে কি আমার পরিচয় ছিল যে অভিমান হবে? যখন তখন মানুষের রাগই হয়। অভিমান অনেক গভীর।

সুগত বললো, মেয়েদের কোনটা রাগ আর কোনটা অভিমান বোঝা মুশকিল! আমার ওপর যেন কক্ষনো অভিমান করো না! তোমার নাম সন্তোষবাবুর কাছে কে স্যাজেস্ট করেছে জানো? এই

আমি ! চন্দ্রার বদলে ওরা কাকে নেবে, কাকে নেবে ভাবছিল, আমি সন্তোষবাবুকে বললুম, বিশাখাকে নিন। খুব ট্যালেণ্টেড অ্যাকট্রেস, গলাখানা ভালো, মেকআপ দিলে চেহারাটাও উতরে যাবে।

বিশাখা বললো, এই, উতরে যাবে মানে ?

সুগত বললো, আই মীন, চন্দ্রার সঙ্গে অনেকটা মিলে যাবে। আমার কথা শুনেই তো ওরা ডিসিশান নিল। এরা আমার মতামতের মূল্য দেয় বুঝলে ?

সুগত আবার আমি, আমি শুরু করেছে। এবার উঠতেই হয়।

বিশাখার দিকে তাকিয়ে বললাম, একদিন তোমার আবৃত্তি নিশ্চয়ই শুনবো। আজ চলি।

বিশাখা দারুণ অবাক হবার ভঙ্গি করে বললো, চলে যাচ্ছেন ? শুটিং দেখবেন না ?

হেসে বললাম, না, শুটিং দেখা আর হবে না। আমার একটা অন্য কাজ আছে।

বিশাখা অনুনয়ের সুরে বললো, একটুক্ষণ থাকুন, প্লিজ একটু দেখে যান।

সুগত ফিক ফিক করে হাসতে হাসতে বললো, জোর করে ধরে রাখো। কিস্যু কাজ নেই, সুনীলদা কেটে পড়ার তালে আছে। এখন গিয়ে রবীনবাবুর সঙ্গে আড্ডা মারবে।

বিশাখা সচকিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, রবীনবাবু মানে যিনি একটু আগে এখানে বসেছিলেন ? পুলিশের ডি আই জি ?

—তুমি তাকেও চেনো নাকি ?

খানিকটা রহস্যের ভঙ্গিতে ঠোঁট মুচড়ে হেসে বিশাখা বললো, হ্যাঁ, ভালোই চিনি। উনি অবশ্য এখানে আমাকে একবার দেখেও না চেনার ভান করলেন !

রবীনবাবু পুলিশ অফিসার হলেও ফিলম সম্পর্কে খুব উৎসাহী। বাংলা ফিলমের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তিনি চন্দ্রা আর বিশাখাকে আগে থেকেই চেনেন।

আমার দিকে ঘুরে বিশাখা বললো, আপনি কিন্তু আজ পালাতে পারবেন না, একটুখানি থাকতেই হবে !

কিছুতেই এড়ানো গেল না, আমাকে বসে যেতেই হলো।

অর্জুন মহাপাত্র সদলবলে চলে গেলেন একটু আগেই। অন্যান্য অতিথিরাও বিদায় নিচ্ছেন। সন্তোষ মজুমদার আমাদের সঙ্গে এসে বসলেন একটু। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, আজ থেকে আবার নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবো। ওয়েদারটাও কী রকম ফাইন হয়ে গেছে দেখুন। আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে না।

একটু বাদে একজন এসে খবর দিল, লাইটিং রেডি। এখুনি শুটিং শুরু হবে!

রাত প্রায় সাড়ে নটা। এখনও শুটিং দেখার জন্য বেশ কিছু মানুষ ভিড় করেছে। তাদের সরিয়ে রাখা হয়েছে একটা দড়ির রেখার বাইরে। আমাকে একটা চেয়ার পেতে দেওয়া হলো তার উল্টো দিকে।

বিশাখাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছে একটা গাছের সঙ্গে। শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরা। শাড়িটা খসে পড়ে আছে পায়ের কাছে। শুধু শায়া-ব্লাউজ পরা অনেক মেয়েকেই দেখা যায় ফিলমে, কিন্তু শাড়িটা খুলে পায়ের কাছে রেখে দেওয়ায় একটা অতিরিক্ত সাজেশান এসেছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে ভিলেইন, হাতে তার একটা চাবুক। তাকে বড্ড বেশি ভিলেইন ভিলেইন দেখতে। মনে হয় গত শতাব্দীর কোনো ডাকাতের সর্দার। বিশাখা হচ্ছে নায়িকার বোন, ভিলেইন তাকে ধরে এনে নায়ককে ব্ল্যাক মেইল করবে। এই দৃশ্যেই কোনো এক সময় বীরের মতন উপস্থিত হবে নায়ক। তারপর ফাইটিং সিন।

যদি আলফ্রেড হিচককের কোনো ছবি থেকে গল্পটা মারা হয়েও থাকে, তবু যারা বাংলায় তার রূপান্তর ঘটিয়েছে, তাদের উর্বর মস্তিষ্কের প্রশংসা করতেই হয়। এরকম একটা রগরগে দৃশ্য কল্পনা করা হিচককের অসাধ্য ছিল!

চন্দ্রার এটাই ছিল টপ সিন, সে আর সুযোগ পেল না।

চন্দ্রার মতনই বিশাখাও পড়াশুনো করা মেয়ে মনে হলো। সাহিত্য-রুচি আছে। সংলাপের ভুল শব্দ ব্যবহার নিয়ে সে খুঁত-খুঁত করে। অথচ এই সব মেয়েদেরই কী সব বিশ্রী, কুরুচিপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়!

সন্তোষ মজুমদার মাথায় একটা সাদা রঙের টুপি পরেছেন। এটা বিদেশী পরিচালকদের অনুকরণ। তিনি ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছেন চারদিকে। দু-তিনবার ক্যামেরায় লুক থ্রু করলেন। একজনকে ডেকে বলে দিলেন বিশাখার মেক আপটা সামান্য বদলে দিতে। খোলা চুল পিঠ থেকে সরিয়ে আনা হলো বুকের ওপর।

এদের কৃতিত্ব আছে, বিশাখাকে এখন অবিকল চন্দ্রার মতন দেখাচ্ছে।

এক সময় সন্তোষ মজুমদার একটা সাদা রঙের চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে ডান হাত উঁচু করে চিৎকার করে বললেন, টেকিং! সাইলেন্স! সাইলেন্স! স্টার্ট সাউণ্ড!

উত্তর এলো, রানিং!

সন্তোষ মজুমদার আবার সজোরে বললেন, ক্যামেরা!

একজন ক্ল্যাপ স্টিক দিয়ে বলে গেল, সিন ফর্টি নাইন, টেক ওয়ান!

ক্যামেরা প্যান করে এসে ফোকাস করলো বিশাখার মুখের ওপর। বিশাখা ক্লান্ত চোখ মেলে আস্তে আস্তে তাকালো সামনে। তারপর মুহূর্তের পর মুহূর্ত চুপ। সন্তোষ মজুমদার ঠোঁট নাড়ছেন, অর্থাৎ তিনি ডায়ালগ শুরু করতে বলছেন।

বিশাখা কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে লাগলো, আমি তোমাদের চিনেছি। আমি তোমাদের সবাইকে চিনেছি। আমার দরজা বন্ধ ছিল—

সন্তোষ মজুমদার প্রায় আর্তনাদের মতন বলে উঠলেন, কাট! কাট!

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ক্যামেরা। সন্তোষ মজুমদার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে নেমে এসে বললেন, কী হলো? এটা কোন সিনের ডায়ালগ? এখানে তো এই ডায়ালগ ছিল না?

একজন সহকারী পরিচালক চিত্রনাট্যের ফাইল নিয়ে ছুটে এলো। ফরফর করে পাতা উল্টে সে বললো, এ ডায়ালগ অনেক আগের সিনের, চন্দ্রাই করে গেছে। বিশাখাকে আমি এই সিনের ডায়ালগ দিয়েছি, কতক্ষণ করে মুখস্থ করালুম।

বিশাখা শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

সন্তোষ মজুমদার তাকে এক ধমক দিতেই সে বললো, ভুল বলেছি ?

সহকারী পরিচালকটি বললো, ভুল মানে ? একেবারে উল্টো-পাল্টা ডাবিং-এর সময় লিপ মিলবে না !

বিশাখা এবার লজ্জায় জিভ কেটে বললো, ও মা, কী করে ভুল হল ? আমার কক্ষনো মুখস্থ ভুল হয় না ।

চিত্রনাট্য দেখে আবার সংলাপ ঝালিয়ে নিল বিশাখা ।

সবাই ফিরে গেল যে যার জায়গায় । ভিলেইন একবার শপাং করলো চাবুকটা । সন্তোষ মজুমদার আবার চেয়ারে উঠে হাত তুলে বললেন, সবাই রেডি ? টেক নাম্বার টু । স্টার্ট সাউণ্ড !

ক্যামেরা ঘুরে এসে বিশাখার মুখের সামনে স্থির হয়েছে, বিশাখা ভিলেইনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল । তারপর বললো, আমি···আমি···আমি···আমি···

রীতিমতন তোতলাচ্ছে বিশাখা, আমি শব্দটা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারছে না । সন্তোষ মজুমদারের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ । শুধু শুধু ফিলমের ফুটেজ খেয়ে যাচ্ছে । তিনি একসময় গর্জন করে উঠলেন, কাট ! কাট !

এবার তিনি চেয়ার ছেড়ে বিশাখার থুতনিতে একটা খোঁচা মেরে বললেন, এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে ? ভ্যালুয়েবল টাইম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ।

বিশাখা তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ।

সহকারী পরিচালক আবার ছুটে এসে বললো, আমি কোথায় পেলে ? আরম্ভটাই ভুল করলে ! আরম্ভটা হবে, দুঃখী মানুষদের দুর্বল মনে করো না··· ।

বিশাখা বললো, কী যে হলো, কিছুই বুঝতে পারছি না । কিছুতেই মনে আসছে না ।

সন্তোষ মজুমদার রাগে হাত-পা ছুঁড়তে লাগলেন ।

আমি ভেবেছিলাম বিশাখা হয়তো সংলাপ একটু আধটু বদলে দেবে, অভিমানের জায়গায় ক্রোধ চালিয়ে দেবে । কিন্তু সে কোনো কথাই বলতে পারছে না, এটি সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার । খুব নভিস অভিনেত্রীরাও এরকম করে না । বিশাখাকে তো বেশ সপ্রতিভই মনে হয়েছিল ।

বিশাখা সলজ্জভাবে একবার আমার দিকে তাকালো।

সন্তোষ মজুমদার আর একটা চেয়ার টেনে আমার পাশে এসে বললেন, নিন, একটা সিগারেট খান। আপনি এই প্রথম শুটিং দেখতে এলেন, অথচ কী রকম ধ্যাড়াচ্ছে বলুন তো। এটা একটা ভাইটাল সিন!

পাশ থেকে একজন হোমরা-চোমরা ধরনের লোক ফিসফিস করে বললেন, মেয়েটার ডায়ালগ অফ্ করে দিন না!

সন্তোষ মজুমদার বললেন, দাঁড়ান না, আর একটু দেখতে দিন না। শুধু একতরফা ভিলেন কথা বলে গেলে আর চাবুক হাঁকড়ালে জমে কখনো? মেয়েদের গলার আওয়াজেই একটা অন্য-রকম অ্যাপিল থাকে।

হোমরা-চোমরা ব্যক্তিটি ঠোঁট ওল্টালেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, আর তিনদিনের মধ্যে শেষ করতে হবে। একেই তো উটকো ঝঞ্ঝাটে অনেকটা সময় চলে গেল।

সন্তোষ মজুমদার আর কিছু না বলে সিগারেট টানতে লাগলেন।

সহকারী পরিচালকটি পাখি পড়াবার মতন করে বিশাখাকে ংলাপ মুখস্ত করাচ্ছে। বিশাখা খুব মনঃসংযোগ করে, চোখ বুজে বার করে উচ্চারণ করছে প্রতিটি বাক্য। দূরের দর্শকরা অধীর য়ে উঠেছে খানিকটা। শুটিং একেবারে জমলোই না এখনও র্যন্ত। ভিলেনের তর্জন গর্জন দেখলে তারা মজা পেত খানিকটা। ন্তু সে বেচারা শুধু একটু চাবুক নাড়ানো ছাড়া আর কোনো ুযোগই পায়নি।

অবশ্য অধিকাংশ শুটিংই এরকম। একই শট দু-তিনবার এন জ হয়, বারবার একই জিনিস দেখতে হয়। তবে, এরকম পার্ট ভুলে াওয়া সত্যিই অভিনব।

এখনও আকাশে বেশ জ্যোৎস্না আছে, ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোট মেঘ ানাগোনা করছে চাঁদের ওপর দিয়ে।

সন্তোষ মজুমদার খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, সিনটা িফিকাল্ট, তা ঠিকই। মেয়ে চরিত্রটা তো ভ্যাম্প নয়, ভদ্র ঘরের ায়ে। তার শাড়ি খুলে ফেলা হয়েছে বটে, কিন্তু কথা বলবে কান্না

কান্না গলায়। চন্দ্রা এই জায়গাটা একেবারেই পারছিল না। সে যে দিন ডিসঅ্যাপিয়ার করে, সেদিন দুপুরেও এই সিনটা দু-একবার চেষ্টা করা হয়েছিল। চন্দ্রার ঠিক এক্সপ্রেশান ফুটছিল না বলে প্রোডিউসাররা চেয়েছিল, সিনটায় চন্দ্রার ডায়ালগ সব বাদ দিয়ে দিতে। ওর শুধু বডিটা ইউজ করা হবে। কিন্তু এই মেয়েটা, বিশাখা, এ ভালো অভিনয় করে। এর না পারার কোনো কারণই নেই। এই বিশাখা স্মার্ট মেয়ে, সাঁতার আর অন্যান্য দু-একটা স্পোর্টসে মেডেল পেয়েছে, আবৃত্তি ভালো করে। চন্দ্রার চেয়ে ও অনেক সুপিরিয়ার অ্যাকট্রেস, আমি সিওর ছিলাম ও ভালো করবে।

এতক্ষণ বাদে আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে চন্দ্রার বদলে আগেই বিশাখাকে নেননি কেন?

সন্তোষ মজুমদার অদ্ভুতভাবে হাসলেন। তারপর বললেন, ফিলম লাইনের সব ব্যাপার আপনি বুঝবেন না। কাস্টিং-এর সময় অনেক কিছু কনসিডার করতে হয়। চন্দ্রা এখনো ঠিক প্রফেশনাল নয়, আই মিন, ছিল না। আর বিশাখা একটা স্টেজে নিয়মিত অভিনয় করে। শনি-রবিবার ডেট দিতে পারে না। ঠিক এই সময় অবশ্য ওদের নাটকটা বন্ধ আছে, আমরা লাকি···

একটু থেমে সন্তোষ মজুমদার আবার বললেন, বিশাখা যে এরকমভাবে সময় নষ্ট করবে, তা আমি কল্পনাই করতে পারিনি।

সহকারী পরিচালকটি বলে উঠলো, এবার ঠিক আছে সন্তোষদা! আরম্ভ করুন।

সন্তোষ মজুমদার আবার চলে গেলেন ক্যামেরার কাছে। লাইটিং-এর সামান্য পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়ে চ্যাঁচালেন, টেকিং! স্টার্ট সাউন্ড! ক্যামেরা!

আগের মতন আবার শুরু হলো। ভিলেনটি একেবারের বদলে তিনবার শপাং শপাং করলো চাবুক। ক্যামেরা বিশাখার মুখের ক্লোজ আপ ধরে আছে।

চোখ খুলে তাকালো বিশাখা, ভিলেনের বদলে পরিচালকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার চোখ দুটি যেন বেশি উজ্জ্বল।

বেশ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল, তাও সে কোনো শব্দ উচ্চারণ করছে না !

সন্তোষ মজুমদার অস্থির ভাবে বলে উঠলেন, কী হলো বিশাখা, ডায়ালগ দাও ! ডায়ালগ ! সুজিতের দিকে তাকাও।

বিশাখা তবু চেয়ে রইলো পরিচালকের দিকে। তার দৃষ্টিতে কোনো ভাষা নেই।

সন্তোষ মজুমদার আবার আদেশ দিলেন, বিশাখা, ডায়ালগ ! ডায়ালগ ! বিশাখা তবু চুপ।

সন্তোষ মজুমদার বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেস, দূর ছাই ! এ যে কলাগাছের অধম ! কাট ! লাইটস অফ !

তীব্র আলোগুলো হঠাৎ নিভে যেতেই বিশাখা ভেঙে পড়লো কান্নার ঝাপটায়। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলতেল লাগলো, আমি পারছি না ! আমি পারছি না ! কিছুতেই আমার মনে আসছে না !

॥ ১২ ॥

পরদিন বিকেলে আমার ফিরে যাওয়া হলো না।

কারণটা এমনই অকিঞ্চিৎকর যে কারুকে ঠিক বোঝানো যাবে না।

সকালবেলা সুগত এসে বললো, সুনীলদা, আপনি আজই কলকাতায় ব্যাক করেছেন ? চলুন, একসঙ্গে যাওয়া যাবে। আমারও আর এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। চন্দ্রার ব্যাপারটা ধামা চাপা পড়ে গেল। মিঃ অর্জুন মহাপাত্রও আজ যাচ্ছেন, ওঁর গাড়িতে আপনি গেলেও আমিও বেরহামপুর পর্যন্ত লিফ্ট নেবো। কলকাতায় আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

অর্জুন মহাপাত্রের গাড়িতে আমি যাবো না, আগেই ঠিক করেছিলাম। কিন্তু সুগতকে এড়ানো যায় কি করে ? ট্রেনের সারাটা সুগতের সাহচর্যে কাটানো আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় হলো না। একটু বেশি কথা বললেও সুগত ছেলেটি খারাপ

নয়। কিন্তু ট্রেনে আমি চুপচাপ বই পড়তে ভালোবাসি, সুগত সে সুযোগ আমাকে দেবে না।

সুতরাং ওকে বললাম, আজ আর ফেরা হবে না ভাই। আমার শরীরটা ঠিক ভালো লাগছে না। জ্বর জ্ব লাগছে, আর একটা দিন দেখে যাই।

সুগত চলে গেল। আমাকেও মিথ্যে কথার ফলভোগ করতে হলো। অনেক সময় মিথ্যে অজুহাতটা হঠাৎ সত্যি হয়ে যায়। দুপুরের দিকে আমার সত্যি সত্যি জ্বর এলো। সেই সঙ্গে পাতলা সর্দি।

টকাটক করে দু পেগ ব্র্যান্ডি মেরে দিয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়। এটাই সর্দি জ্বরের আমার নিজস্ব ওষুধ। এর পরে দুপুরটা টানা ঘুম দিতে পারলে জ্বর-টর ছেড়ে যেতে বাধ্য।

কিন্তু ঘুম এলো না। এ বই সে বইয়ের পাতা ওল্টাই, কোনো-টাতেই মন বসে না। বিকেলের দিকে রবীনবাবু দেখা করতে এলে আমি খুশিই হলাম বেশ। কারুর সঙ্গে একটু কথা বলতেই মন চাইছিল।

রবীনবাবু এসেই বললেন, এদের শুটিং তো একেবারে গড়বড় হবার জোগাড়। শুনেছেন কিছু?

আমি অবাক হয়ে বললাম, না তো! আবার কী গণ্ডগোল হলো?

রবীনবাবু বললেন, প্রথম কথা, বিশাখা এমন সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড করছে, যা একেবারে অবিশ্বাস্য! সে কান্নার জায়গায় হাসছে, হাসির জায়গায় কাঁদছে। মাঝে মাঝে এমন সব ডায়ালগ দিচ্ছে, যা শুনলে পিলে চমকে যায়! এই ছবিতে তা একেবারেই বেমানান। সবই যেন অভিমানের কথা!

আমি বললাম, বিশাখা বোধহয় এই ফিলমের রোলটা সিরিয়াসলি নেয়নি। একেই তো এলেবেলে পার্ট, তাও অন্যের ডাবল। ওর কেন উৎসাহ থাকবে বলুন!

রবীনবাবু বললেন, তা নয়, তা নয়। যত ছোটই পার্ট হোক, তবু তা সিরিয়াসলি নিতে হয়। বিশাখা যেন নিজেই বুঝতে পারছে না, কেন তার এত ভুল হচ্ছে! আরও কী কী হচ্ছে শুনুন!

সুনেত্রা হঠাৎ আছাড় খেয়ে পা মচকেছে। সন্তোষবাবুর গলা বসে গেছে ঠাণ্ডায়, এমনই বসে গেছে যে চিঁ চিঁ করে কী যে বলছেন, বোঝাই যাচ্ছে না। এরা এন এফ ডি সি থেকে নতুন ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, খুব চমৎকার কাজ হচ্ছিল, কিন্তু তার লেন্সে ফাঙ্গাশ দেখা দিয়েছে, ছবি ক্লিয়ার আসছে না। হঠাৎ যেন শনির দৃষ্টি পড়েছে এই ইউনিটটার ওপর। সন্তোষবাবু নাকি প্যাক আপ করে কালই ফিরে যাবেন ভাবছেন। এ যাত্রায় আর শুটিং কমপ্লিট হবে না।

এ সংবাদ শুনে আমার কোনো দুঃখ হলো না। এই ফিলমের শুটিং নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।

রবীনবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর ধারণা, এই ফিলম দলটির ওপর চন্দ্রার অভিশাপ লেগেছে!

আমি সামান্য হেসে বললাম, অভিশাপ আবার কী? প্রতিমা এই সব বিশ্বাস করেন বুঝি? ওঁর কথাবার্তা শুনে আগে তো মনে হয়নি।

—প্রতিমার কতকগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা আছে। প্রতিমার মতে, কোনো মানুষের অকালমৃত্যুর একটা সাইকিক এফেক্ট আশে-পাশের কিছু মানুষের ওপর পড়েই। সেটাকেই অনেকে বলে, একজনের আত্মা আর একজনের ওপর ভর করে। আত্মায় বিশ্বাস না করলেও এরকম কিছু কিছু ব্যাপার সত্যিই ঘটে। চন্দ্রা এই ফিলমটা কমপ্লিট করতে পারলো না, তার জায়গায় এসেছে বিশাখা। কিন্তু চন্দ্রার অতৃপ্তিই তাকে পদে পদে বাধা দিচ্ছে। নইলে বিশাখার মতন মেয়ে এরকম ভুল করবে কেন? এ সম্পর্কে আপনার কী মত?

—বুল শীট! মৃত মানুষের অতৃপ্তি হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় না! পৃথিবীতে কত মানুষ মরছে, তাদের জায়গায় অন্য মানুষ রিপ্লেসড হচ্ছে, প্রফেশনাল জগতে এরকম অনবরত চলছে। মনে করুন, একটা পত্রিকায় আমার ধারাবাহিক উপন্যাস চলছে, সেটা শেষ হবার আগেই যদি আমি মারা যাই, পত্রিকার সম্পাদক চুপ করে বসে থাকবেন? পরের সংখ্যা থেকেই নতুন একজনের উপন্যাস শুরু হবে। পরে যে লিখবে, তার কি কোনো গিল্টি ফিলিং হবে? নাকি, আমার অতৃপ্ত আত্মা তাকে ভয় দেখাবে?

—তা হলে বিশাখা এরকম ফেইল করছে কেন?

—বিশাখা সিম্পলি নার্ভাস ! সে পারছে না !

—আপনি বিশাখাকে আগে দেখেননি। চন্দ্রার তুলনায় বিশাখা অনেক টাফ, প্র্যাকটিক্যাল। সে নিয়মিত স্টেজে অভিনয় করে। তার এরকম নার্ভাসনেস বিশ্বাসই করা যায় না।

—বিশাখা মিস কাস্টিং হয়েছে। এই প্যানপেনে ভূমিকা, বাজে সংলাপ তার মুখ দিয়ে ঠিক মতন বেরুচ্ছে না !

—ইউনিটের অন্য লোকজনদেরও এরকম দুর্ঘটনা ঘটছে কেন বলুন ? সবই কাকতালীয়।

—দেখুন, কারুর সর্দিতে গলা বসে যাওয়া কিংবা ক্যামেরার লেন্সে ফাঙ্গাস পড়ার জন্যও যদি কোনো মৃত আত্মাকে দায়ী করা হয়, তা হলে আমার বলবার কিছু নেই।

—আপনি যাই বলুন, কাল সন্ধের পর এখানকার বাতাসে আমি যেন মাঝে মাঝেই চন্দ্রার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। আমি নিজে এসব ঠিক বিশ্বাস করি না, তবু এরকম একটা ফিলিং হচ্ছে ঠিকই। মেয়েটা এমনভাবে জীবনটা নষ্ট করলো ! কতটা দুঃখ তার বুকে জমে ছিল···

আমি চুপ করে সিগারেট টানতে লাগলাম। জ্বরের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া বিস্বাদ লাগছে। তবু অভ্যেসবশে টেনে যাচ্ছি।

একটু থেমে থেকে রবীনবাবু আবার বললেন, চন্দ্রার প্রবলেমটা কী ছিল জানেন ? বলা যায়, আইডেনটিটি ক্রাইসিস। চন্দ্রার ট্যালেন্ট ছিল, কিন্তু ও ঠিক নিজের ক্ষেত্রটা বেছে নিতে পারেনি। পড়াশুনোয় ভালো ছিল, অধ্যাপনার লাইনে গেলে নাম করতে পারতো। গানের গলাও ছিল বেশ সুরেলা, ঠিকমতন চর্চা করলে গায়িকাও হতে পারতো নিশ্চয়ই। একটু চেষ্টা করলেই বিদেশে চলে যেতে পারতো অনায়াসে কিন্তু ওর রূপের জন্যই, ওকে যেন জোর করে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল সিনেমা লাইনে। এই সব মেয়ে, যে কোনো লাইনেই টপে যেতে না পারলে খুব কষ্ট পায়। যোগ্যতা আছে, অথচ যেতে পারছে না।

আমি বললাম, পড়াশুনোয় ভালো, গানের গলা আছে, চেহারাও সুন্দর, এই সব গুণগুলো থাকলে তো অভিনয়েও

সাকসেসফুল হতে পারে। সেটা পারলো না কেন চন্দ্রা ? ঠিকমতন সুযোগ পায়নি বলে ?

রবীনবাবু বললেন, ঠিক তা নয়। ফিলম লাইনে ও নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি। ফিলমের জগৎটা এখনো মেল ডমিনেটেড, এটা তো মানবেন ? চন্দ্রা কোনো পুরুষকেই সহ্য করতে পারতো না।

আমি বেশ বিস্ময়ের দৃষ্টি দিতেই রবীনবাবু বললেন, তার মানে কিন্তু এই নয় যে চন্দ্রার খুব বেশি মরাল স্ক্রুপুলস ছিল। আধুনিক মেয়ে একা একা অনেক জায়গায় ঘুরেছে, শুটিং-এর সময়েও তো অভিভাবকদের কক্ষনো সঙ্গে আনতো না। এমনিতে পুরুষদের সঙ্গে মিশতো, হাসি-ঠাট্টা করতো, সে সব ঠিক ছিল, কিন্তু কেউ একটু ঘনিষ্ঠতা করলেই গুটিয়ে নিত নিজেকে। ফিলমেও ওর প্রেমের অভিনয় এই জন্যই কাঠ কাঠ মনে হতো। আবেগ নেই, নিষ্প্রাণ। চন্দ্রা এক এক সময় বলেও ফেলতো, কোনো পুরুষই তার যোগ্য নয়। সে যাদের দেখেছে, তারা কেউই যথার্থ পুরুষ নয়।

আমি হেসে বললাম, অর্থাৎ তার জীবনের প্রিন্স চার্মিং-কে সে খুঁজে পায়নি।

রবীনবাবু বললেন, অনেকটা তাই। তার এই সূক্ষ্ম অবজ্ঞা সিনেমা লাইনের পুরুষেরা ঠিক বুঝে যেত, তারা অপমানিত বোধ করতো, সেইজন্য তারা চন্দ্রাকেও বেশি ওপরে উঠতে দিতে চায়নি।

—আপনি চন্দ্রাকে খুব ভালোভাবে স্টাডি করেছেন, তাই না ?

—হ্যাঁ।

আমরা দুজনের দিকে কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলাম এক ধরনের সম্মতিতে। একে বলা যায় জেন্টলম্যানস এগ্রিমেন্ট। চন্দ্রার সঙ্গে রবীনবাবুর কতদিনের পরিচয় এবং কতখানি ঘনিষ্ঠতা, সে বিষয়ে আর প্রশ্ন তোলা চলবে না।

রবীনবাবু চলে যাবার একটু পরেই প্রতিমা এলেন ও'র খোঁজ নিতে। স্বামীটি এখানে নেই শুনে উনি চলে যাবার জন্য উদ্যত হয়েও ফিরে তাকালেন। মেয়েরা এসব ঠিক বুঝতে পারে।

রবীনবাবুকে আমার জ্বরের কথা বলিনি, উনিও কিছু জিজ্ঞেস

করেননি। কিন্তু ভুরু তুলে বললেন, আপনার শরীর খারাপ নাকি? চোখ দুটো ছলছল করছে।

কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বললেন, বেশ জ্বর দেখছি! ডাক্তার দেখিয়েছেন।

আমি বললাম, একদিনের জ্বরে কেউ ডাক্তার দেখায় নাকি? ও কিছু না!

—কিছু ওষুধ খেয়েছেন? খাননি নিশ্চয়ই। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার কাছে সব সময় থাকে।

আমার নিজস্ব ওষুধের কথা উল্লেখ না করে বললুম, আমি যখন তখন অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাই না। আমার ঠিক বিশ্বাস নেই। কিছু লাগবে না।

—রবীনবাবুর কিন্তু খুব অসুখের বাতিক। আপনি এই কথা বলছেন, আর রবীনের একটু জ্বর হলেও পাঁচ-সাতটা ওষুধ খেয়ে নেয়।

—আমার বিনা ওষুধেই সেরে যায়।

—শুয়ে থাকুন তা হলে, বিশ্রাম নিন। আপনার রাত্তিরের খাবারটা এখানে পাঠিয়ে দিতে বলবো?

আমি উত্তর না দিয়ে প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অসুখের কথা যখন উঠছেই, তখন এই সুযোগে আমার একটা কৌতূহল মিটিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

—আপনার কিছু একটা অসুখ আছে শুনেছি? কী অসুখ?

প্রতিমা সহজে হাসেন না। এখন তাঁর সারা মুখখানাই হাসিতে ভরে গেল। তিনি বললেন, যদি বলি আমার অসুখটা হচ্ছে পাগলামি, তা হলে বিশ্বাস করবেন?

—সব মানুষই তো একটু একটু পাগল।

—কিন্তু আমি এক এক সময় সীমানা ছাড়িয়ে যাই। কিছুতেই যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝাতে পারি না। খিটখিটে হয়ে যাই, সন্দেহ বাতিক দেখা দেয়। রবীনকে তখন জ্বালাতন করি। এখানে আসবার আগেই দু মাস আমাকে নার্সিংহোমে থাকতে হয়েছিল।

—আপনাকে তো আমার পারফেক্টলি নর্মাল বলে মনে হয়।

একটু বেশি নর্মাল। কথাবার্তার মধ্যে সব সময় ব্যালান্স থাকে।

—সেটাই বোধহয় খারাপ। এক এক সময় ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যায়। মনে হয় জীবনটাই অর্থহীন। ঠিক দুরকম ফিলিং হয়, জানেন। মনে হয়, আমার যা যা প্রাপ্য তা পাইনি। রবীন আমাকে ঠকাচ্ছে। আমার ছেলেমেয়েরাও আমাকে ভালোবাসার অভিনয় করে। আবার মনে হয়, পৃথিবীর অনেকের চেয়েই আমি বেশি পেয়েছি। সেইজন্য অনেকে আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে। আমার সুখ কেউ কেড়ে নিতে চাইছে। তখন ইচ্ছে হয়, খুব ইচ্ছে হয়—

হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে।

আমি বললাম, মাঝে মাঝে প্রত্যেক মানুষের মনেই এরকম নানারকম প্রশ্ন আসে। অদ্ভুত ফিলিং হয়। অকারণে দারুণ নৈরাশ্য বুক চেপে ধরে, আবার এসব কেটেও যায়। তাই না?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে প্রতিমা আপনমনে বললেন, ওই যে চন্দ্রা বলে মেয়েটি, ইচ্ছে করে সমুদ্রে ভেসে গেল, কতখানি অভিমান নিয়ে আত্মহত্যা করলো, এক একসময় মনে হয়, ওর দীর্ঘশ্বাস, ওর অভিশাপ আমারও গায়ে লাগছে। আমার চামড়া ঝলসে দিচ্ছে। দেখুন, দেখুন, আমার চামড়ায় কীরকম ফোস্কা পড়েছে, আজই!

আমি আর কোনো কথা খুঁজে পেলাম না।

প্রথম পরিচয়ের সময় এই দম্পতিটিকে আমার বেশ আদর্শ মনে হয়েছিল। এখন দেখছি, এঁরা দুজনেই আমার অভিজ্ঞতার বাইরের মানুষ। প্রতিমা যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। অনেক লেখাপড়া শিখেছেন অথচ উনি বিশ্বাস করেন, ওঁর চামড়ায় ফোস্কা পড়েছে কোনো অশরীরীর দীর্ঘশ্বাসে। এটা কি ওঁর পাগলামি, না উনি আগে থেকেই জনেতেন যে চন্দ্রার সঙ্গে ওঁর স্বামীর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল?

রবীনবাবুও যেন কিছু একটা অপরাধবোধে ভুগছেন। উনিও বাতাসে চন্দ্রার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনছেন? এটা পাগলামি নয়,

স্রেফ সংস্কার! বাতাসে কারুর দীর্ঘশ্বাস একমাত্র কবিতার মধ্যেই ভেসে বেড়াতে পারে।

চন্দ্রার মৃত্যুর পরদিন সন্ধ্যায় নৌকোয় পা ঝুলিয়ে বসা একটি মেয়েকে আমি দেখেছিলাম। মেয়েটি একসময় কুয়াশায় মিলিয়ে গেল। প্রথমে আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম, তা ঠিক। আমার বদলে যদি রবীনবাবু দেখতেন ওই দৃশ্য?

চন্দ্রার জায়গায় বিশাখা এসেছে, দুজনের চেহারায় মিল আছে। কিন্তু সেদিন কি ওই নৌকোয় বিশাখা বসেছিল? দুপুরবেলা বৃষ্টির মধ্যে লাল ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল বিশাখা? এসব কথা বিশাখাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি।

না, বিশাখা নয়। আমি জানি, সে কে!

॥ ১৩ ॥

রাত এখন কটা? আমার ঘুম ভেঙে গেল কেন? কে যেন আমাকে ডাকছে।

আমার যে জ্বর হয়েছিল, তা মনেই পড়লো না। শরীরে কোনো অস্বস্তি বেদনার অনুভূতি নেই। তবু আমি জেগে উঠলাম হঠাৎ। ঠিক আগের মুহূর্তেই কেউ যেন আমার নাম ধরে ডেকেছে, এখন কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার সেই ডাক শোনার চেষ্টা করলাম। সবদিক চুপচাপ। তবু স্পষ্ট অনুভূতি হচ্ছে, কেউ ডেকেছে কেউ আমাকে জাগাতে চেয়েছে। কিংবা আমি নিজেই নিজেকে ডেকেছি?

জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, তবে অল্প জ্যোৎস্না আছে। বাতাসের গন্ধে মনে হয়, এখন মধ্যরাতের কম নয়। বেলাভূমি সম্পূর্ণ বিজন, আজও ঢেউয়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে ফসফরাসের মালা।

জামাটা গলিয়ে নিয়ে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। বালির বাঁধটা দিয়ে স্লিপ খাবার মতন গড়িয়ে নামলাম নিচে। এবার ডানদিকে, না বাঁদিকে যাবো?

ডানদিকে। কোনাকুনি জলের দিকে। আজ বাতাস খুব কম, তাই ঢেউয়ের শব্দ তেমন শোনা যাচ্ছে না। আলো জ্বলছে না রাস্তার ধারের একটা বাড়িতেও। অনেকেই দরজা-জানালা সব খোলা রেখে ঘুমোয়। চুরি-ডাকাতির ভয় গোপালপুরে প্রায় নেই বললেই চলে।

আকাশে মেঘ নেই, অনেক তারা। গত দুদিন এই সমুদ্রে একটা জাহাজও দেখা যায়নি। আজকের রাতটা ভারী সুন্দর। সুন্দরের একটা প্রগাঢ় আলিঙ্গন আমি অনুভব করছি সর্বাঙ্গে।

জলের ধার ঘেঁসে বসে আছে একটি রমণীমূর্তি। তার নীল শাড়ির রঙ মিশে গেছে রাত্রিতে। আঁচল উড়ছে। পিঠের ওপর খোলা চুল। আমার পায়ের কিংবা নিশ্বাসের শব্দ শুনেও সে মুখ ফেরালো না।

তাকে দেখে আমি একটুও চমকালাম না, কিংবা অবাক হলাম না। আমি জানতাম সে এখানে থাকবে। সে-ই তো আমায় ডেকেছে।

একটু দূরত্ব রেখে আমিও বসলাম ভিজে বালির ওপর। আর একটা সিগারেট ধরালাম। দেশলাইয়ের আগুন একটু যেন ছ্যাঁকা দিল রাত্রির গায়ে।

নারীটি এবার তাকালো আমার দিকে। জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করছে তার চোখ।

আমি মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছো, কেয়া?

আমি বললাম, তোমার হাসিটি ঠিক আগের মতনই আছে। আমি জানতাম, তুমি ঠিক ফিরে আসবে।

—আপনি জানতেন? কী করে জানলেন?

—আমি জানতাম। কারণ, আমি যে খুব তীব্রভাবে চেয়েছি। আমি চেয়েছি, তুমি ফিরে এসো! তুমি ফিরে এসো! আমার সেই চাওয়াটাই তোমাকে তৈরি করেছে। তুমি অলীক, তুমি মায়া, তবু তুমি এখন বাস্তব।

নারীমূর্তিটি আবার খুব ছেলে-মানুষের মতন হাসতে লাগলো।

আমিও হেসে বললাম, সেদিন তুমি নৌকায় একা একা পা

ঝুলিয়ে বসেছিলে, আমি তখন তোমায় চিনতে পারিনি। সত্যি কথা বলছি, একটু ভয় পেয়েছিলাম। সেইজন্যই তুমি আমাকে অবজ্ঞা করে চলে গেলে, তাই না? মানুষ কীরকম বোকা হয় দ্যাখো। নিজেই কল্পনা দিয়ে একটা মূর্তি গড়ে, আবার নিজেই সে তাকে চিনতে পারে না!

—আপনি আমাকে তৈরি করেছেন? ভারী মজা তো!

—মানুষের যখন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু হয়, মানুষ মনে মনে তার কথাই ভাবে, খুব গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে তাকে সশরীরে দেখতে পায় এক এক সময়। কিন্তু তখন সেই প্রিয়জনকে দেখেই আবার মানুষ ভয় পায়! আমারও যে এই দুর্বলতা হয়েছে, তা আমি নিজেই এতদিন টের পাইনি।

—আপনি বুঝি কেয়ার কথা খুব ভাবেন? খুব দুঃখ পেয়েছিলেন?

—মাঝখানে অনেকদিন ভুলে ছিলাম, তা ঠিক। চন্দ্রাকে প্রথম দেখেও বুঝতে পারিনি, তার সঙ্গে কেয়ারও এতখানি মিল। চেহারার মিল, হাঁটার ভঙ্গি, হাসি অনেকটাই কেয়ার মতন। চন্দ্রা যখন জলের তলায় চলে গেল, তার পরেই এই দিনগুলো চোখে পড়লো। তারপর থেকে, আমি মনে মনে শুধু তোমার কথাই ভেবেছি, কেয়া। বৃষ্টির মধ্যে দুপুরবেলা লাল ছাতা মাথায় দিয়ে তুমিই তো যাচ্ছিলে, তাই না? তখনো চন্দ্রার হঠাৎ ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তুমিও যে ফিরে আসতে পারো, সেটা আমার মাথায় ঢোকেনি।

—ওগো লেখকমশাই, আপনি যে বললেন, আমি অলীক, মায়া। আমার হাতটা ছুঁয়ে দেখুন তো! আমি রক্তমাংসের মানুষ।

—নারীটি তার একটি হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে, আমি একটু ঝুঁকে ছুঁলাম। সেই হাত জীবন্ত রক্তস্রোতে উষ্ণ।

তাতে একটুও বিচলিত না হয়ে আমি বললাম, শুধু অলীকে কি সাধ মেটে? আমি তো চেয়েছি, তুমি রক্তমাংসেও ফিরে আসবে!

মেয়েটি সুর করে বলে উঠলো, "এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে, অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে, জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন

কর্মের উদ্যম, হেরিতেছি শান্তিময় শূন্য পরিণাম···।” আঃ, কী ভালো লাগে জলের ধারে একা বসে থাকতে।

—তুমি কি কেয়া নও? তুমি চন্দ্রা?

—এই যে বললেন, আপনি আমাকে তৈরি করেছেন? আপনি কাকে তৈরি করেছেন, তা নিজেই জানেন না?

—চন্দ্রার কথা ভাবতে গিয়ে কেয়ার কথা মনে পড়ে গেল। চন্দ্রা ফিরে আসুক, তাও আমি চেয়েছি। নিশ্চয়ই চেয়েছি। চন্দ্রার মতন মেয়েই বা কেন হারিয়ে যাবে? কেয়া, তোমার কী হয়েছিল? তুমি কি ইচ্ছে করে সুন্দরবনের নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলে?

—ওসব কথা এখন ছাড়ুন তো! সমুদ্রকে দেখুন। সমুদ্রকে আপনার জীবন্ত মনে হয় না?

—জীবন্ত তো বটেই। কে বলেছে সমুদ্র জীবন্ত নয়। আকাশও জীবন্ত।

—আমি আকাশ নিয়ে অত মাথা ঘামাই না। সমুদ্রকে আমার কী মনে হয় জানেন? ঠিক যেন এক বিশাল পুরুষ। জলে যখন নামি, বড় বড় ঢেউয়ের ঝাপটা যখন গায়ে লাগে, ঠিক যেন মনে হয় এক দুর্দান্ত প্রেমিক, অমন স্পর্শ আর কোনো প্রেমিক দিতে পারে না। সেইজন্যই একবার স্নানে নামলে আমার আর ইচ্ছেই করে না জল ছেড়ে উঠতে।

—তুমি মানুষের চেয়েও জলকে এত ভালোবাসো?

—কোনো মানুষ তো তেমন করে ভালোবাসলো না?

এ কথাতেও বিষাদের সুর নেই, নারীটি সব কথাই বলছে হাসতে হাসতে। আমি যে হাতখানা ধরে আছি, সেই হাতে এখনো খেলা করছে প্রাণচাঞ্চল্য। কিছুক্ষণের জন্য আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম।

সেই রমণীর পায়ে এসে লাগছে ঢেউ। শাড়ি ও শায়া একটু-খানি তুলে সে দু পায়ের পাতা দিয়ে চাপড় মারছে জলে। সাদা ফেনা যেন রুপোর মলের মতন অলঙ্কার হয়ে যাচ্ছে।

সে আপনমনে বললো, রাত্তিরবেলা, আর কোনো শব্দ নেই, দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে সমুদ্র, এই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, কে কিসে সার্থক হলো কিংবা না হলো, তাতে কিছুই আসে যায় না।

আমি বললাম, তা হলে জলের গভীরে ডুবে যাবারও কোনো মানে হয় না। এটা জীবন নিয়ে বড্ড বেশি বিলাসিতা। একটি মেয়ে সমুদ্রে একা একা নৌকোয় দাঁড় বাইতে বাইতে গান করছে আপনমনে, এটা দৃশ্য হিসেবে সুন্দর। কিন্তু তারপর একেবারে হারিয়ে যাওয়াটা অসুন্দর। ক্ষমার অযোগ্য। চলন্ত স্টিমার থেকে নদীতে ঝাঁপ দেওয়াটাও···

আমার কথা অগ্রাহ্য করে সে বললো, মানুষের আলিঙ্গনের মধ্যেও ভেজাল থাকে, কিন্তু একা একা জলের সঙ্গে খেলা করা, আঃ, কী আরাম।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, আমি এখন জলে নেমে স্নান করবো।

চমকে উঠে বললাম, এত রাতে?

—রাত্তিরেই তো ভালো। দিন আর রাত্তিরের মধ্যে মেয়েরা রাত্তিরটাই বেশি পছন্দ করে, জানেন না? আপনিও স্নান করবেন? আসুন না।

—আমি? না।

—কেন? ভয় পাচ্ছেন!

—ভয়ের কী আছে? আমি সাঁতার মোটামুটি ভালোই জানি। কিন্তু সমুদ্র তো তোমার প্রেমিক, আমার কেউ না।

মাথা দুলিয়ে হাসতে হাসতে সে বললো, আপনি রেগে যাচ্ছেন সমুদ্রের ওপর? নাকি হিংসে হচ্ছে! তাহলে আপনি ফিরে যান।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলাম বাড়ির দিকে। আমি নিজে যাকে তৈরি করেছি, তারও মুখের কথাগুলো আমার বসানো নয়। কাল্পনিক মূর্তিরও একটা আলাদা সত্তা থাকে। সে ইচ্ছে মতন চলে। সে আমাকে আঘাত দিতেও পারে। সে বললো, আমি সমুদ্রকে ঈর্ষা করি।

বাড়ির কাছাকাছি চলে এসে আমার যেন ঘোর ভাঙলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

একটা খটকা লেগেছে। এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বললাম আমি? কেয়া, না চন্দ্রা? কিংবা, যে উষ্ণ হাতখানি আমি ধরেছিলাম, সেই হাতখানি বিশাখার?

নাঃ, এখন আবার ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

একটি নদীর নাম

বাগানটা সত্যি চমৎকার। ফুলগুলোর স্বাস্থ্য দেখলেই বোঝা যায়, এদের পেছনে অনেক যত্ন আছে। ফুলের গাছও নানা ধরনের। প্রবাল কিংবা জয়া অবশ্য এর একটি গাছও লাগায় নি, সরকারি মালিও এমন কিছু উদ্যম নিয়ে বাগানের পরিচর্যা করে না। প্রবালের আগে যিনি এখানে ছিলেন, সেই সুরঞ্জন মজুমদারের ছিল সত্যি-কারের গাছপালার শখ, প্রত্যেকদিন ভোরে তিনি হাফ প্যান্ট পরে খুরপি নিয়ে নিজের হাতে বাগানের কাজ করতেন। দূর দূর জায়গা থেকে তিনি নিয়ে আসতেন ফুলগাছের চারা।

সুরঞ্জন মজুমদার বদলি হয়ে গেছেন ঠিক এক মাস আগে। অপরের বাগান এখন ভোগ করছে প্রবাল ও জয়া।

একটা বড় ছাতা বসানো হয়েছে এই বাগানের এক পাশে। সেখানে এক একদিন সন্ধেবেলা ওরা দু'জনে চা খেতে বসে। আজকের আকাশ মেঘলা, বাতাস বইছে মৃদু মন্দ, এমন দিনে ঘরের মধ্যে বসে থাকার কোনো মানে হয় না।

আর্দালি ট্রে-তে করে চায়ের পট ও দু' প্লেট গরম গরম নিমকি দিয়ে গেছে। জয়া বানাচ্ছে চা, টুং টাং শব্দ হচ্ছে পেয়ালায়। হাস্নুহানার ঝাড়টার দিকে চেয়ে গুনগুন করছে প্রবাল। রবিবার সন্ধ্যায় নিতান্ত কোনো রাজনৈতিক হোমরা-চোমরা ছাড়া কোনো ভিজিটারের সঙ্গে সে দেখা করে না।

চায়ের কাপে সবে মাত্র দু'বার চুমুক দিয়েছে প্রবাল, গেটের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো। গেটের দু'জন গার্ডের হাত ছাড়িয়ে ভেতরে আসবার চেষ্টা করছে একজন প্রৌঢ়। সাদা ধুতি ও সাদা টুইলের শার্ট পরা, দুটোই বেশ মলিন, পায়ে ময়লা কেড্স। রোগা লম্বাটে চেহারা, মাথার চুল কাঁচা পাকা, কাঁধে ঝোলানো একটা থলে।

ভূত দেখার মতন ফ্যাকাসে মুখ হয়ে গেল প্রবালের। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমি ভেতরে যাচ্ছি!

জয়া প্রথমে অবাক হয়ে বললো, নিমকি খেলে না? চা-ও তো শেষ করো নি!

তারপর গেটের দিকে তাকিয়ে সেও দেখতে পেল প্রৌঢ়টিকে। তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো হাসি।

সে বললো, এবার ডি এম সাহেবের পলায়ন!

ঠাট্টাটা গায়ে মাখলো না প্রবাল, সে বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

জয়া বললো, আমাকে ফেলে পালাচ্ছো?

প্রবাল বললো, তুমিও কেটে পড়ো।

জয়া তাড়াতাড়ি শেষ করলো চা, দু'খানা নিমকি হাতে নিয়ে সে ঢুকে পড়লো বাগানের মধ্যে। শকুন্তলার মত সে মাধবী ও চাঁপা ফুলগাছের আড়ালে মিশে গেল।

প্রৌঢ় লোকটি গার্ডদের হাত ছাড়িয়ে অনেকখানি চলে এসেছে ভেতরে। একজন গার্ড তার সঙ্গে সঙ্গে এসে তাকে ফেরাবার চেষ্টা করছে বটে, কিন্তু তার ওপর জোর জবরদস্তি করছে না।

এর আগে একদিন গার্ডরা ঐ লোকটির হাত চেপে ধরায় লোকটি সরু গলায় চিৎকার জুড়ে দিয়েছিল। গার্ডরা তখন তাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল ডি এম সাহেবের কাছে।

লোকটি বলেছিল, আই অ্যাম এ হামবল স্কুল টিচার স্যার। আই ওয়াণ্ট টু সাবমিট এ পিটিশান।

প্রবাল রূঢ় ভাবে গার্ডদের বলেছিল, ছেড়ে দাও! ওরকম বিশ্রী ভাবে ধরে এনেছো কেন? চোর না ডাকাত। দেখে বুঝতে পারো না নিরীহ লোক?

প্রথম দিনই ভুলটা করে ফেলেছিল প্রবাল। তার পরেও সে অবশ্য আদেশ বদল করে নি।

প্রবালের বাবা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন। সেই জন্যেই বোধহয় সে একজন গ্রাম্য শিক্ষককে বন্দুকধারী গার্ডদের দিয়ে আটকাবার হুকুম দিতে পারে না। তবে লোকটিকে দেখলে সে নিজেই আত্মগোপন করে।

প্রবাল একেবারে উঠে গেল দোতলায়। প্রৌঢ় শিক্ষকটি আর যাই করুক ডি এম সাহেবের ফ্যামিলি কোয়ার্টারে আসতে সাহস পাবে না।

জয়া গাছপালার আড়াল থেকে দেখলো, সেই লোকটি প্রথমে ঢুকে গেল একতলার অফিস ঘরে। একটু পরেই আবার বেরিয়ে এলো বাইরে। নাজির সাহেব নিশ্চয়ই অফিস ঘর থেকে ভাগিয়ে দিয়েছেন।

প্রৌঢ়টি এদিক ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে এলো বাগানের দিকে।

ছাতাটির নীচে এসে সে চায়ের টেবিলের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো। সরু মুখখানিতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে।

চায়ের পটে এখনো অনেকটা চা রয়ে গেছে। একজন অতিথিকে অনায়াসে আপ্যায়ন করা যেত। কিন্তু জয়া আর প্রবাল নিজেরাই ভালো করে চা উপভোগ করতে পারেনি!

প্রৌঢ়টি বাগানের দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বললো, স্যার? ম্যাডাম? জয়া কোনো 'উত্তর দিল না। সে একটুও শব্দ করছে না।

নাজির এখানে এসে রুক্ষ ভাবে বললো, কেন ঝামেলা করছেন ভট্টাচার্যিবাবু? বললাম না, এখন দেখা হবে না? সাহেব আর মেমসাহেব এখন ওপরে বিশ্রাম নিচ্ছেন!

প্রৌঢ়টি বললো, ডি এম সাহেব কি এই গরিব ব্রাহ্মণকে দয়া করবেন না? একবার না হয় মেমসাহেবকে বলে দেখতাম?

নাজির বললো, আপনাকে কত বলেছি, উইক ডেইজ-এ অফিস টাইমে আসবেন। তখন আপনার যা বলার আছে মন খুলে বলবেন। মেমসাহেব কোনো অফিশিয়াল ব্যাপারে মাথা গলান না। তাঁকে বলে কোনো লাভ নেই।

প্রৌঢ়টি বললো, অন্য দিন ইস্কুল থেকে ছুটি পাই না। অনেক-খানি তো দূর!

নাজির বললো, তা বললে কি চলে? এই সব অফিশিয়াল কাজ কি রবিবারে হয়? সাহেবকে সারা সপ্তাহ খাটতে হয়, একটা দিন বিশ্রাম দেবেন না।

প্রৌঢ়টি বললো, তা অবশ্য ঠিক। আমারই দোষ। আমায় ক্ষমা করবেন স্যার। দেখি, যদি আর একদিন।

নাজির বললো, আপনি বরং আর একখানা পিটিশান দিয়ে যান।

প্রৌঢ়টি বাগানের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

যেন সে ফুলগাছের আড়ালেও কিছু দেখতে পাচ্ছে। জয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইলো।

নাজির সাহেব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। সে প্রৌঢ়টির হাত ধরে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে মোলায়েম গলায় বললো, চলুন, চলুন! সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হলে অন্য একদিন ইস্কুলের ছুটি নিয়ে আসবেন!

জয়া অপেক্ষা করলো আরও একটুক্ষণ। প্রৌঢ়টিকে গেটের বাইরে চলে যেতে দেখে তারপর বেরুলো সে। তার এখন বেশ রাগ হচ্ছে। নিজের বাড়িতে তাকে এমন চোরের মতন লুকোতে হবে কেন? ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সামান্য একজন লোককে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে, এটা বড্ড বেশি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নিমকিগুলোই আর কে খাবে?

ও সব সেখানেই ফেলে রেখে জয়া চলে এলো দোতলায়।

প্রবাল টেলিফোনে কথা বলছিল তখনই নামিয়ে রেখে বললো, সইফুল ওর ওখানে ডাকছে, চলো ঘুরে আসি। তৈরি হয়ে নাও!

জয়া রাগ রাগ মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, সইফুলের ওখানে আবার কী আছে?

প্রবাল বললো, আড্ডা মারা হবে। কলকাতা থেকে বিজন এসেছে। বিজন তো তোমার গ্রেট অ্যাডমায়ারার। সন্ধেটা কাটিয়ে আসবো।

জয়ার মুখ থেকে রাগ মুছে গেল খানিকটা। সন্ধেগুলো এখানে কাটতেই চায় না। টিভি আছে বটে, কিন্তু ছবি আসে না ভালো। ক্যাসেটের গান শুনে আর বই পড়ে দিনের পর দিন কাটানো যায় না। প্রবাল যখন ইন্‌সপেকশানে কিংবা অন্য কাজে ডিসট্রিকটের অন্যান্য জায়গায় যায়, রাত্তিরে বাড়ি ফিরতে পারে না, তখন তো একেবারে অসীম একাকিত্ব। এত বড় বাড়িটাকে সে সময় ভূতের বাড়ি বলে মনে হয়।

ম্যাজিস্ট্রেটের বউ বলেই এখানে যার তার সঙ্গে মিশতেও পারে

না জয়া। সেও এক জ্বালা। প্রায় সমান সমান বা কাছাকাছি সরকারি অফিসারদের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও যাতায়াত নেই।

প্রথম প্রথম জয়া স্বাভাবিক ভাবে অনেকের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করেছিল। স্থানীয় উকিল, অধ্যাপক, ডাক্তারদের স্ত্রীদের নিজের বাড়িতে ডাকতো। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল তারা জয়াকে ধরে প্রবালকে দিয়ে কিছু না কিছু কাজ করিয়ে নিতে চায়। সুবিধে চায়, সুযোগ চায়। এই ভাবে কি বন্ধুত্ব হয়!

সইফুল এই জেলার এস পি। খুব আমুদে মানুষ। তার স্ত্রীও বেশ সুন্দর ও ভারি চমৎকার ব্যবহার, ওদের বাড়িতে সময় কাটে বেশ ভালোই।

নতুন করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে জয়া জিজ্ঞেস করলো, রাত্তিরে খাওয়ার কথা কিছু বলেছে নাকি?

প্রবাল বললো, না সেরকম কিছু বললো না। সইফুলের যা ভুলো মন, হয়তো ব্যবস্থা আছে। নীলা তো কোনোদিনই না খাইয়ে ছাড়ে না।

জয়া বললো, আমরা ওদের বাড়িতে গিয়ে বারবার খেয়ে আসছি। আমাদের এখানে ওদের একবার ডাকা উচিত। কিন্তু ওদের মতন অত চমৎকার কাবাব আর বিরিয়ানি তো আমরা বানাতে পারবো না।

প্রবাল হাসতে হাসতে বললো, আমরা ডাল ভাত খাওয়াব।

একটু বাদে তৈরি হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে জয়া আবার জিজ্ঞেস করলো, এ বুড়ো লোকটির ব্যাপারটা কী বলো তো? শুধু শুধু ঘোরাচ্ছো কেন?

প্রবাল বললো, ও যা চায়, তা দেবার ক্ষমতা আমার নেই যে! আগেকার দিনে বাংলা উপন্যাসে লেখা হতো, ডিসট্রিকট্ ম্যাজিস্ট্রেট হচ্ছে সেই জেলার 'দণ্ড মুণ্ডের কর্তা'। কথাটা শুনলেই একজন প্রকাণ্ড চেহারা, রাগী, গোঁফ পাকানো লোকের কথা মনে হয় না? তাদের তুলনায় আমরা···

প্রবাল হাসতে শুরু করলো আপন মনে।

জয়া বললো, ভদ্রলোককে স্ট্রেট না বলে দিলেই তো পারো। শুধু শুধু আসেন অত দূর থেকে।

হাসি থামিয়ে প্রবাল বললো, পৃথিবীতে অনেক কিছুই স্ট্রেট না কিংবা স্ট্রেট হ্যাঁ বলা যায় না। বেশির ভাগ ব্যাপারই এর মাঝামাঝি ঝুলতে থাকে। তাই না? তা ছাড়া উনি আমার কথা বুঝতেই পারছেন না।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে প্রবাল বললো, তোমার ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে। মুছে নাও। বেশি সাজগোজ করেছো মনে হচ্ছে! বিজন আসছে বলে?

জয়া প্রবালের দিকে একটা নিষেধের ভ্রূভঙ্গি করলো।

ড্রাইভার ছাড়াও সামনের সিটে একজন আর্মড গার্ড থাকে সব সময়। এই চাকরিতে শুধু স্বামী-স্ত্রীর নিরিবিলি বেড়াবার অধিকার নেই। ড্রাইভার আর গার্ডের সামনে সব রকম রসিকতা যে করা যায় না, সে কথা মনে রাখতে পারে না প্রবাল।

এস পি সইফুল আলমের কোয়ার্টার পুলিশ লাইনের বাইরে। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির চেয়েও এক হিসেবে এ বাড়িটা অনেক বেশি সুন্দর। প্রবালরা থাকে একটা সাহেবী আমলের ঢাউস দোতলা বাড়িতে, অনেকগুলো ঘর খোলার দরকারই হয় না। আর সইফুলের বাড়িটা একতলা, ছিমছাম, কিন্তু পেছনে অনেকখানি জমি, প্রায় একটা জঙ্গলের মতন, তার মধ্যে একটা পুকুরও আছে। শুধু বাগান নয়, এই জমিতে বেগুন, টোমাটো, ঝিঙে, লাউ এসবও হয়, পুকুরে বড় বড় মাছ আছে।

সইফুল বাইরে দাঁড়িয়ে দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল, প্রবালদের গাড়ি থেকে নামতে দেখেই সে সঙ্গে সঙ্গে লোকদুটিকে বিদায় করে দেবার জন্য বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, কাল কথা হবে।

তারপরই সে ঠক্ করে দু'পায়ের জুতো ঠুকে, অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে স্যালুট করে বললো, আসুন স্যার!

এটা সইফুলের ঠিক রসিকতা নয়, নিয়ম রক্ষার বাড়াবাড়ি।

সার্ভিসে প্রবাল মাত্র এক বছরের সিনিয়ার, বয়েসে যদিও দু'জন সমান। তবু ঘরের মধ্যে সে ডাকবে প্রবালদা, অন্য সময় বলবে স্যার। প্রবাল অনেকবার বলেছে, তুমি আমাকে নাম ধরে ডাকো না কেন? সইফুল শোনে না।

বিজন সেনগুপ্ত বসবার ঘরের মেঝেতে বসে আছে দেয়াল হেলান দিয়ে, তার হাতে রামের গেলাস। সইফুলের কলেজ জীবনের বন্ধু এই বিজন কাজ করে কলকাতার এক বিদেশী দূতাবাসে, এখানে আসে প্রায়ই। এর আগেও একটা জেলাতে সইফুল আর প্রবাল একসঙ্গে পোস্টিং ছিল, সেখানেই বিজনের সঙ্গে প্রবাল-জয়ার আলাপ। দু' একদিনের মধ্যেই দারুণ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

কলকাতা থেকে কেউ এলেই কলকাতার গল্প বেশি হয়। কে কোন্ পাড়াতে থাকে, কোন্ ইয়ারে পাশ করেছে, এমন বন্ধু কেউ আছে কি না! কথায় কথায় হঠাৎ বেরিয়ে পড়লো, এই বিজন সেনগুপ্তের সঙ্গে জয়ার একবার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল! কথাবার্তা এগিয়েও ছিল অনেকখানি, তারপর হঠাৎ জয়ার বাবার এক বন্ধু প্রবালের খবর নিয়ে আসেন। অনেকটা বাবার সেই বন্ধুর আগ্রহে এবং উদ্যোগেই প্রবালের সঙ্গে জয়ার বিয়ে হয়ে যায়।

সেই সম্বন্ধের কথাটা বেরিয়ে পড়বার পর বিজন হো-হো করে হেসে উঠেছিল। এগারো বছর আগেকার কথা, এসব এখন হাসি ঠাট্টারই ব্যাপার। জয়াকে বিজন বলেছিল, আমাকে আপনি রিজেক্ট করে দিলেন। আমি কি পাত্র হিসেবে খুব খারাপ? না হয়, ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারিনি।

বিজনও এখন বিবাহিত, কিন্তু তার স্ত্রীকে এখানে আনে না।

বিজনের সঙ্গে জয়ার এখানকার সম্পর্কটাতে প্রবাল মজা পায়। ওদের বিয়ে হলেও হতে পারতো, হয়নি, তাই বিজনের মধ্যে একটা প্রেমিক প্রেমিক ভাব ফুটে ওঠে জয়াকে দেখলেই। বিজনের মুখে প্রশংসা আর স্তুতি বেশ উপভোগ করে জয়া।

আড্ডার মধ্যে একটু পরে রসভঙ্গ করলো আর একজন এসে। এর নাম কল্যাণ দত্ত, সইফুলের একজন এস ডি পি ও। কল্যাণ এদের চেয়ে বয়েসে কিছুটা ছোট, কিন্তু কাজের ব্যাপারে বড্ড সিরিয়াস। আড্ডার মধ্যেও কাজের কথা ভোলে না। সে ঘরে ঢুকে বসে পড়ার পরেই সইফুলকে বললো, স্যার, ফুলমনি মার্ডার কেসের দু'জন আসামী আজ ধরা পড়েছে, খবর পেয়েছেন?

সইফুল অবাক হয়ে বললো, ধরা পড়েছে, কখন?

কল্যাণ বললো, আজই দুপুরবেলা। নদীর চরে লুকিয়েছিল।

তারপর কল্যাণ লম্বা করে শুরু করলো পুলিশী বিবরণ। তা মোটেই গল্পের মতন নয়, যেন সরকারি রিপোর্ট।

জয়া হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ধমক দিয়ে বললো, এবার চুপ করুন তো! আপনারা শুধু আজেবাজে লোকদের ধরেন। টিয়াজালি গ্রামের কেসটার তো কিছুই করতে পারলেন না এতদিনে।

কল্যাণ থতোমতো খেয়ে চুপ করে গেল।

সইফুল বললো, টিয়াজালি গ্রামের কেসটার কিছুই করা যাবে না। আসামীরা এই জেলার লোক নয়। বাইরে থেকে এসেছিল, আবার পালিয়েছে!

জয়া বললো, বাইরে থেকে এসেছিল বলেই তাদের ধরা যাবে না? কলকাতা থেকে কেউ এ জেলায় এসে যদি একটা খুন করে আবার কলকাতায় ফিরে যায়, তা হলে তাকে কে ধরবে? তার কোনো শাস্তি হবে না? আপনারা বলবেন, আসামী এ জেলায় থাকে না, তাকে আমরা কী করে ধরবো? আর কলকাতার পুলিশ বলবে, ক্রাইমটা বাইরে হয়েছে, সুতরাং আমরা কি জানি!

বিজন হেসে উঠে বললো, বেশ মজা তো! আমিও তা হলে এখানে এসে যা খুশী করে কলকাতায় ফিরে যেতে পারি?

সইফুল বললো, ব্যাপারটা তা নয়। টিয়াজালির কেসটা তো ভালো করে ইনভেস্টিগেট করাই গেল না। মেয়েটির বাবা, ভেরি পিকিউলিয়ার পার্সন, পুলিশের সঙ্গে কো-অপারেটই করতে চায় না।

প্রবাল বললো, সেই বুড়ো ভদ্রলোক আজও বিকেলে এসেছিলেন আমার ওখানে!

জয়া বললো, আপনারা কিছু করছেন না। আর সেই বুড়ো আমাদের গিয়ে প্রায়ই জ্বালাচ্ছে!

সইফুল বললো, কেন, প্রবালদা, ঐ বুড়ো আপনার কাছে যাচ্ছে কেন? আপনি ভাগিয়ে দেবেন! না হয় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। জানেন, আমি নিজে টিয়াজালিতে ঐ বুড়োটার বাড়ি গিয়েছিলাম। অদ্ভুত একটা ফিলোসফিক্যাল ভাব নিয়ে কথা বলতে লাগলো আমার সঙ্গে। কোনো ইনফরমেশান দেবে না,

খালি বলে, সবই ভগবানের ইচ্ছে! যে যায়, তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যায় না!

কল্যাণ এবার বললো, জানেন, ঘটনাটা ঘটে যাবার পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় কোনো খবর দেয় নি? সঙ্গে সঙ্গে খবর পেলে নিশ্চয়ই ধরে ফেলা যেত! শুধু শুধু পাঁচ-পাঁচটা দিন কেটে গেল!

প্রবাল বললো, খবর না দেবার কারণ ছিল। সেটা বোঝা শক্ত নয়।

সইফুল বললো, কী কারণ থাকতে পারে, আপনি বলুন? একজন হারিয়ে গেল, বাড়ির লোক সে খবর থানায় জানাবে না?

প্রবাল বললো, একটি মেয়ে, তাও বামুন বাড়ির যুবতী মেয়ে, রাত্তিরে বাড়ি ফিরলো না। বাড়ির লোকেরা কি সে খবর কারুকে জানাতে চায়? বামুনেরা, বিশেষ করে গরিব বামুনেরা সবচেয়ে বেশি কী ভয় পায় জানো? বংশের বদনাম! কোনো মেয়ের নামে কলঙ্ক! ওরা নিশ্চয়ই ধরেই নিয়েছিল যে মেয়েটি তার কোনো প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছে। তাই ব্যাপারটা চেপে গিয়েছিল। মেয়ের কুলত্যাগ করার চেয়ে মৃত্যুও ভালো, এই রকম এখনো অনেকে মনে করে।

বিজন সোজা হয়ে বসে বললো, শুনি, শুনি, কেসটা ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। কী হয়েছিল ব্যাপারটা।

প্রবাল বললো, কেসটা খুবই ট্র্যাজিক। ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখের সামনে আমি দাঁড়াতেই পারি না। আমার বুকের ভেতরটা শিরশির করে।

জয়া বললো, জানেন, ঐ বুড়োটাকে দেখলেই ও পালায়।

প্রবাল জয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে একবার বিমর্ষভাবে তাকালো। তার ঐ ব্যাপারটা সবার কাছে বলে দেওয়াটা সে পছন্দ করেনি। ঐ বৃদ্ধকে দেখলেই যে প্রবালের বাবার কথা মনে পড়ে, তা জয়া কিছুতেই বুঝবে না। জয়া এসেছে এক সচ্ছল পরিবার থেকে, কিন্তু প্রবাল এক গরিব ইস্কুল মাস্টারের ছেলে।

সইফুল কল্যাণকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তো মেয়েটিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলে?

কল্যাণ বললো, হ্যাঁ, দু'বার দেখেছি।

সইফুল ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, ওয়াজ শী রিয়েলি ভেরি বিউটিফুল ? অ্যান্ড ট্যালেন্টেড ?

কল্যাণ বললো, রিয়েলি। খুব সুন্দরী হয়তো বলা যায় না, তবে মোটামুটি দেখতে বেশ ভালোই ছিল। তার অনেক গুণ ছিল। গ্রামে এরকম মেয়ে চট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সইফুলের স্ত্রী একটা বড় প্লেট ভর্তি মাছ ভাজা নিয়ে সেই সময় ঘরে এসে বললো, কোন্ মেয়েটার কথা হচ্ছে ? কোন মেয়েটা!

জয় বললো, ঐ যে টিয়াজালি গ্রামের একটা মেয়ে···

নীলা বললো, খুন হয়েছিল ? ওরে বাবা, না, না। শুনবো না। ঐসব কথা এখন থামাও তো! বাড়িতে সর্বক্ষণ খুন আর ডাকাতি আর মারামারির কথা শুনতে শুনতে কান একেবারে পচে গেছে।

জয়া বললো, যাক, ঐসব কথা এখন থাক।

সইফুলের স্ত্রীর নাম এখানে সবাই জানে নীলা, একমাত্র বিজনই তাকে আসল নামে ডাকে। সে বললো, নীলোফার, তোমরা তো ঘটনাটা সব জানো। আমাকে একটু শুনতে দাও! তুমি এখানে আমার পাশে এসে বসো!

সইফুল বললো, কল্যাণই ভালো বলতে পারবে। ওর মহকুমার ঘটনা। কল্যাণ, আমি যেটা জানতে চাই, তুমি বেঁচে থাকা অবস্থায় মেয়েটিকে যখন দেখেছিলে, তখন তোমার কী ইমপ্রেশন হয়েছিল ? মেয়েটা কি বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য কারুর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারতো ?

কল্যাণ বললো, অতটা আমি বলতে পারবো না। আমি ওকে দু'বারই দেখেছি একটা স্কুলেব ফাংশানে। প্রথমবার প্রায় দু' বছর আগে···তখন সে সেই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল, বয়েস হবে পনেরো-ষোলো। স্কুলের ফাংশান যে-রকম হয় আর কি, দু' তিনটে গান, কিছু আবৃত্তি, সেক্রেটারির ভাষণ এইসব পরিচালনা করছিল ঐ মেয়েটি।

বিজন জিজ্ঞেস করলো, মেয়েটির নাম কী ?

কল্যাণ বললো, নামটাও বেশ আন ইউজুয়াল। গ্রামে-ট্রামে এরকম নাম শোনা যায় না। সেইজন্য প্রথমবার শুনেই মনে গেঁথে গিয়েছিল। ওর নাম বেদবতী। বেদবতী ভট্টাচার্য।

—বেদবতী? কখনো শুনিনি। মানে কি এই নামের। যে মেয়ে বেদ জানে? বেদের সব জ্ঞান হজম করে ফেলেছে? বাচ্চা মেয়েদের এরকম খটোমটো নাম রাখা মোটেই উচিত না।

—ওর বাবা যে বামুন পণ্ডিত।

—হলেই বা। আজকাল ক'টা বামুন পণ্ডিত বেদ পড়ে? কেউ পড়ে না। এই যে আমরা এই ক'জন রয়েছি এই ঘরে, সইফুল আর নীলোফারকে না হয় বাদ দাও, আমরাই কি বেদ-টেদ কিছু বুঝি?

প্রবাল বললো, বেদবতী নামটার অন্য একটা মানে আছে। এটা একটা পৌরাণিক নাম। বেদবতী হচ্ছে দেবতাদের কুলগুরু বৃহস্পতির নাতনী। বৃহস্পতির ছেলে কুশধ্বজ, তার মেয়ে। এই কুশধ্বজ চেয়েছিল···

বিজন বাধা দিয়ে বললো, ওসব গল্প বাদ দিন। ওসব সেকেলে গল্প আমার শুনতে ইচ্ছে করে না। এই মেয়েটির কী হলো তাই বলুন!

সইফুল বললো, বিজন, তুমি বললে বেদ কেউ পড়ে না। কিন্তু প্রবালদা পড়েছেন, উনি অনেক রেফারেন্স দিতে পারেন।

প্রবাল শুকনো ভাবে হেসে বললো, না, সে রকম কিছু না। ঠিক আছে, কল্যাণ, তুমি তোমার অ্যাঙ্গেল থেকেই ঘটনাটা বলো।

কল্যাণ বললো, মেয়েটির নামই শুধু অন্যরকম নয়। সব দিক থেকেই সে আলাদা, অন্য সব ছাত্র-ছাত্রীর থেকে তাকে বিশেষ ভাবে চোখে পড়বেই। দেখতে বেশ ভালো, আর খুব পরিষ্কার উচ্চারণ। আমার মনে হচ্ছিল, সেই টিয়াজালির মতন গণ্ডগ্রামে যেন হঠাৎ একটা বালিগঞ্জের মেয়ে এসে পড়েছে। একটা লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরেছিল, কোনো সাজগোজ করে নি, তবু তাকে দেখলে গরিব ঘরের মেয়ে বলে মনেই হয় না। সে মেঘনাদ বধ থেকে দু'পাতা আবৃত্তি করে শোনালো, একেবারে নিখুঁত উচ্চারণ, অত শক্ত শক্ত কথা, তবু পুরোটাই তার মুখস্ত।

সইফুল বললো, বালিগঞ্জের কোনো মেয়ে মেঘনাদ বধ আবৃত্তি করতে পারবে না। সবাই ওখানে এখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে।

জয়া বললো, গ্রামের কোনো মেয়ের মুখেও আমি এ পর্যন্ত

ভালো উচ্চারণ শুনিনি। তালব্য শ-টা কেউ যেন বলতেই জানে না।

কল্যাণ বললো, বৌদি, এ মেয়েটি সত্যিই অসাধারণ ছিল। হেড মাস্টারমশাই আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, এই ছাত্রীটি আমাদের গ্রামের গর্ব। আমরা আশা করে আছি, ও হায়ার সেকেণ্ডারিতে নিশ্চয়ই স্ট্যাণ্ড করবে!

দীপ্তা বললো, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টও করেছিল, তাই না?

সইফুল বললো, প্রথম দশজনের মধ্যে আসে নি। মেয়েদের মধ্যে ওর পজিশান ছিল ফোরটিন্থ! একটা অজ পাড়াগাঁর মেয়ের পক্ষে অবশ্য সেটাও কম নয়।

প্রবাল অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। সে মাথা নীচু করে সিগারেট টেনে যাচ্ছে একমনে। তার মুখখানা থমথম করছে।

বিজন জিজ্ঞেস করলো, দেন হোয়াট হ্যাপেনড?

কল্যাণ বললো, আমি ঐ বেদবতী ভট্টাচার্যকে দ্বিতীয়বার দেখি সেই একই ইস্কুলে। তখন সে এক্স-স্টুডেণ্ট, তবু স্কুলের ফাংশানে এসেছিল। দু'বছরেই অনেকটা বড় হয়ে গেছে, রূপ আরও খুলেছে। সেবার সে গান গেয়েও শোনালো। অতুলপ্রসাদের গান। কারুর কাছে শেখেনি, রেকর্ড শুনে শুনে গলায় তুলেছে। তাও নিজের কোনো ক্যাসেট প্লেয়ার নেই, পাশের বাড়ির একজনের। চমৎকার গেয়েছিল, মেয়েটা সত্যিই গুণী। আমি অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম ওর সঙ্গে।

—মেয়েটা কলেজে ভর্তি হয়েছিল?

—হ্যাঁ, কলেজে পড়েছিল। কিন্তু তা নিয়ে অনেক সমস্যা হয়েছিল। ওদের গ্রামের কাছাকাছি তো কলেজ নেই। নিয়ারেস্ট কলেজ বদরপুরে, টিয়াজালি থেকে ১৪ মাইল দূরে। কিন্তু বদরপুর কলেজে মেয়েদের হস্টেল নেই। বড় শহরে ভালো কোনো কলেজে পড়ালে ও মেয়ে অনেক সাইন করতে পারতো, কিন্তু ওর বাবা তো খুব গরিব, সে সামর্থ্য কোথায়? সাধারণত গ্রামের গরিবঘরের এই সব মেয়েদের কি হয়, তাতো জানেনই, হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে, তাই ঢের, তারপরেই সে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে। কিন্তু মেয়েটির তো ইচ্ছে ছিলই, ওর বাবা

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যিও চেয়েছিলেন মেয়েকে কলেজে পড়াবেন। যত কষ্টই হোক। বদরপুরে থাকার জায়গা নেই, তাই মেয়েটিকে গ্রাম থেকেই রোজ কলেজে যাতায়াত করতে হতো। ওদের বাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল হাঁটলে পাকা রাস্তা, সেখান থেকে দিনে দুটো বাস যায়। সকাল সাড়ে নটার বাসটা মিস করলে আর সেদিন কলেজ যাওয়া হবে না। আর এদিককার বাসে ভিড়ও সাংঘাতিক···

প্রবাল হঠাৎ উঠে পড়লো। বাথরুমে যাবার ছলে সে উঠে এলো বারান্দায়। এক হাতে রামের গেলাস, অন্য হাতে সিগারেট। সে ম্লান মুখে তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। বর্ষা শেষ হয়ে গেছে, তবু আকাশে এখনো গাঢ় মেঘ।

ঘরের মধ্যে কল্যাণ তার কাহিনীটা বলে চলেছে।

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ে ঐ বেদবতী, তার আর কোনো ভাইবোন নেই। বাচ্চা বয়েস থেকেই মেয়েটির পড়াশুনোয় খুব মাথা। তার বাবা সে-রকম একটা কিছু পণ্ডিত নয়, খুব একটা বিদ্যে-বুদ্ধি নেই, আগের দিনের আই এ পাশ, স্কুলে বাংলা আর ভূগোল পড়ান। বেদবতী নিজে নিজেই পড়াশুনো করেছে, যে-কোনো বই পড়লে সে চট করে মুখস্থ করে ফেলতে পারে। সব কিছু শেখার দিকে তার তীব্র ঝোঁক। কত কষ্ট করে তাকে কলেজে যেতে হয়। বাড়ি থেকে খেয়ে বেরোয় সকাল নটায়। ভিড়ের বাসে কোনো ক্রমে ঠেলাঠেলি করে ওঠে, কোনোদিন বসার জায়গা পায় না। ১৪ মাইল রাস্তা যেতেই বাসটা প্রায় এক ঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। কলেজ থেকে ফিরতে তার সাতটা বেজে যায়। তার আগে বাস নেই। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে তাকে দেড় মাইল হেঁটে ফিরতে হয়। প্রথম প্রথম তার বাবা গিয়ে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতেন সন্ধেবেলা। যুবতী মেয়ে, দেখতে সুন্দর, তার অনেক রকম বিপদ। কিন্তু বেদবতী খুব আপত্তি করতো। বাবা কেন কষ্ট করে অতক্ষণ বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকবে? গ্রামের রাস্তায় তার কোনো বিপদের ভয় নেই, গ্রামের সব মানুষ তাকে চেনে, তাকে ভালোবাসে। বেদবতী তেজস্বিনী মেয়ে, সে সহজে ভয়ও পায় না।

গ্রামের লোক সত্যিই তাকে ভালোবাসে। ভালো রেজাল্ট করার জন্য স্কুল কমিটি তাকে পাঁচশো টাকা অনুদান দিয়েছে কলেজে

পড়ার জন্য। বদরপুর কলেজেও সে ফ্রি। রেজাল্ট বেরুবার পর গ্রামের পাঁচ-ছ'টি পরিবার তাকে নেমতন্ন করে খাইয়েছে ও একটি করে শাড়ী দিয়েছে। চালের কারবারি বিষ্ণুপদ সাহা বলেছে, যতদিন বেদবতী পড়াশুনো করবে, ততদিন তার বই-খাতাপত্রের সব খরচ সে দেবে।

কলেজে যাওয়া-আসার কষ্ট ছাড়া বেদবতীর পড়াশুনোর অন্য কোনো অসুবিধে ছিল না। তার ইচ্ছে ছিল, সে একদিন কলকাতায় গিয়ে এম এ পড়বে। তারপর রিসার্চ করবে!

কল্যাণ বললো, মেয়েটি যদি দেখতে কুৎসিত হতো, স্বাস্থ্য খুব খারাপ রোগা, কোল কুঁজো, শ্যাওলা শ্যাওলা মতন চামড়া, তাহলে হয়তো ঠিকই কলকাতা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পেঁাছে যেত, নামকরা ছাত্রী হতো। ডকটরেটও পেয়ে যেতে পারতো। কিন্তু আমাদের দেশে সুন্দরী মেয়েদের বেশি লেখা পড়া হয় না। বিশেষত গরিব ঘরের। তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়াটাই বোধহয় ঠিক কাজ। চোদ্দ মাইল বাস ঠেঙিয়ে রোজ এরকম কোনো কলেজে পড়তে পাঠানো বোধহয় বোকামিই।

বিজন জিজ্ঞেস করলো, শেষ পর্যন্ত কি হলো মেয়েটির ?

কল্যাণ গম্ভীর ভাবে বললো, একদিন সে কলেজ থেকে আর ফিরলো না।

সইফুল রাগের সঙ্গে বললো, ওর বাপটা একটা ড্যাম ফুল। বাস থেকে মেয়ে নামলো না দেখে ফিরে গেল বাড়িতে। পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় একটা খবর দেয় নি।

—মেয়েটা পালিয়ে গেছে কারুর সঙ্গে ? কেউ ধরে নিয়ে গেল ?

—ছ'দিন বাদে তার ডেড বডি ভেসে উঠলো কেলেঘাই নদীতে। শী ওয়াজ রেপড অ্যান্ড মার্ডারড !

সইফুলকে তার পেশার জন্য অনেক খুন-জখম প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। অনেক রক্ত সে দেখেছে। এই সব ব্যাপারে সে আর তেমন আবেগে উত্তেজিত হয় না! এই কেসটা ঠিক মতন হ্যান্ডল করা যায় নি বলে সে ক্ষুব্ধ।

সবাই কয়েক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল।

তারপর নীলা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলো, তোমরা পুলিশরাই

তো কিছু পারো না ? একটা মেয়ে কলেজে যাবে-আসবে, তার সেফ্‌টিও তোমরা দিতে পারো না ? এই তো ল অ্যাণ্ড অর্ডারের অবস্থা !

সইফুল বিদ্রূপের সুরে বললো, তুমি গ্রামের সম্পর্কে এই কথা বলছো ? দিল্লিতে তোমার কী হয়েছিল ?

নীলা ঠোঁট উল্টে চুপ করে গেল।

বাবার ট্রান্সফারের চাকরি বলে নীলাকে দু'বছর দিল্লিতে কলেজে পড়তে হয়েছিল। সে স্মৃতি নীলার কাছে তিক্ত। একদিন দুপুরে বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল রাজেন্দ্রনগরের রাস্তায়। খুব গরমের দিন, রাস্তায় বিশেষ লোক থাকে না। হঠাৎ দুটি মোটর সাইকেল এসে থামলো তার দু'পাশে। দুটি ছেলে জোর করে তাকে তুলে নেবার চেষ্টা করলো সেই দিন দুপুরে। নরম, লাজুক ভীরু স্বভাবের মেয়ে ছিল নীলা, কোনোদিন সে চেঁচিয়ে কথা বলে নি, তবু ছেলেদুটিকে বাধা দিয়েছিল প্রাণপণে, সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিল, একটি ছেলে তার চুল ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছিল পর্যন্ত। নীলা সেবার বেঁচে যায় আকস্মিক ভাবে, হঠাৎ একটা বাস এসে পড়েছিল সেখানে। বাস ভর্তি মানুষদের চোখের সামনে আততায়ী দু'জন পালালো।

সেই ঘটনার পর নীলা সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি। তারপর থেকে বাড়ির একজন লোক প্রত্যেকদিন তার সঙ্গে যেত কলেজ পর্যন্ত। সেটাও কম লজ্জার ব্যাপার নয়। কিন্তু নীলা আর একা বেরুতে সাহস করে নি।

সইফুল বললো, রাজধানী দিল্লিতেই যদি ঐ রকম কাণ্ড হয়, তা হলে আমরা এতগুলো গ্রামের ব্যাপার কি করে সামলাবো ? ক'খানা মাত্র গাড়ি আমাদের। দরকারের তুলনায় পুলিশ ফোর্স অনেক কম !

বিজন বললো, মেয়েটাকে মেরেই ফেললো একেবারে ? যারা রেপ করে, তারা খুনীও হয় !

প্রবাল এই সময় আবার ঘরে ফিরে এসে বললো, আজ আবার বৃষ্টি নামছে !

জয়া এতক্ষণ যেন তার স্বামীর অনুপস্থিতি লক্ষই করে নি। সে বললো, তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

প্রবাল কোনো উত্তর দিল না ! সে যেন কোনো অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। কারুকে চেনে না।

সইফুল উঠে গিয়ে প্রবালের হাতের খালি গেলাসটা নিয়ে তাতে রাম ঢাললো, সোডা মেশালো। গেলাসটা ফিরিয়ে নিয়ে বললো, প্রবালদা, আই অ্যাম ভেরি সরি। ঐ বুড়োটা আপনাকে গিয়ে বিরক্ত করে, আপনি ওকে আমার কাছে রেফার করে দেবেন। আমরা কালপ্রিটদের ধরার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কেসটা কোর্টেই ড্রপ করা হয় নি।

প্রবাল নিজের শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জেগে উঠে বললো, তিনি তো আমার কাছে সে জন্য আসেন না। কালপ্রিটরা ধরা পড়লো কি পড়লো না, সে ব্যাপারে ওঁর কোনো আগ্রহই নেই। উনি আমার কাছে তো সে কথাটাই তোলেন নি কখনো।

—তা হলে উনি আপনার কাছে কিসের নালিশ জানাতে আসেন ?

—নালিশ না। একটা দাবি। উনি চান, যে-নদীতে ওঁর মেয়ের মৃতদেহটা ভেসে উঠেছিল, সেই নদীর নামটা বদলে দিতে।

বিজন বলে উঠলো, এটা তো অদ্ভুত প্রস্তাব। নদীটা কী দোষ করলো ?

প্রবাল বললো, অদ্ভুত প্রস্তাব ? হ্যাঁ, অদ্ভুতই বোধহয়। আবার ভেবে দেখতে গেলে তেমন অদ্ভুতও কিছু না। কিন্তু এই দাবি মানবার সাধ্য আমার নেই।

॥ ২ ॥

রাত্তিরের বৃষ্টির জয়ার বেশ পছন্দ। চুল টুল আঁচড়ে, মুখে ক্রিম মেখে, রাত-পোশাক পরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনছে। খুব জোরে নয়, ঝিরঝির ঝিরঝির করে একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

পা-জামা আর গেঞ্জি পরে প্রবাল শরীর এলিয়ে আছে একটা বিরাট সেকেলে ইজি চেয়ারে।

এই ইজি চেয়ারটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। এই বাড়িতে

এরকম অনেক পুরোনো ফার্নিচার রয়েছে। তার হাতে একটা রাম ভর্তি গেলাস। প্রবাল রোজ মদ্যপান করে না! কিন্তু যেদিন খায়, সেদিন খুব কমে থামতে পারে না। সইফুলের বাড়িতে সে দু'বারের বেশি নেয় নি, এখন তার আবার খেতে ইচ্ছে করছে।

জয়া মুখ ফিরিয়ে বললো, আজ এস পি সাহেবের বাড়ির পার্টিটা কেমন জমলো না।

প্রবাল বললো, হুঁ!

—তুমি হঠাৎ অফ-মুড হয়ে গেলে! নীলা অত ভালো ভালো রান্না করেছিল, তুমি কিছুই খেলে না কেন?

—ইচ্ছে করলো না।

—তোমার কী হয়েছে বলো তো? ঐ মেয়েটির ব্যাপারটা খুবই ট্র্যাজিক, খুবই স্যাড। কিন্তু তোমার চাকরির কেরিয়ারে এরকম আগে কখনো ঘটেনি? আমার তো মনে পড়ছে, পুরুলিয়ার সেই যে জোড়া খুন।

প্রবাল হাত তুলে জয়াকে থামিয়ে দিয়ে বললো, খাটের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা এনে দেবে প্লিজ?

প্যাকেটটা এনে প্রবালের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললো, বুঝতে পারছি, আজ তোমার কথা বলার মুড নেই। তুমি কিন্তু আর ড্রিংক করবে না। এটাই শেষ। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি শুয়ে পড়ছি।

প্রবাল এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে বললো, আর খাবো না। এই শেষ আজকের মতন। শোনো, একটু বসো! আজ কল্যাণ যখন ঐ বেদবতীর বাড়ির কথা, ইস্কুলে পড়াশুনার কথা বলছিল, আমার মনে হচ্ছিল, আমি ওর মুখে আমারই জীবন কাহিনী শুনছি!

জয়া অবাক হয়ে বললো, সে আবার কী?

প্রবাল বললো, আমি যখন ইস্কুলে পড়তাম, সবাই আমাকে কি বলতো জানো? জিনিয়াস!

আপনমনে হা-হা করে হেসে উঠলো প্রবাল। নিজের হাসি সে নিজেই খুব উপভোগ করছে।

হাসতে হাসতে দু' তিনবার বললো, জিনিয়াস! জিনিয়াস!

তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বললো, আসলে কিন্তু আমি জিনিয়াস ফিনিয়াস কিছু নেই! তাহলে আর শুধু আই এ এস হবো কেন? আমার মেমারিটা খুব ভালো ছিল, মুখস্ত করতে পারতাম খুব, ইংরিজি-বাংলা পাতার পর পাতা গড়গড় করে মুখস্ত বলতে পারতাম। তাতেই লোকে অবাক হয়ে যেত! ইস্কুলের মাস্টাররা মনে করতো আমি বড় হয়ে দারুণ একটা কিছু হবো!

জয়া বললো, তুমি কিছু খারাপ হওনি। এম এ-তে ইংলিশে ফার্স্ট হয়েছিলে। এবার উঠে পড়ো তো। তোমার নেশা হয়ে গেছে।

—শোনো, শোনো। আসল কথাটা শোনো। তুমি আমাদের নবীপুরের বাড়িতে যাওনি। এখন সে বাড়িতে আমার এক কাকা থাকে। মাটির বাড়ি বুঝলে, টিনের চাল। আমরা ছেলেবেলায় কখনো পাকা বাড়িতে থাকিনি। বাবা স্কুল মাস্টার, জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন, তার সংসারটাও বাবার ঘাড়ে পড়েছিল। ভালো করে খাওয়া জুটতো না। সেই বাড়ির ছেলে আমি। স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর আমি কী করে কলেজে পড়বো, সেই প্রশ্ন উঠেছিল। বাবার তো সামর্থ্য ছিল না। স্কলারশীপ পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে টাকা নিয়মিত প্রতি মাসে পাওয়া যায় না। আর সেই সামান্য টাকায় হস্টেলেও থাকা যায় না। আমার পড়াশুনোই বন্ধ হয়ে যাবার কথা ছিল।

—আহারে, অথচ তুমি তো তোমার বাবার একমাত্র ছেলে ছিলে?

—ঠিক ঐ বেদবতীর মতন। সে মেয়ে। আমি ছেলে। শেষ পর্যন্ত আমিও বাস আর ট্রেন বদল করে একুশ মাইল দূরের কলেজে যেতাম। বাস ভাড়া লাগতো না। ট্রেনের টিকিট কাটতাম না প্রায়ই। তবু আমি ঠিক চালিয়ে গেছি। তার কারণ, আমি একটা ছেলে। আর বেদবতী পারে নি, তার কারণ সে একটা মেয়ে। ছাত্র অবস্থায় আমি যদি মরে যেতাম, তা হলে আমার বাবা-মায়ের কী অবস্থা হতো বলো তো? ইউ ক্যান ওয়েল ইমাজিন। আর এই বেদবতী, তার বাবা-মায়েরও নিশ্চয়ই অনেক সাধ আর স্বপ্ন ছিল এই মেয়েটিকে ঘিরে। একটা মেয়ে, মাত্র সতেরো বছর বয়েস সুন্দর,

মেধাবিনী, গান গাইতে পারে ভালো, মনের জোর আছে, সেই রকম একটা মেয়েকে কয়েকটা লোক ধরে নিয়ে গেল, শুধু কয়েকবার তার শরীরটা ভোগ করার জন্য, তারপর তাকে খুন করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেই লোকগুলো কি মানুষ না রাক্ষস?

—পুলিশ তাদের কোনো ট্রেসই পেল না। কী আশ্চর্য বলো তো! লোকে যে পুলিশের নামে বদনাম দেয়, তা কি এমনি এমনি? অথচ সইফুলকে দেখলে মনে হয়, খুব কাজের!

—জয়া, তুমি বাড়ির গাড়ি করে প্রেসিডেন্সি কলেজে যেতে, তাই না?

—ভ্যাট! প্রথম প্রথম দু' একদিন, তারপর বাসে করেই তো গেছি রোজ। কলকাতা শহরে আবার ভয় কি! সবাই বাসে করেই তো যায়!

—কলকাতার বাস আর এখানকার বাস তো এক নয়। সেদিন বদরপুর থেকে বাসটা আসতে আসতে মাঝপথে থেমে যায়। কিছুক্ষণ বনেট তুলে ঘাঁটাঘাঁটি করার পর বলে দিল আর যাবে না। তখন রাত হয়ে গেছে। আর কোনো বাস নেই। গ্রামের লোক হেঁটেই পাঁচ-দশ মাইল চলে যেতে পারে। কিন্তু একটি সতেরো বছরের সুন্দর চেহারার মেয়ে কি তা পারে? পারলেও অন্যরা তাকে পারতে দেবে না। সেইখান থেকেই বেদবতীকে আর পাওয়া যায় নি। কেউ বলে ঐ রাস্তা দিয়ে একটা জিপ গিয়েছিল, সেই জিপটাই মেয়েটিকে তুলে নিয়েছে। আবার অনেকেই জিপ টিপ কিছু দেখে নি।

—আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। যদি বাইরের লোকেরাই এই কাণ্ডটা করে থাকে, তা হলে মেয়েটি মাঝখানের পাঁচ দিন ছিল কোথায়? লোকেরা তাকে ধরে অন্য কোথাও নিয়ে গেল, তারপর মেরে আবার এখানকার নদীতেই ফেলে গেল?

—হয়তো এখানেই কোথাও লোকগুলো ঘাপটি মেরে ছিল কয়েকদিন। মেয়েটার শরীরে সঙ্গে পাথর-টাথর বেঁধে ফেলে দিয়েছিল। কোনো রকমে পাথরগুলো খুলে গিয়ে বডিটা ভেসে ওঠে। শরীরে একটা সুতোও ছিল না। শরীরে আর কোনো ক্ষতও নেই, গলা টিপে শ্বাস বন্ধ করে দিয়েছিল।

—থাক, আর বলতে হবে না।

—রাবণ এসেছিল। রাবণকে আটকাতে পারলো না মেয়েটা।

—অ্যাঁ, রাবণ? কী বলছো? এই তোমার নেশা হয়ে গেছে, এবার উঠে পড়ো লক্ষ্মীটি।

—হ্যাঁ রাবণই তো। কিন্তু হেরে গেল মেয়েটা!

—আর বাজে বকবক করো না তো। তুমি এই ব্যাপারটা নিয়ে বড্ড ব্রুড করছো। এবার শুয়ে পড়ো লক্ষ্মীটি।

—শোনো, কুশধ্বজ আর মালাবতীর মেয়ে হচ্ছে বেদবতী। ওরা স্বামী স্ত্রী চেয়েছিল, স্বয়ং লক্ষ্মীকে মেয়ে হিসেবে পেতে। কিন্তু যে-মেয়ে জন্মালো, সে জন্মের পরই বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকে। এ তো লক্ষ্মী নয়! এ অন্য মেয়ে। এর নাম রাখা হলো বেদবতী। মেয়ে পড়াশুনোয় খুব ভালো, আই মীন, বেদ-টেদ সব মুখস্ত ছিল। কিন্তু যখন সে জানলো, তার মা-বাবা লক্ষ্মীকে মেয়ে হিসেবে চেয়েছিল, তখন সে কঠোর তপস্যায় লক্ষ্মী হতে চলে গেল। আমাদের এই টিয়াজালি গ্রামের দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য আর তার বউ নিশ্চয়ই মেয়ের বদলে ছেলে চেয়েছিলেন। সব গরিবরাই তাই চায়। আমার বাবা-মাও তাই চেয়েছিলেন। আমার মাকে সবাই বলতো ভাগ্যবতী। কারণ আমি হীরের টুকরো ছেলে। হে-হে-হে-হে! তা ঐ দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের ছেলে হলো না, শুধু এক মেয়ে, তখন সেই মেয়েকেই ছেলের মতন মানুষ করতে লাগলো। বেদবতীও বুঝতে পেরেছিল বাবা-মায়ের দুঃখ। ছেলেরা ভবিষ্যতের ভরসা। বেদবতী চেষ্টা করছিল, সে ছেলের মতনই হয়ে উঠবে, লেখাপড়া শিখবে অনেক, ভালো চাকরি পাবে, বাবা-মায়ের দুঃখ দূর করবে। কিন্তু রাবণ এসে গেল!

—এর মধ্যে আবার রাবণ আসছে কোথা থেকে?

—রাবণ এসেছিল। হ্যাঁ, সত্যি। এই বেদবতী না, পুরাণের সেই বেদবতী, সে পাহাড়ে গেল তপস্যা করতে। আমাদের এই বেদবতী যেমন অনেক দূরের কলেজে পড়তে গিয়েছিল। পুরাণের সেই বেদবতী নির্জন পাহাড়ে গেল তপস্যা করতে, সে লক্ষ্মী হতে চেয়েছিল। সেখানে একদিন রাবণ এলো। অতিথি হয়ে।

অতিথিকে সেবা করতে হয়, তাই বেদবতী তার সামনে ফল-মূল সাজিয়ে সেবা করতে গেল। কিন্তু রাবণ শালা ছিল মহা কামুক! সুন্দরী মেয়ে দেখলে দশটা মাথাই ক্ষেপে যেত একসঙ্গে। সে বেদবতীকে ভোগ করার জন্য হাত বাড়াতেই সেই তপস্বিনী বললো, তিষ্ঠ! সেকালে মেয়েদের তেজ থাকতো, বুঝলে! আর সে মেয়ে সাঙ্ঘাতিক তপস্বিনী। সে তিষ্ঠ বলতেই ব্যস, রাবণ আর এগোতে পারে না। স্তম্ভিত হয়ে গেল একেবারে। স্ট্যাচুর মতন! কিন্তু দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ে তো তা পারলো না। কেন পারলো না! সীতা, সে সীতা হবে?

জয়া কাছে এসে প্রবালের হাত ধরে বললো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না! তুমি কী বলছো। রামায়ণের গল্পের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছো। এবার আমি কিন্তু আলো নিভিয়ে দেবো!

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে প্রবাল খানিকটা টলে গেল। জয়ার দু'কাঁধে হাত রেখে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে বললো, আমি কিচ্ছু গুলিয়ে ফেলিনি। সব ঠিকই বলছি। পুরাণ-টুরান আমার ভালো করে পড়া আছে। ঐ যে বেদবতী রাবণকে স্তম্ভিত করে দিল, তারপরই কি তার কাহিনী ফুরিয়ে গেল? না। আরও আছে। রাবণ যে তার দিকে লোভের হাত বাড়িয়েছিল। তার জন্য রাবণের আর কোনো শাস্তি হবে না? বেদবতীর যে অপমান হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেবে না? রাবণের মতন একটা লম্পট তার দিকে কামাতুর চোখে চেয়েছিল বলে বেদবতী ক্ষোভে-দুঃখে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে স্বেচ্ছায় পুড়ে মরে। কিন্তু তার আগে সে রাবণকে বলে গেল, আমি আবার শিগগিরই এক অযোনিজ কন্যা হয়ে জন্মাবো। তখন আমারই জন্য সবংশে ধ্বংস হবে! সেই মেয়ে পরের জন্মে কী হলো বলো তো? সীতা! জনক রাজার মেয়ে, কিন্তু তার কোনো মা ছিল না। বিষ্ণুর অবতার তো রাম, তার সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে হলো, সুতরাং সে লক্ষ্মীর জায়গাটাও পেল। তার তপস্যা সার্থক। আর তার জন্যই রাবণকে মরতে হয়নি? এবার বুঝলে? আমি ঠিক বলেছি, না ভুল বলেছি?

জয়া প্রবালকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল বিছানায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো সে।

পরদিন সকালে সে অন্য মানুষ। ব্যস্ত মানুষ, কাজের মানুষ। দফায় দফায় মিটিং। বিভিন্ন দলের দাবি-দাওয়া শোনা। নানান জায়গা পরিদর্শন। সার্কিট হাউসে একজন মন্ত্রী এসে উঠলেন হঠাৎ, তাঁর সঙ্গে রাত দেড়টা পর্যন্ত কাটাতে হলো জরুরি আলোচনায়। এক ফোঁটা মদ তো দূরের কথা, বয়স্ক মন্ত্রীর সামনে সে সিগারেটও খেতে পারে না।

তিন দিন পরেই তাকে জিপ নিয়ে সোজা চলে যেতে হলো কলকাতায়। মুখ্যমন্ত্রী সব ডি এম-দের ডেকেছেন কোন গোপন পরামর্শের জন্য। সেখান থেকে পরদিন ফিরেই প্রবাল আবার গেল একটা মহকুমা সদরে, কিছুটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছিল, বড় কিছু ঘটার আগেই থামানো গেল কোনোক্রমে।

এর মধ্যে জয়ার সঙ্গে ভালো করে কথা বলারই সময় পায় না সে। দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ের কথা আর উত্থাপন করলো না একবারও।

মহকুমা থেকে হেড কোয়ার্টারে ফিরছে প্রবাল, অ্যামবাসেডরে বসে বসে সে ঝিমুচ্ছে। এসকর্টের গাড়িটা পেছনে। রাত প্রায় নটা। আজও বৃষ্টি পড়ছে ঝিরঝির করে। কয়েকদিনের পরিশ্রমে অনেক ক্লান্তি জমেছে তার শরীরে।

হঠাৎ তার ড্রাইভার খুব জোরে ব্রেক কষলো। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, স্যার, স্যার!

প্রবাল চমকে চোখ মেললো।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাস্তায় শুধু গাড়ির হেড লাইট পড়েছে। বৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কুয়াশার মতন। তার মধ্যে দেখা গেল একজন মানুষকে, ধুতি ও শার্ট পরা. দু' হাত উঁচু করে কী যেন বলতে চাইছে।

যেন এক প্রেতাত্মা! আবছা।

ঘুমের আবেশ কাটেনি বলে প্রবালের মনে হলো, এ কি হ্যামলেটের বাবার মতন কোনো কিছুকে সে দেখছে? এই ধুতি শার্ট পরা মূর্তিটা তো অবিকল তার অনেক বছর আগে মৃত বাবা। বাবা কি কোনো গোপন কথা বলতে এসেছে তাকে?

তারপর গাড়ির দরজা খুলে নেমে, গটমট করে হেঁটে গিয়ে

প্রবাল খানিকটা কঠোর গলায় বললো, কী ব্যাপার? আপনি এ ভাবে আমার গাড়ি আটকালেন কেন?

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য হাত জোড় করে অনুনয় করলো, এক মিনিট স্যার, এক মিনিট আপনি আমার কথাটা শুনে যান।

প্রবাল আবার বললো, আপনার বয়স হয়েছে, তবু এমন ছেলেমানুষী করতে আছে? আমার গার্ড আগেই গুলি চালিয়ে দিতে পারতো। তাকে দোষও দেওয়া যেত না। এমন ভাবে ডাকাতরা গাড়ি আটকায়।

দারুকেশ্বর ঝুঁকে পড়ে বললো, অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ করুন, স্যার। বুঝতে পারিনি স্যার!

—বৃষ্টির মধ্যে এই অন্ধকার রাস্তায় আপনি এ সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন কেন? কী করে বুঝলেন, আমি এই সময় এ রাস্তা দিয়ে যাবো।

—আমি রোজই এখানে দাঁড়িয়ে থাকি এই সময়টায়।

—তার মানে এটা আপনাদের গ্রামের বাস স্টপ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভট্টাচার্যিমশাই আপনি শিক্ষিত মানুষ, একটা স্কুলে পড়ান। এ আপনি কী পাগলামি করছেন? আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে আপনার মেয়ে আবার একদিন এখানে কলেজ থেকে ফিরে বাস থেকে নামবে?

—না, না, তা বিশ্বাস করি না। সে কি আর হয়। এমনিই অভ্যেস। এখানে রোজ এসে দাঁড়িয়ে থাকা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল তো। সেই টানে চলে আসি। আমার বউ নিষেধ করে।

শুধু শুধু বৃষ্টি ভেজার কোনো মানে হয় না। দারুকেশ্বরের অবশ্য সর্বাঙ্গ ভিজে। বুড়ো মানুষটার না নিউমোনিয়া হয়ে যায়।

গাড়ি দুটোকে সাইড করতে বললো প্রবাল।

তারপর নিজের গাড়ির দরজা খুলে বললো, আপনি ভেতরে এসে বসুন। সামনের সীটের ওপর দেখুন একটা তোয়ালে আছে, সেটা দিয়ে ভালো করে মাথাটা মুছে নিন।

দারুকেশ্বর বললো, থাক থাক ওসব লাগবে না। আপনি দয়া করে…

প্রবাল বেশ জোর দিয়ে বললো, আগে মাথাটা মুছে নিন ! পরে কথা শুনবো ।

নিজেও ভেতরে এসে প্রবাল বললো, ভটচার্যি মশাই, আপনার সামনে সিগারেট খেতে পারি ? কিছু মনে করবেন না তো ?

দরেুকেশ্বর প্রায় মরমে মরে গিয়ে জিভ কেটে বললো, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ ! এ কী বলছেন স্যার ! আপনি কত বড়, আপনি আমার অনুমতি নেবেন কেন ? আমি অতি নগণ্য মানুষ । স্যার, আপনাকে আমি যে পিটিশনটা দিয়েছিলাম ।

—আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন তো ! আপনার মেয়ে একদিন কলেজ থেকে ফিরলো না। সারা রাত কেটে গেল। তারপরেও আপনি থানায় খবর দেননি কেন ?

—কেউ কেউ যে বললো, সে রতন দাসের সঙ্গে বাসে উঠেছিল, তার সঙ্গেই শহরে চলে গেছে। কলকাতা শহরে। যেখানে কোনো মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায় না ।

—রতন দাসটি কে ?

—পরের দিন সকালেই আমি বদরপুর কলেজে খোঁজ নিতে গেলাম। দুটি মেয়ে বললো, আগের দিন বিকালে তারা আমার কন্যাকে রতন দাসের সঙ্গে এক বাসে উঠতে দেখেছে। রতন উঁচু ক্লাসের ছাত্র। পলিটিক্স করে। কলকাতায় যাওয়া-আসা করে। একদিন সে সীতার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতেও এসেছিল। দুপুরে খেয়ে গেল ভাত ।

—সীতা কে ? আপনার মেয়ের ডাক নাম ?

—বেদবতীরই তো আর এক নাম সীতা ।

প্রবাল এমন একটা মুখের ভাব করলো, যেন এসব বিষয়ে সে কিছুই জানে না, জানার আগ্রহও নেই। ঠিক বিজয়ের মতন ।

সে জিজ্ঞেস করলো, রতন দাস ? পুলিশ এর খোঁজ পায় নি ?

দারুকেশ্বর প্রায় আর্তভাবে বলে উঠলো, না, না, তার কোনো দোষ নেই । রতন দাস কোথাও যায় নি । সে সীতা-মা'র সঙ্গে বাসে উঠেছিল বটে, কিন্তু একটু পরেই নেমে যায়। তার বাড়ি পাশের গ্রামে ।

—রতন দাস কিছু জানে না? তবু আপনি একটা বাজে সন্দেহ করে পাঁচ দিনের মধ্যেও থানায় গেলেন না?

—আসল ব্যাপার কী হয়েছিল জানেন স্যার। একদিন দুপুরে ঐ রতন আমাদের মেয়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসেছিল তো। ছেলেটি ভাল, কথাবার্তাও ভাল। কিন্তু দাসেদের বাড়ির ছেলে সীতার সঙ্গে তার অমনধারা মেলামেশা ঠিক ভালো দেখায় না। আমার স্ত্রী সীতাকে সেদিন বলেছিল, তুই ঐ রতনকে বিয়ে করবি নাকি? খবর্দার, অমন কথা মনেও স্থান দিবি না। আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু জাত-ধর্ম গেলে আর মানুষের কী থাকে? এই কথা শুনে সীতা খুব রাগ করেছিল। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। তারপর কান্নাকাটি করেছিল খুব।

—মেয়েকে কলেজে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে না? একদিন একটা ছেলে বাড়িতে গিয়েছিল বলেই বিয়ের কথা ভাবতে হবে?

—আপনি ঠিকই বলছেন, স্যার! ন্যায্য কথা বলেছেন। দিন কাল পাল্টে গেছে। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে ইস্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু আমরা তো পুরোনো আমলের, বিশেষত আমার ব্রাহ্মণী এসব ঠিক বুঝতে পারেন না। দাসেদের ছেলে দুপুর বেলা আমাদের বাড়িতে এসে ভাত-টাত খেল, মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগলো, তাই কেমন কেমন লাগে। মেয়ে যখন ফিরলো না, আমরা ভাবলাম, মা-বাবার ওপর রাগ করে সে ঐ ছেলের সঙ্গে চলে গেছে, তাতে আমরা কপাল চাপড়ে কাঁদতে পারি। আর তো কিছু পারি না। পুলিশ আর কী সাহায্য করবে বলুন!

সিগারেটের টুকরোটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রবাল নিষ্ঠুরের মতন বললো, আপনার মেয়ে খুন হয়েছে, তার বদলে সে যদি রতন দাসের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যেত, সেটা বোধহয় আরও খারাপ হতো, তাই না? ধরুন, পুলিশ ওদের কলকাতা থেকে খুঁজে পেতে ধরে নিয়ে এলো, তখন কি মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিতেন?

প্রবালকে অবাক করে দিয়ে দারুকেশ্বর বললো, এটা আপনি ঠিক বলেছেন স্যার। সে যদি এক শুদ্দুরের সঙ্গে বেরিয়ে যেত, বাপ-মাকে অগ্রাহ্য করে, তিলে তিলে তাকে গড়ে তুলেছি, নিজেরা

না খেয়ে তার বই-পত্তর কিনে দিয়েছি, সেই মেয়ে যদি অমন অকৃতজ্ঞ হতো। তবে সেই আঘাত কি সহ্য করতে পারতাম? বোধহয় পারতাম না। এখন যা ঘটেছে, তাতে আমার মেয়ের কোনো দোষ নেই। নিয়তি। ভবিতব্য। মানুষের তো এতে কোনো হাত নেই!

—মানুষেরই হাত। মানুষের হাতেই খুনটা হয়েছে। নিয়তির কোনো হাত থাকে না। আপনি নাকি খুনীদের শাস্তি হোক তাও চান না?

—শাস্তি তারা পাবেই। যিনি শাস্তি দেবার তিনিই দেবেন। সে জন্য আপনাকে ব্যস্ত করতে চাই না স্যার।

—আপনার মতন আরও বহু লোক যদি ভগবানের ওপর এমন পুরোপুরি নির্ভর করতো, তা হলে পুলিশের কাজ, আমাদের কাজ অনেক কমে যেত!

—আপনি স্যার, শুধু আমার সামান্য আর্জিটা···আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন।

—না, পারি না। নদীর নাম কি হঠাৎ বদলানো যায়? এরকম শুনেছেন কখনো? কত রকম কাগজে পত্রে, দলিলে, ম্যাপে নদীর নাম লেখা থাকে। সেসব কে বদলাবে?

—কেন স্যার, রাস্তার নাম যে বদলায়? কলকাতায় হ্যারিসন রোড যে হয়ে গেল মহাত্মা গান্ধী রোড। আর কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট হয়ে গেল বিধান সরণী। হয়নি?

—সে তো সব বিদেশী নাম বদলানো হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর বিদেশী নামের রাস্তা কেউ রাখে?

—সব বিদেশী নাম নয়। ধর্মতলার নাম হলো লেনিন সরণী, চৌরঙ্গির নাম জওহরলাল নেহেরু রোড। তারপর ধরুন স্যার, মাদ্রাজ হয়ে গেল তামিলনাড়ু। গুজরাটের নামও কী যেন হয়েছে। এত বড় বড় জায়গার নাম যদি বদল হতে পারে তা হলে একটা ছোট নদীর নাম কি বদলানো যায় না?

প্রবাল এবার খানিকটা অধৈর্য হয়ে বললো, আঃ! এসব তো রাজনৈতিক ব্যাপার। তা ছাড়া নদীর নামটা বদলেই বা আপনার কী লাভ হতে পারে? কেন এটা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করছেন?

এতক্ষণ পর্যন্ত দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের সর্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভেজা হলেও চোখ ছিল শুকনো। এবার সে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো। হাউ হাউ করে কেঁদে বলতে লাগলো, লাভ হবে না কিছু, আমি লাভের কথা ভাবিনি স্যার, আমার মেয়েটার একটা স্মৃতি···সে কি একেবারে হারিয়ে যাবে···আমার সীতা, তাকে কেউ মনে রাখবে না? ওঃ হো-হো, আমার সীতা মা···

প্রবাল কান্না সহ্য করতে পারে না। বাধাও দিতে পারে না, সান্ত্বনাও দিতে পারে না। সে চুপ করে থেকে প্রৌঢ় ব্রাহ্মণটিকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিল।

নদীর নাম কেলেঘাই। শীত-গ্রীষ্মে প্রায় শুকিয়ে যায়, তার চেহারা দেখে তখন নদী বলে মনেই হয় না, তার গর্ভে নেমে গিয়ে ছেলেরা খেলা করে, রাখালরা গরু চরায়, বাড়ির ভিত করার জন্য অনেকে মাটি তুলে নিয়ে যায়। একমাত্র বর্ষাকালেই দেখা যায় তার তেজ। তখন তার ঢেউ যেন টগবগ করে ফোটে। স্রোতের টানে নৌকো ভেসে যায়। এক এক বছর এই নদী উপছে উঠে বন্যাও হয়। দু'পারের বাড়ি ভাসায়।

কেলেঘাই কোনো ঠাকুর দেবতার নাম নয়। পীর-ফকিরের নাম নয়। স্থানীয় কোনো সংস্কৃতির সঙ্গেও এর যোগ নেই। নিতান্তই একটা অর্থহীন শব্দ। এ নামের বদলে একটা ফুটফুটে সুন্দর কিশোরী মেয়ের নাম দিয়ে তার স্মৃতিটাকে বাঁচিয়ে রাখলে দোষের কী আছে?

কিন্তু একজন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়েই এ রকম নাম পাল্টাতে পারে না। অনেক প্রশ্ন উঠবে।

দারুকেশ্বরের কান্নায় সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে সর্দি বেরিয়ে গেল। ধুতির খুঁট দিয়ে নাক মুছে সে সামলে নিল খানিকটা।

প্রবাল ভারি গলায় বললো, পণ্ডিতমশাই, আপনি জেলা বোর্ডের কাছে আপিল করুন। স্থানীয় এম এল এ-কে ধরুন। ওঁরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পলিটিক্যাল লেভেল সিদ্ধান্ত নিলে আমি সেটা কার্যকর করতে পারি। তার বেশি আমার আর ক্ষমতা নেই।

দারুকেশ্বরের অসহায় মুখখানি তুলে বললো, আমরা অল্প

বয়েস থেকে দেখেছি, ডি এম সাহেব ইচ্ছে করলে সবই পারেন।

প্রবাল হেসে বললো, সে সব দিন আর নেই। চলুন, পণ্ডিত-মশাই, আপনার বাড়িতে পেণছে দিয়ে আসি।

দারুকেশ্বর তাতে প্রবল আপত্তি করে উঠলো। তাঁকে পেণছে দিতে হবে না, সে হেঁটেই যেতে পারে। তা ছাড়া জল-কাদার রাস্তা, তার বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যায়ই না।

প্রবাল বললো, যতটুকু যাওয়া যায়, ততটুকু এগিয়ে দিচ্ছি। এই অন্ধকারের মধ্যে হাঁটবেন কেন?

দারুকেশ্বর কিছুতেই রাজি হলো না। না, না, না বলতে বলতে প্রায় জোর করেই নেমে পড়লো গাড়ি থেকে। হনহন করে হেঁটে মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। বৃষ্টি পড়ছে এখনো।

অন্যসময় দারুকেশ্বর এত বিনীত, কিন্তু বিদায় নেবার সময় সে একটাও কিছু বললো না প্রবালকে। তার রাগ কিংবা অভিমান হয়েছে। তাই সে প্রবালের গাড়িতে চড়তে চায় না।

প্রবাল একবার কাঁধ ঝাঁকালো। সে আর কী করতে পারে।

ড্রাইভারকে সাক্ষী মেনে বললো, দেখলে তো, এত করে বোঝালাম, তবু কিছুতেই বুঝবে না। আমি আর কী করতে পারি বলো।

ড্রাইভার বললো, মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, স্যার। একটাই মোটে মেয়ে, সে অমন ভাবে মরেছে, কী করে সহ্য করবে! আমি শুনেছি স্যার, টিয়াজালির ঐ মেয়েটার সঙ্গে অনেকেই ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিল। কলেজে পড়তে না পাঠিয়ে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দিলে বেঁচে যেত। ঠিক কি না স্যার, বলুন!

প্রবাল এই আলোচনা আর চালাতে চায় না। সে বললো, স্টার্ট দাও। চলো, অনেকটা দেরি হয়ে গেল!

গাড়ি আবার চলতে শুরু করতে প্রবাল মাথা এলিয়ে দিল। এখনো ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগবে পেণছোতে আবার খানিকটা ঘুমিয়ে নিলে হয়। এই রাস্তাটা যে টিয়াজালি গ্রামের

ওপর দিয়ে গেছে, তা প্রবালের আগে খেয়াল হয় নি। অন্য একটা রাস্তা দিয়েও ফেরা যেত।

কিন্তু ঘুম আর এলো না। এলোমেলো চিন্তা ঘুরতে লাগলো মাথায়।

বাবার কথা মনে পড়লো। দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার বাবার যেন চেহারারও মিল ছিল খানিকটা। বাবাও এরকম দুর্বল ধরনের মানুষ ছিলেন।

এম এ পাশ করার পরই একটা কমার্শিয়াল ফার্মে চাকরি পেয়ে যায় প্রবাল। সেই চাকরি করতে করতেই সে আই এ এস পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছিল। সেই সময় কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বাবা-মাকে গ্রামের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল সে। তখন তার গাড়ি থাকার কোনো প্রশ্নই ছিল না। বাবা ট্রামে-বাসেও চড়তেন না। হেঁটে হেঁটেই ঘুরতেন কলকাতা শহরে। প্রবালের ভয় হতো, বাবা গাড়ি চাপা না পড়েন। কলকাতায় কখনো থাকেননি তো আগে। সেবারও বেশিদিন রইলেন না। কলকাতা তাঁর ভালো লাগেনি। মাকে নিয়ে আবার গ্রামে ফিরে গেলেন, প্রবালকে বলে গেলেন, তুই যখন বড় চাকরি করবি, গ্রামের বাড়িটার একখানা ঘর অন্তত পাকা করে দিস। বর্ষাকালে মাঝে মাঝে সাপ ঢোকে। আর এক জোড়া গরু কিনবো। আসলে তো আমরা ঘোষ গয়লা, গরু পালতে পারবো ভালোই।

আই এ এস পরীক্ষাতেও ভালো রেজাল্ট করেছিল প্রবাল। উত্তর ভারতের এক পাহাড়ী শহরে সে যখন ট্রেনিং নিচ্ছে, সেখানে হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম পেল বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। অ্যাটাক হবার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ। চিকিৎসার সুযোগও পাওয়া যায় নি।

ছেলের 'বড় চাকরি' দেখে যেতে পারেন নি বাবা। প্রবাল তার পিতৃঋণ কিছুই শোধ করতে পারে নি।

গ্রামের বাড়িটা আর পাকা করা হয় নি। বাড়ির অংশ নিয়ে কাকা ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন। ঐ তো সামান্য সম্পত্তি, তা নিয়ে আবার ভাগাভাগি। সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল প্রবাল। বাবা নেই, সে কি ঐ গ্রামে আর কোনো-দিন বাস করতে যেত? মা এরপর বেঁচে ছিলেন পাঁচ বছর।

প্রবালের ছেলেবেলার গ্রাম, মফঃস্বল শহরের কলেজ জীবনের সঙ্গী-সাথী, এসব কিছুর সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে একেবারে। কলেজটার পঁচিশ বছরের জয়ন্তীতে তাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, প্রবাল তখন দিল্লিতে, যেতে পারে নি।

রতন দাস ছেলেটি কেমন? ওকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। সে একা একদিন চোদ্দ মাইল দূরে বেদবতীর গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। সেখানে ভাত খেয়েছে। সেখানে সে কী রকম ব্যবহার পেয়েছিল বেদবতীর বাবা-মায়ের কাছ থেকে? রতন প্রায়ই বেদবতীর সঙ্গে বাসে ফিরতো। শুধু কি বন্ধুত্ব, না সে ভালোবেসেছিল বেদবতীকে? মনে মনে তাকে বিয়ে করার সাধ ছিল? কিংবা সে জানতো, ভট্টাচার্যি বাড়ির মেয়ের সঙ্গে দাসদের বাড়ির ছেলেদের বিয়ে হয় না!

জয়া বিয়ের আগে ছিল চক্রবর্তী। প্রবাল ঘোষের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যাপারে জাতের কোনো প্রশ্নই ওঠে নি। জয়াদের বাড়িতে ওসব কেউ মানে না। শহরের অনেকেই এসব গ্রাহ্য করে না আজকাল। শহর থেকে এই সব গ্রামগুলো কত লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে!

বহু পুরোনো একটা ব্যথা প্রবালের বুকে কাঁটার মতন বিঁধলো আবার। প্রবাল অস্বস্তিতে ছটফট করে এপাশ ওপাশ ফিরলো, আর একটা সিগারেট ধরালো, তবু ব্যথাটা যাচ্ছে না।

মেয়েটির নাম মালিনী। ষোলো-সতেরো বছর বয়েস হবে তখন। প্রবাল সেই সময় মফঃস্বল কলেজের ছাত্র। ভালো রেজাল্ট করার জন্য সহপাঠীরা অনেকে তাকে খাতির করতো। সন্তোষ ব্যানার্জি নামে একটি ছেলের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল প্রবালের।

সন্তোষদের অবস্থা ছিল সচ্ছল, মাঝে মাঝে সে প্রবালকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো। গরিবের ছেলে প্রবাল ভালো করে খেতে পায় না, কলেজে কখনো টিফিন করে না, এই সব কারণেই সন্তোষ ডাকতো প্রবালকে। সন্তোষেরও মা-ও খুব স্নেহ করতেন তাকে। সন্তোষের বাবা প্রায়ই তাঁর ছেলেকে ধমক দিয়ে বলতেন, এই প্রবালকে দেখে দেখে শেখ্। গ্রামের ইস্কুলে পড়েও স্কলারশীপ পাওয়া যায়!

সেই সন্তোষের বোন ছিল মালিনী। খুব চঞ্চল স্বভাবের মেয়ে ছিল, ব্যবহারে জড়তা ছিল না একটুও। দেখতে খুব একটা সুন্দর না, আবার খারাপও না, তার সঙ্গে সাবলীল ব্যবহারের একটা আলাদা সৌন্দর্য ছিল। পড়াশুনোয় তেমন কিছু ভালো ছিল না মালিনী, কিন্তু কবিতা আবৃত্তি করতো চমৎকার। নানান অনুষ্ঠানে সে আবৃত্তি করতে যেত।

সেই মালিনীর সঙ্গে কি তার প্রেম হয়েছিল? না, না, তখন প্রেম-ট্রেমের কোনো চিন্তাই মাথাতে ছিল না প্রবালের। একমাত্র জেদ ছিল, পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করে কলকাতায় এম এ পড়তে যেতে হবে। মফঃস্বলের গণ্ডি ছেড়ে বড় জায়গায় যেতেই হবে তাকে।

মালিনীর সঙ্গে প্রেম ছিল না, ভাব ছিল বেশ। নানারকম ইয়ার্কি, ঠাট্টা হতো, তার বেশি কিছু ছিল না। সেই মালিনীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল হঠাৎ। একটিমাত্র পাত্র-পক্ষ দেখতে এসেই পছন্দ করে ফেললো মালিনীকে, পণ-যৌতুক নিয়েও বেশি দরাদরি হলো না। সবাই বেশ খুশী।

সেই সময় সন্তোষের একটা কথা প্রবালের গালে একটা থাপ্পড়ের মতন লেগেছিল!

সন্তোষ হাসতে হাসতে জানিয়েছিল, বাবা কী বলছিল জানিস? বাবা আফশোস করে বললো, তোর ঐ বন্ধু, প্রবাল ছেলেটাকে আমার মেয়ের খুব পছন্দ, ও যদি ঘোষ না হয়ে বামুন হতো, ওর সঙ্গেই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতাম। গরিব হলেও আমার আপত্তি ছিল না!

সন্তোষ ভেবেছিল, এটা প্রবাল সম্পর্কে প্রশংসার কথা। কিন্তু অপমানে প্রবালের সমস্ত শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছিল। সে মালিনীর বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে যায় নি, সন্তোষের সঙ্গেও আর মিশতো না বিশেষ।

সেই অপমানের জ্বালাটা এতদিন পরেও রয়ে গেছে।

মালিনীর মুখখানাও মনে আছে স্পষ্ট। যদিও মালিনীর সঙ্গে জয়ার কোনো তুলনাই হয় না। জয়ার রূপ-গুণ অনেক বেশি। জয়াও ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়ে। তবু এখনো প্রবালের ইচ্ছে হয়, সেই

মফঃস্বল শহরে গিয়ে সন্তোষের বাবাকে কোনো এক ছুতোয় ধরে এনে চাবকাতে।

রতন দাসের সঙ্গে নিজের অনেক মিল খুঁজে পাচ্ছে প্রবাল। আহা, ঐ রতন ছেলেটা এখন নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে। ভট্চাজ বাড়ি থেকে বেদবতীকে হরণ করে নিয়ে যাবার সাহস হলো না কেন তার? মেয়েটা তা হলে হয়তো সত্যি বেঁচে যেত।

॥ ৩ ॥

বৃষ্টি এবার পাকাপাকি বিদায় নিয়েছে। আকাশের মেঘ কাশ ফুলের সঙ্গে রং মিলিয়ে সাদা হয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে উঁকি মারে গাঢ় নীল।

সোমবার একটা সরকারি ছুটি। শনিবার দুপুর থেকে লং উইক এণ্ড। এই ছুটিটা নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। একটা কিছু প্রোগ্রাম করার জন্য জয়া ছটফট করছে। কলকাতা ঘুরে এলে কেমন হয়?

প্রবালের খুব আপত্তি নেই? মঙ্গলবার যদি রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটা কাজের ব্যাপার তৈরি করা যায়, তা হলে সরকারি গাড়ি নিয়েই যাওয়া যেতে পারে। তার সরকারি ট্যুর হবে। রাইটার্স বিল্ডিংসে কিছু কাজও আছে সত্যিই।

জয়ার দিদি-জামাইবাবু কানপুর থেকে কলকাতায় এসেছে, এখন ওখানে গেলে বেশ আড্ডা হবে। প্রবালের নিজস্ব কেউ আর নেই। শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গেই তার প্রধান সামাজিক সম্পর্ক।

কিন্তু অন্য একটা প্রস্তাব এলো সইফুলের কাছ থেকে।

সইফুলের বন্ধু বিজন একটা বাড়ি কিনেছে শান্তিনিকেতনে। খুব সুন্দর করে নাকি সাজিয়েছে সেই বাড়ি। এই ছুটিতে সে একটা হাউজ ওয়ার্মিং পার্টি দিতে চায়।

শুক্রবার রাত্রে সইফুল আর নীলা এলো কিছুক্ষণের জন্য। সইফুল বললো, চলুন প্রবালদা, শান্তিনিকেতন ঘুরে আসি। এখন জেলাটা মোটামুটি পিসফুল, কোথাও কোনো ঝঞ্ঝাট নেই।

নীলা বললো, চলুন, চলুন। আমি কখনো শান্তিনিকেতন যাইনি!

জয়া তাকালো প্রবালের দিকে। মুখ দেখে মনে হয়, তার আপত্তি নেই।

প্রবাল বললো, তুমি ঠিক করো, কলকাতায় যাবে, না শান্তি-নিকেতন যাবে?

জয়া বললো, দিদিরা তো এখন কিছুদিন থাকবে। কলকাতার পরেও যেতে পারি। তুমি না পারলেও আমি একলাই চলে যাবো।

প্রবাল মুচকি হাসলো। নিজের দিদির চেয়েও বিজনের প্রতিই জয়ার টান বেশি দেখা যাচ্ছে।

জয়া আবার বললো, শান্তিনিকেতনে কী রকম বাড়ি বানিয়েছে, আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। আমারও শান্তিনিকেতনে জমি কেনার ইচ্ছে আছে।

প্রবালের এখনও নিজস্ব কোনো বাড়ি বা ফ্ল্যাট নেই। কলকাতায় গিয়ে শ্বশুর বাড়িতে উঠতে হয়। শান্তিনিকেতনে জমি কেনার আগে কলকাতাতেই আগে একটা কিছু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রবাল বললো, ঠিক আছে, চলো তা হলে যাওয়া যাক।

এখান থেকে শান্তিনিকেতনে যেতে ঘণ্টা ছয়েক লাগবে। সইফুল গাড়ি নেবে, একটা গাড়িতেই চলে যাবে।

কাল দুপুর বারোটায় একটা স্কুল কমিটির মিটিং-এ উপস্থিত থাকতে হবে প্রবালকে, এটা অনেক আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। সুতরাং দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরেই বেরুতে হবে। শান্তি-নিকেতনে পৌঁছোতে রাত হয়ে যাবে অবশ্য। তাতেও কোনো ক্ষতি নেই। বোলপুর থানায় ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে রাখলে বিজনকে জানিয়ে দিতে পারবে, বিজন রান্না-বান্না তৈরি রাখবে।

পরদিন সকাল থেকে জয়া ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে তৈরি। কিন্তু বেলা এগারোটার সময় একটা সমস্যার সৃষ্টি হলো।

একটি লোক নিয়ে এলো স্থানীয় এম. এল. এ-র চিঠি। তিনি আজ কলকাতা থেকে ফিরছেন। আজ সন্ধ্যেবেলাতেই তিনি ডি. এম. এ-র সঙ্গে দেখা করতে চান। খুব জরুরি গোপন ব্যাপার

আছে। সার্কিট হাউজে নয়, ডি• এম• এ-র কোয়ার্টারেই তিনি আসছেন।

চিঠিখানা নিয়ে প্রবাল ওপরে এসে জয়াকে দেখাতেই সে জ্বলে উঠলো তেলে বেগুনে। এম. এল. এ যখন তখন চিঠি পাঠালেই ডি. এম-কে থাকতে হবে নাকি? ডি. এম-এর ছুটি বলে কোনো বস্তু নেই? সরকারি ছুটি প্রত্যেক সরকারি কর্মচারি অবশ্যই পেতে পারে।

প্রবাল কপাল কুঁচকে বললো, তবু যাওয়া মুস্কিল। আগে বেরিয়ে পড়লে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু চিঠি যখন রিসিভ করেছি, উনি লিখেছেন জরুরি ব্যাপার।

জয়া বললো, যতই জরুরি ব্যাপার হোক। তুমি ছুটির দিনে ছুটি পাবে না? তুমি কি এম. এল. এ-র চাকর নাকি? সার্ভিস রুলে এরকম লেখা আছে?

প্রবাল দুর্বল ভাবে হেসে বললো, সব কিছু লেখা থাকে না। সরকারি চাকরি অবশ্য চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। সরকারি কাজে যে-কোনো সময় আমায় ডাকতে পারে।

—এটা আবার কিসের সরকারি কাজ? কোনো মন্ত্রী যদি ডাকতেন, তাহলেও না হয় বোঝা যেত। এম. এল. এ সরকারের কে?

—রুলিং পার্টির এম. এল. এ সরকারের প্রতিনিধি। নাঃ, আমার পক্ষে যাওয়া মুস্কিল!

—ঠিক আছে, আমি আর জীবনে কোথাও যাবো না। এই মফঃস্বলে পচে মরবো! কলকাতাতেও আর যাবো না কোনোদিন।

—আহা হা, অত রাগ করছো কেন? আজকের বদলে আমরা কালকে বেরুতে পারি। কাল ভোর ভোর বেরিয়ে দুপুরের মধ্যে পোঁছে যাবো।

—নীলারা আজ দুপুরে যাবে বলে রেডি হয়ে আছে। ওরা শুধু শুধু একটা দিন নষ্ট করবে কেন? ওদের বন্ধুর কাছে ওরা আনন্দ করতে যাচ্ছে, আমরা কেন স্বার্থপরের মতন ওদের আটকাবো। তাছাড়া তোমার ঐ এম. এল এ কোন্ জরুরি

কাজের কথা বলবে তার কোনো ঠিক আছে ? কালকেও তোমাকে আটকে দেবে।

—না, সেটা আমি ম্যানেজ করবো। একবার ওঁর সঙ্গে দেখা হলে বলতে পারবো যে রবিবার আমার ব্যক্তিগত কাজ আছে!

—কিচ্ছু বিশ্বাস নেই! তাছাড়া সইফুলরা চলে গেলে তুমি তোমার গাড়ি নিয়ে যাবে? গাড়ির ব্যাপারে তোমার যা পিটপিটানি। সইফুলরা গাড়ি নিয়ে কত জায়গায় যায়। আর তুমি একটু সরকারি গাড়ি ব্যবহার করলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় একেবারে।

—গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তা নিয়ে চিন্তা করো না।

—আজ এম. এল. এ আসছে, কাল যদি কোনো মন্ত্রী এসে পড়ে? আমার শান্তিনিকেতনে যাওয়া হবে না, আমি ঠিক বুঝে গেছি!

তাহলে এক কাজ করা যাক। তুমি সইফুলদের সঙ্গে আজ চলে যাও। যেমন ঠিক করা আছে।

—আমি তোমাকে রেখে একা যাবো? তা হয় নাকি? না, আমার কিচ্ছু দরকার নেই।

শোনো, শোনো তুমি আজ সইফুল-নীলাদের সঙ্গে যাও। আমি কাল গিয়ে তোমাদের সঙ্গে জয়েন করবো। এতে অসুবিধে কী আছে? প্ল্যানটা ঠিকই রইলো।

—না, আমি যাবো না!

কিন্তু প্রবাল লক্ষ্য করলো, জয়ার আপত্তিটা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে। বেচারি বেড়াতে যাবার জন্য একেবারে উন্মুখ হয়ে ছিল। সে আর একটু পেড়াপিড়ি করতেই জয়া রাজি হয়ে গেল। প্রবাল তো একদিন পরে যোগ দিচ্ছেই তাদের সঙ্গে।

স্কুল কমিটির মিটিং সেরে এসে প্রবাল ওদের বিদায় জানালো। যাবার আগে সইফুল জিজ্ঞেস করলো, এম. এল. এ সাহেব আমার খোঁজ করবেন না তো? আপনি তাহলে একটু ম্যানেজ করে দেবেন।

প্রবাল বললো, চিঠিতে তোমার কথা কিছু লেখেননি।

সইফুল চোখ টিপে বললো, বলে দেবেন, আপনার চিঠি আসবার আগেই আমি বেরিয়ে গেছি। আমি অনেকদিন ছুটিও নিইনি।

জয়া বললো, তুমি কিন্তু কাল ঠিক আসছো!

ওরা বেরিয়ে যাবার পর প্রবাল অফিসে গিয়ে বসলো। এম. এল. এ জরুরি কাজের কথা লিখেছেন, নিশ্চয়ই এ জেলা সংক্রান্ত কাজ। আপাতত কোথাও কোনো গোলমাল নেই। হয়তো উনি নতুন কোনো প্রজেক্টের কথা বলবেন।

বিভিন্ন এস ডি. ও-দের রিপোর্ট পড়তে লাগলো প্রবাল।

অন্যান্য কর্মচারিরা চলে গেল একে একে, রয়ে গেল শুধু নাজির সাহেব। এর কোয়ার্টার পাশেই। নাজির সাহেব একেবারে কাজের পোকা।

দুপুর তিনটে আন্দাজ প্রবাল বললো, নাজির সাহেব, আর্দালিকে চা দিতে বলুন তো!

নাজির সাহেব চায়ের ব্যবস্থা করে প্রবালের কাছে এসে বসে পড়ে বললো, স্যার, সেই ভটচাযি মাস্টার, এখন কী করছেন জানেন? ঐ যে ইস্কুল মাস্টার, যার মেয়ে মারা গেছে!

প্রবাল মুখ তুলে বললো, কী করছেন তিনি?

নাজির হাসতে হাসতে বললো, লম্বা লম্বা ছড়া বানিয়েছে। মেয়ের নামে। সেই সব ছড়া শোনায় হাটে হাটে ঘুরে। পরশুদিন পলাশপুরের হাটে শুনলাম। নেচে নেচে ছড়া বলে। মাথাটা একেবারে গেছে।

নাজির সাহেবের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে প্রবাল জিজ্ঞেস করলো, আপনি নিজে শুনলেন? কেমন হয়েছে ছড়াগুলো?

নাজির সাহেব বললেন, মন্দ না, স্যার। লাইনের শেষে মিল আছে। মেয়ের জীবন কাহিনী শুরু করেছে একেবারে জন্ম থেকে। খুনের কথা, ধর্ষণের কথা সব আছে। এমনকি পর জন্মের কথাও কী যেন আছে। সবশেষে হাতজোড় করে সবাইকে বলে, বাবা সকল, এখন থেকে কেলেঘাই নদীর নাম হলো ঐ দুখিনী কন্যার নামে। তোমরা কেউ আর কেলেঘাই বলো না। বাবাসকল, তোমাদের কাছে অনুরোধ···

—লোকজন শুনে কী বলে?

—কেউ বিশেষ কোনো উচ্চবাচ্য করে না। পণ্ডিতের গলাটা

তো ভালো না, ভাঙা ভাঙা, সব কথা বোঝা যায় না। লোকেরা ওকে পাগল বলেই মনে করে বোধহয়।

—উনি তা হলে নদীর নাম বদলাবার চেষ্টা এখনো ছাড়েননি। আচ্ছা, নাজির সাহেব, নদীর নামটা পাল্টে দিলেও তো হয়। ওর যখন এতই ইচ্ছে। এরকম একটা বড় ঘটনা থেকেই তো গ্রামের নাম, নদীর নাম হয়। জেলা বোর্ডকে প্রস্তাবটা দিলে হয় না?

—ঐ ছড়ার মধ্যে আছে, স্যার, জেলা বোর্ড প্রস্তাবটা বাতিল করে দিয়েছে। জেলা বোর্ডের কাছেও পিটিশান দিয়েছিল। আপনার নামও আছে।

—আমার নামও আছে? আমাকে পাষণ্ড-টাষণ্ড বলেছেন বুঝি?

না, অতটা নয়। আপনার সম্পর্কে এইরকম আছে, ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় মহা ব্যস্ত অতি। যাবতীয় কর্মকাণ্ড সবই রাজনীতি!

নাজির সাহেব হা-হা করে হেসে উঠলো, প্রবালও গলা মেলালো তাতে।

তারপর প্রবাল বললো, আমাকে রাজনীতির লোক বানিয়ে দিল? যাক, বেশি গালাগালি দেয়নি ভাগ্যিস। আমি ওঁর জন্য কিছুই করতে পারিনি। আজ তো এম এল এ আসছেন, ওঁর কাছে একবার প্রস্তাবটা তুলবো নাকি?

নাজির সাহেব বেশ আপত্তির সুরে বললেন, এম. এল. এ সাহেব কি জানেন না ভাবছেন? নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু একজন লোকের কথায় শুধু একটা নদীর নাম পাল্টাতে যাবেন কেন?

—রাস্তার নাম, জায়গার নামও তো বদলানো হয় অনেক সময়। নদীর নাম যদি সুন্দর হয়, কেলেঘাই শব্দটার কি কোনো মানে আছে? সেই তুলনায় বেদবতী, শুনতে ভালো না?

—আমার কিন্তু স্যার কেলেঘাই নামটাই ভালো লাগে। মানে যাই হোক, একটা বেশ লোক্যাল ফ্লেভার আছে নামটার মধ্যে। শুনলে মনে হয়, বেশ গভীর কালো জল, বড় বড় ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাড়ে!

—আপনি খুব বেশি কল্পনা করছেন, নাজির সাহেব। ও

নদীতে গভীর কালো জল কোথায় দেখলেন? বড় বড় ঢেউই বা বছরে ক'দিন থাকে? আমি তো শুকনো চিড়চিড়েই দেখি!

—এই তো বর্ষা গেল. এখন ঐ নদীর চেহারা একবার দেখে আসুন গিয়ে, স্যার! কত তেজী নদী। এবার আর একটুর জন্য বন্যা হলো না। যাই চলুন, স্যার, বেদবতীর চেয়ে কেলেঘাই নাম অনেক ভালো।

—আপনিও তা হলে নাম বদলের পক্ষপাতী নন?

—বেদমতী নামটা খটোমটো, না? তাছাড়া, বেদ আপনাদের পবিত্র গ্রন্থের নাম! লোকের মুখে এর বিকৃত উচ্চারণ হবে, সেটা কি ভালো? অনেক গোঁড়া মুসলমান এ নাম মান মানতে চাইবে না। হিন্দুদেরও আপত্তি থাকতে পারে!

—হিন্দু দেব-দেবীদের নামেও তো নদীর নাম আছে। গঙ্গা, সরস্বতী, ভৈরব, আরও কত আছে। সেসব নাম মুসলমানরা উচ্চারণ করে না?

—সে আগেকার যা আছে তা আছে। নতুন করে এরকম নাম দিতে গেলে গোলমাল হতে পারে, স্যার। সরকারি দিক থেকে এরকম চেষ্টা না করাই ভালো।

—ও, তাহলে একটা অ্যাঙ্গেলও আছে? এটা আমি ভেবে দেখিনি!

—সরকারের লোকদের সব সময় সাবধানে থাকাই ভালো। কে কোথায় বলে দেবে, নতুন করে হিন্দুয়ানি চালাবার চেষ্টা হচ্ছে নদীর নাম বদলে।

—একটা করুণ ঘটনা, এক শোকার্ত পিতৃ-হৃদয়ের দাবি, সেটাকে নিয়েও যদি কেউ কেউ ধর্মীয় ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করে, তবে তাদের ধরে ধরে জুতোপেটা করা উচিত। যাক গে, আমার হাতে নাম বদলাবার ক্ষমতাও নেই, আমি এ নিয়ে আর মাথাও ঘামাচ্ছি না।

—সেই ভালো, স্যার। আপনি এ নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না। কেলেঘাই নদীতে খুব বড় বড় কালবোস মাছ পাওয়া যায়, আপনি কখনো খেয়েছেন? খুব মিষ্টি স্বাদ। একদিন এনে দেবো আপনার জন্য।

প্রবালের চোখের সামনে একটা দৃশ্য ফুটে উঠলো। পাথর বাঁধা অবস্থায় সতেরো বছরের বেদবতী নাম্নী মেয়েটির নগ্ন শরীর অনেকক্ষণ পড়ে ছিল নদীর গর্ভে। মাছেরা নিশ্চয়ই ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে সেই শরীর। জলজ গুল্মও জড়িয়ে গিয়েছিল তার গায়ে?

হঠাৎ ফিসফিস করে সে বলে উঠলো: হোয়েন ডাউন হার উইডী ট্রফিজ অ্যান্ড হারসেলফ/ফেল ইন দ্য উইপিং ব্রুক হার ক্লোদ্স্ স্প্রেড ওয়াইড/অ্যান্ড মারমেইড-লাইক, এ হোয়াইল দে বোর হার আপ···

নাজির সাহেব বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে দেখে প্রবাল লজ্জা পেয়ে থেমে গেল। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হ্যামলেট, ওফেলিয়ার মৃত্যুদৃশ্য। এমনি মনে পড়লো হঠাৎ। নাঃ, আপনাকে মাছ আনতে হবে না, আমি অত মাছের ভক্ত নই।

ওপরে উঠে এসে দোতলার একটা ছোট ছাদে চেয়ার নিয়ে বসলো প্রবাল। শুধু জয়া নেই বলেই দোতলাটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে। জয়া থাকলে কি চ্যাঁচামেচি করে? একজনের উপস্থিতিই অনেকটা শূন্যতা ভরিয়ে দেয়।

আর এক কাপ চা খেয়ে প্রবাল ঘড়ি দেখলো। সাড়ে পাঁচটা। এম. এল. এ পাঁচটার মধ্যে আসবেন বলেছিলেন।

আরও এক ঘণ্টা বাদে একজন এসে খবর দিলেন, এম. এল. এ আজ কলকাতা থেকে ফিরতে পারছেন না। তিনি আসবেন বুধবার।

খুব জরুরি আলোচনা ছিল, অথচ সেটা পাঁচদিন পিছিয়ে গেল। তাহলে সেটা কতখানি জরুরি? এরা ব্যস্ত লোক, যখন তখন এদের প্রোগ্রাম পাল্টায়। প্রবালের বুঝি সময়ের কোন মূল্য নেই? অবশ্য এম. এল. এ মহোদয় জানতো না যে প্রবালের এই ছুটিতে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ছিল!

ভেতরে ভেতরে ক্ষোভ জন্মলেও প্রবাল সে কথা কাকে এখন জানাবে! এম এল. এ-র চিঠি অগ্রাহ্য করে দুপুরবেলা চলে গেলেই হতো। এ. ডি. এম-কে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়া ছিল। তবু, চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর যাওয়া যায় না। এই চাকরির এটাই একটা বিরক্তিকর চরম ব্যাপার। একটু এদিক ওদিক হলেই একটা অপ্রয়োজনীয় দফতরে ঠেলে দেবে।

ভেতরের ঘরে এসে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়লো প্রবাল। এরপর সারা সন্ধ্যে তার কিছুই করার নেই। কথা বলার কেউ নেই।

এখন সে ইচ্ছে করলে শান্তিনিকেতনের দিকে বেরিয়ে যেতে পারে অবশ্য। হঠাৎ মাঝরাত্রে পেঁছে জয়াদের চমকে দেবে। কিন্তু একা সে একটা গাড়ি নিয়ে যাবে? জয়া ঠিকই বলেছে, সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার ব্যাপারে তার একটা খুঁতখুঁতুনি আছে। এরকম সবাই করে। প্রবাল তবু এখনো পারে না। এখান থেকে শান্তিনিকেতনের সরাসরি ট্রেনও নেই। বর্ধমান গিয়ে পাল্টাতে হবে, সে অনেক ঝামেলার ব্যাপার, আজ আর হবে না। কাল দেখা যাবে।

তাছাড়া, জয়া আজ একটু অন্যরকম আনন্দ করুক না। স্বামী কাছে না থাকলে অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের ব্যবহার কিছুটা পাল্টেই যায়। বিজন বেশ খাতির করে জয়াকে। আজ একটু বেশি খাতির করবে। জ্যোৎস্না রাতে ওরা সবাই মিলে বেড়াতে যাবে। তবে জয়ার একটা ডিগনিটি আছে, সে কখনো মাত্রা ছাড়াবে না, তা প্রবাল জানে। বিজন আজ চেষ্টা করবে জয়াকে বেশি জিন্ খাইয়ে টিপসি করে দিতে। এরকম সে অন্যদিনও চেষ্টা করে। আজ প্রবাল কাছে থাকবে না। আজ জোরাজুরি করবে। করুক না। এক আধদিন এরকম হলে দোষ নেই তো কিছু।

ঘরের আলো জ্বালেনি প্রবাল, সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শান্তিনিকেতনে জয়াদের আনন্দ-ফুর্তির দৃশ্য। প্রবালকে কেউ যেন নির্বাসন দণ্ড দিয়েছে।

অফিসার মহলে পরস্পরের বউদের সঙ্গে খানিকটা ফস্টি-নস্টি, ঠাট্টা-ইয়ার্কি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। প্রবালও ওখানে থাকলে নীলার সঙ্গে নানারকম মজা করতো। কিন্তু গ্রামের মানুষ ওসব কী চোখে দেখে? তারা হয়তো এগুলোকেই মনে করে উঁচু সমাজের ব্যভিচার। বাবা আর মা যদি এখন এখানে প্রবালের কাছে থাকতেন, তাঁরা কি সমর্থন করতেন জয়ার এরকম সইফুলদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া?

বাবার ইচ্ছে ছিল দুটো দুধেল গাই বাড়িতে রাখার। শেষ

পর্যন্ত আর কিনে দেওয়া হয়নি। সেই সময়ইতো পেল না প্রবাল। গ্রামের বাড়িটা জয়াকে দেখানোই হলো না।

সন্ধেবেলা আর কতক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা যায়। একবার উঠে প্রবাল নীচে নেমে বাগানে চলে এলো। গ্রামের ছেলে হয়েও প্রবালের তেমন গাছপালার শখ নেই। ছোটবেলা থেকে সে শুধু পড়াশুনোই করেছে। তাদের গ্রামের বাড়িতে ফুল গাছ ছিল না। ঘরের চালে লাউ কুমড়ো হতো। উঠোনে ছিল বেগুন গাছ কয়েকটা।

এখানে এত সুন্দর বাগান, রোজ আসাই হয় না বাগানে। জয়া অবশ্য প্রত্যেকদিন সকালে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। ফুল ছেঁড়ে না, গন্ধ শোঁকে। বেদবতী যদি বেঁচে থাকতো, এম. এ. পড়ার জন্য কলকাতা পর্যন্ত পেঁাছোতে পারতো, তারও কি কোনো ডাক্তার-অধ্যাপক-আই এ. এস-এর সঙ্গে বিয়ে হতে পারতো না!

একজন আর্দালি এসে বললো, আর টি-তে একটা কল এসেছে স্যার। আপনি ধরবেন?

প্রবাল বিরক্ত হয়ে না বলে দিতে যাচ্ছিল। কোনো মন্ত্রী হলেও সে আর ধরবে না। সে এখন ছুটিতে। তবু অভ্যেস বশে সে জিজ্ঞেস করলো, কে ফোন করেছে?

আর্দালি আবার ছুটে গেল জিজ্ঞস করে আসতে।

প্রবালের মনে হলো, চীফ সেক্রেটারি হতে পারেন। এর আগের-বার কলকাতায় দেখা হলে তিনি প্রবালকে কিছুদিনের জন্য বিদেশে পাঠাবার একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। প্রবালেরই একজন ব্যাচমেট জাপান ঘুরে এলো!

আর্দালি ফিরে এসে বললো, এস. ডি. পি. ও কল্যাণ দত্ত ফোন করছেন স্যার।

এটা প্রবাল অনায়াসেই প্রত্যাখ্যান করতে পারতো, তবু দ্রুত হেঁটে এসে সে ফোন তুলে জিজ্ঞেস করলো, কী খবর, কল্যাণ?

কল্যাণ বললো, আপনাকে কি ডিসটার্ব করলাম, স্যার? এস. পি ছুটিতে গেছেন, শুনলাম, উনি স্টেশন লীভ করেছেন। তাই ভাবলাম, খবরটা আপনাকে জানিয়ে রাখি।

প্রবাল বললো, খবরটা কী তাই বলো!

কল্যাণ বললো, এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজ একজন নৌকার মাঝিকে অ্যারেস্ট করেছি। এর সঙ্গে টিয়াজালি কেসটার কানেকশন আছে। মনে হচ্ছে, এবার কেসটার একটা ব্রেক থ্রু হবে।

—টিয়াজালির কেস মানে, কোন্ কেস?

—ঐ যে দারুকেশ্বর ভট্টাচার্যের মেয়ের মার্ডার কেস!

—তার সঙ্গে নৌকোর মাঝির কী সম্পর্ক?

—এর নৌকোয় তিনজন লোক গোটা একদিন ছিল। মেয়েটাও সঙ্গে ছিল।

—মেয়েটার ছবি ও আইডেণ্টিফাই করেছে?

—তার দরকার হয়নি, স্যার। ও যে ঘটনাটা বললো, তাই এই কেসটার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেছে। এই লোকটা একজন অ্যাকসেসরি। যদিও বলছে, ওর কোনো দোষ নেই।

—লোকটা এখন কোথায়?

—আপাতত আমার অফিসে বসিয়ে রেখেছি। আরও কথা বার করার চেষ্টা করছি।

—আমি এক্ষুনি আসছি। ওখানেই রাখো ওকে।

ফোন রেখেই ব্যস্ত হয়ে প্রবাল আর্দালিকে বললো, গাড়ি বার করতে বলো। গার্ড রেডি আছে তো? একজন গার্ড সঙ্গে যাবে, ফিরতে রাত হতে পারে।

প্রবাল দৌড়ে উঠে গেল ওপরে। পাজামা-পাঞ্জাবী ছেড়ে পরে নিল প্যাণ্ট-শার্ট। সিগারেট-দেশলাই পকেটে ভরে নিয়ে নেমে এলো তরতর করে। গাড়িতে উঠেই সে বললো, তাড়াতাড়ি চলো, এস. ডি. পি ও কল্যাণ দত্তর অফিসে।

আর্মড গার্ড তখনো এসে পৌঁছোয়নি বলে বিরাট ভাবে বকুনি দিল প্রবাল। সে সাধারণত সাবঅরডিনেটদের উঁচু গলায় ধমকায় না।

গাড়ি চলার পর প্রবাল নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। সে এত অস্থির হচ্ছে কেন? খুনের আসামী ধরা তার কাজ নয়। কল্যাণ যথেষ্ট পারদর্শী, সে ঠিক মতোই এগোচ্ছে। প্রবালের মাথা গলাবার কোনো প্রয়োজনই নেই।

সে কি তবে ঘটনার ছিন্ন সূত্রগুলো জোড়া লাগাতে চায়?

মেয়েটা নিজে থেকেই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, না কেউ তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? এখানেই একটা নদীর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা একটা নৌকোতে কাটালো মেয়েটি, কেউ জানতে পারলো না? মেয়েটি চিৎকার করে কারুর সাহায্যও চায়নি?

কল্যাণ দত্তর অফিসে পেঁৗছে প্রবাল অবশ্য অত ব্যস্ততা দেখালো না। সিগারেট ধরিয়ে ধীরে সুস্থে ঢুকলো। যেন সন্ধেবেলা তার কোনো কাজ নেই বলে সে কল্যাণের কাছে বেড়াতে এসেছে।

মাঝিটাকে রাখা হয়েছে পাশের ঘরে। মাঝবয়েসী দাড়িওয়ালা একজন লোক, এর মধ্যেই মার খেয়েছে প্রচণ্ড, কষের ধারে রক্ত জমে আছে। হাতে-পায়ে দড়ি বাঁধা। একটা আহত পশুর মতন দেয়ালের এক কোণে বসে আছে লোকটা। মুখে অপরাধের স্পষ্ট চিহ্ন। প্রবালের ধারণা, সে মুখ দেখে মানুষের চরিত্র বুঝতে পারে।

কল্যাণের ঘরে এসে একটা চেয়ার টেনে সে বসলো। তাকে দেখেই কল্যাণ দাঁড়িয়ে উঠেছে, প্রবাল হাতের ইঙ্গিতে তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলো, এই মাঝিটার স্টোরিটা কি? ওকে ধরলে কী করে?

কল্যাণ বললো, অন্য একজন মাঝি খবর দিয়েছে। মেয়েটার বডি যেদিন কেলেঘাই নদীতে ভেসে ওঠে, তার দু'দিন আগে কয়েকজন লোক ওর নৌকো ভাড়া নিয়েছিল!

প্রবাল বললো, বাইরের লোক?

কল্যাণ বললো, এ মাঝিটা তো এখন তাই বলছে। ভালো করে চেক করতে হবে। এর একটা বড় নৌকা আছে, স্যার। খড় নিয়ে যায়। ভেতরে ছই আছে, মানে থাকবার জায়গা আছে। চারপাশটা খড়ের গাদায় ঢাকা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তিনজন লোক সেই মেয়েটাকে নিয়ে এই নৌকোয় উঠেছিল। নদীর বুকেই একটা দিন আর একটা রাত কাটিয়েছে। খুব সম্ভবত মনে হচ্ছে স্যার, বর্ধমানের ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসের তিনজনই এরকমভাবে গা ঢাকা দিয়েছিল।

প্রবাল বললো, আশ্চর্য, একদিন এক রাত এখানে নৌকোয় কাটালো, কেউ টের পেল না? পুলিশও কিছু জানলো না?

বর্ধমানের ডাকাতির পর তো সব কটা জেলায় পুলিশকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছিল।

কল্যাণ বললো, বর্ষাকালে নদী এখন অনেক চওড়া। অনেক নৌকো যায়। আমাদের তো স্যার মটোর বোট নেই। নদীর ওপর চেক করার কোনো ব্যবস্থাই নেই। খেয়াঘাটগুলোর ওপর নজর রাখা হয়েছিল শুধু।

—মাঝিটা বুঝেছিল ওরা গুণ্ডা-বদমায়েশ। তবু কোনো খবর দেয়নি!

—এখন ও বলছে অবশ্য যে লোকগুলো ওকে বন্দুক দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে রেখেছিল!

—তারপর প্রায় দু'মাস কেটে গেছে। এর মধ্যেও সে নিজে থেকে এসে পুলিশকে কোনো খবর দেয়নি?

—অ্যাকরডিং টু দিস সবুর আলি মাঝি, সেই লোকগুলো ওকে শাসিয়ে গেছে যে, কোনদিন যদি ও মুখ খোলে, পুলিসকে কিছু জানায়, তা হলেই তারা এসে ওকে খুন করবে!

—আর সেই মেয়েটি? সে স্বেচ্ছায় লোকগুলোর সঙ্গে ছিল?

—না। মেয়েটির মুখ বাঁধা ছিল। মেয়েটিকে ওরা নৌকোর খোলের মধ্যে ভরে রেখেছিল, যাতে অন্য কোনো নৌকা থেকে কেউ দেখে না ফেলে!

—নৌকোয় এই মাঝি ছাড়া আর কেউ ছিল না?

—এই সবুর আলির ছেলে ছিল, তার বয়েস হবে চোদ্দ পনেরো। তার নাম কাশেম। তাকে এখনো ধরিনি। নৌকোটা সীজ করা আছে। কাশেম সেই নৌকোতেই রয়েছে।

—এখান থেকে কত দূরে আছে নৌকোটা?

—বড় জোর তিন চার কিলোমিটার হবে। স্যার, যাবেন সেখানে? আমিও ভাবছিলাম, এই সবুর আলিকে নৌকোর ওপরে নিয়ে গিয়ে জেরা করবো। অ্যাকচুয়াল সীন অফ দা ক্রাইমে গেলে অনেক কিছু আপনা আপনি বেরিয়ে আসে।

—চলো তা হলে যাওয়া যাক। আমার এখন কোনো কাজ নেই। তুমি ইনভেস্টিগেশন কনডাক্ট করো, আমি শুধু পাশ থেকে দেখবো।

কল্যাণ উঠলো প্রবালের গাড়িতে। আর একখানা গাড়িতে সবুর আলিকে নিয়ে উঠলো দু'জন কনস্টেবল। লোকটা জেদী আছে, কী নিয়ে যেন আপত্তি জানাতে গিয়ে আবার গুঁতো খেল পুলিসের কাছে। রেপ কেসের ব্যাপারে কারুকে ধরলেই পুলিস প্রথম থেকেই বেদম পেটায়। বোধহয় এক ধরনের পুরুষমানুষের ঈর্ষা কাজ করে।

কল্যাণ বললো, আমি মেয়েটিকে জীবিত অবস্থায় দেখেছি বলেই আমি এই ঘটনাটায় খুব বেশি আঘাত পেয়েছি। চাকরির ব্যাপার ছাড়াও আমার একটা জেদ চেপে গিয়েছিল, কালপ্রিটদের ধরবোই। এই লোকটার মুখ থেকে একটা যা কথা শুনলাম স্যার, শুনলে আপনারও খুব কষ্ট হবে।

প্রবাল বললো, কী ব্যাপার?

কল্যাণ বললো, এই সবুর আলি বেশ কয়েকবার শপথ করে বলেছে যে সে তার নৌকোয় বেদবতীর ওপর কোনো পাশবিক অত্যাচার করতে দেখেনি। মেয়েটার ওপর যা কিছু অত্যাচার করেছে ঐ তিনটে লোক, তা আগেই হয়ে গেছে! মেয়েটার তখন নির্জীবের মতন অবস্থা। মেয়েটাকে নিয়ে কী করবে, তা ওরা ভেবে পাচ্ছিল না। ওদের খুন করার মতলব ছিল না। ওরা যদি ব্যাংক ডাকাত হয়েও থাকে, কিন্তু ঠিক খুনী টাইপের নয়। কিন্তু মেয়েটাকে ছেড়ে দিলেও ওদের বিপদ। মেয়েটা ওদের আইডেণ্টিফাই করে দেবে পুলিসের কাছে।

প্রবাল বললো, রেপের পর এই জন্যই তো খুন করে।

কল্যাণ বললো, সবুর আলি বললো, ও নিজে শুনেছে, মাঝ-রাত্তিরে ওরা মেয়েটাকে নৌকোর খোল থেকে বার করে মুখের বাঁধন খুলে খেতে দিয়েছিল। একজন বলছিল, গালাগাল দিয়ে নয়, ভালোভাবে, মেয়েটা ওদের সঙ্গে অনেক দূর যেতে রাজি আছে কিনা। ওরা মেয়েটার আর কোনো ক্ষতি করবে না।

—মেয়েটি কোনো উত্তর দিয়েছিল?

—মেয়েটি হঠাৎ নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল।

—অ্যাঁ? পালাবার চেষ্টা করেছিল? গ্রামের মেয়ে সাঁতার জানতো নিশ্চয়ই।

— তা জানি না। কিন্তু জলে ঝাঁপিয়ে পড়েও মেয়েটা পালাতে পারেনি। ঐ বদমাসগুলো ভালোই সাঁতার জানে। ওদের মধ্যে দু'জনও জলে ঝাঁপ দেয় সঙ্গে সঙ্গে। তারপর নদীর মধ্যেই ধস্তাধস্তি হয়। সেই অবস্থাতেই বেদবতী শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা যায়। সবুর আলির বিবৃতি অনুযায়ী ওরা যখন মেয়েটিকে জল থেকে নৌকোয় তোলে, তখনই তার প্রাণ নেই। তারপর ওরা ডেডবডিটা ডিসপোজ করার চিন্তা করে।

প্রবাল দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছে। স্পষ্ট। অন্ধকারে নদীতে সাঁতার কেটে পালাবার চেষ্টা করছে একটি কিশোরী মেয়ে, দুটো গুণ্ডা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। দু'জনের সঙ্গে একা লড়াই করবে কী করে? ওদের একজন নিশ্চয়ই ওর গলা টিপে ধরেছিল।

কল্যাণ আরও অনেক কিছু বলছে, প্রবাল কিছুই শুনছে না। সে শুধু ঐ দৃশ্যটাই দেখে যাচ্ছে।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করলো, কল্যাণ, তুমি রতন দাস নামে একজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বলেছো?

কল্যাণ একটু সময় নিল বুঝতে। তারপর বললো, রতন দাস? হ্যাঁ, স্যার তার সঙ্গে আমি দু' তিনবার কথা বলেছি। সে এই কেসে ইনভলভড নয়। অন্তত পাঁচজন সাক্ষী আছে, সে বাস থেকে আগেই নেমে গিয়েছিল। রাত্তিরে সে বাড়িতেই ছিল। কলেজও গিয়েছিল পরের দিন।

—কেমন ছেলে সে?

—ভালোই ছেলে। পলিটিক্স করে। মেয়েদের পেছনে লাগে না। তবে বেদবতী সম্পর্কে তার জেনুইন দুর্বলতা ছিল। খুবই ভেঙে পড়েছে দেখলাম। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে না। সবচেয়ে আয়রনিক ব্যাপার হচ্ছে, সেই সন্ধেবেলা কী জানি কেন সে চেয়েছিল বেদবতীকে বাড়িতে পেঁৗছে দিতে। বেদবতী রাজি হয়নি। তার বাবা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকেন। একজন ছেলের সঙ্গে বেদবতী ফিরছে দেখলে তিনি রাগ করতেন।

প্রবাল নিজের ছাত্র বয়সের চেহারাটা দেখতে পেল। মালিনী এখন কোথায় আছে কে জানে। মালিনীকে দেখলে সে হয়তো এখন চিনতেও পারবে না।

কেলেঘাই নদীর ঘাটে বড় নৌকোটার পাশে আরও দুটো ছোট নৌকো বাঁধা! সবুর আলির এখন দাঁড় বাইবার ক্ষমতা নেই। অন্য দু'জন মাঝিকে ডেকে তোলা হলো সেই নৌকোয়! পুলিসের আদেশ ওরা অগ্রাহ্য করতে পারে না।

সবুর আলির ছেলে কাশেমকে এক ঝলক দেখলো। রোগা, পাতলা, সরল চেহারার এক কিশোর। এর চোখের সামনেই ঐ বীভৎস কাণ্ডগুলো ঘটেছে? সারাজীবন ও কি সে কথা ভুলতে পারবে? এই বয়েসে ওর ইস্কুলে যাবার কথা। তার বদলে ও নৌকোর হাল ধরতে শিখেছে।

প্রবাল এপ্রিল মাসের পর আর এই নদীর ধারে আসেনি। বর্ষার পর কেলেঘাই এমন স্বাস্থ্যবতী হয়েছে যে সত্যিই চেনা যায় না। কানায় কানায় উপছে উঠছে জল। অন্ধকারে মনে হচ্ছে অতল কালো জলে জমছে মত্ত ঢেউয়ের খেলা।

নৌকোটা চলেছে অকুস্থলে। কল্যাণ সবুর আলি আর অন্য মাঝিদের জেরা করে যাচ্ছে, প্রবালের যেন আর কোনো আগ্রহ নেই। সে বসে আছে গলুইয়ের কাছে। আকাশে আজ বেশ জ্যোৎস্না। জয়ারা অনেক আগেই পৌঁছে গেছে শান্তিনিকেতনে। এখন খুব মজা করেছে ওরা। বিজন প্রবালের মতন গরিবের ছেলে নয়। নানান জায়গায় সম্পত্তি আছে। শান্তিনিকেতনে আগে থেকেই জমি কেনা ছিল, নিশ্চয়ই বড় বাড়ি বানিয়েছে। জয়ার কি একবারও মনে হয়, প্রবালের বদলে বিজনের সঙ্গে বিয়ে হলেই ভালো হতো? অবশ্য জয়া বলে, বিজনের সঙ্গে পার্টিতে আড্ডা দিতেই মজা লাগে আসলে মানুষটা খুব হালকা। বিশেষ পড়াশুনো নেই। অমন মানুষের সঙ্গে সারাজীবন কাটাতে পারতো না।

নৌকোটা এসে থেমেছে এক জায়গায়, নদীর মাঝখানে। সবুর আলিকে প্রবালের কাছে টেনে এনে কল্যাণ বললো, স্যার, এর মধ্যে আর একটা জিনিস জানা গেল। এর বাড়ি সার্চ করে আমাদের লোক একটা শাড়ি পেয়েছে। ঐ বেদবতীর শাড়ি। মেয়েটা মরে যাবার পর ডেডবডিটা জলে ফেলে দেবার আগে এই সবুর আলিই বলেছিল, তাহলে আর শুধু শাড়িটা নষ্ট করার কী দরকার। ও শাড়ি আর জামা-টামা খুলে নিয়েছিল বডি থেকে।

প্রবাল বললো, মেয়েটার শরীরের সঙ্গে পাথর বেঁধে ফেলা হয়েছিল, তা ঠিক?

—হ্যাঁ স্যার, পাথর বাঁধা হয়েছিল সেই জন্যই ভেসে উঠেছে আরও একদিন পরে।

—এখানে পাথর পেল কোথা থেকে?

—নৌকোয় এরা রান্না করে খায়। মশলাবাটার শিল-নোড়া ছিল। সেই শিলনোড়াই বেঁধে দিয়েছিল।

—কে বেঁধেছে?

হঠাৎ লাফিয়ে উঠলো প্রবাল। বিকট গলায় চিৎকার করে উঠলো, কে সেই পাথর বেঁধেছিল? কে? তুই বেঁধেছিলি?

সবুর আলির গলা টিপে ধরে তাকে পাটাতনের ওপর আছড়ে ফেলে দিল প্রবাল। তারপর তার বুকের ওপর চড়ে বসে চিৎকার করতে লাগলো, বল, বল, তুই বেঁধেছিলি? নিজের হাতে···

কল্যাণ আর একজন পুলিশ জোর করে টেনে তুললো প্রবালকে। সে এমন জোরে সবুর আলির গলা টিপে ধরেছিল যে লোকটা মরেও যেতে পারতো। তা হলেই কেলেঙ্কারি হতো একটা। আজকাল এসব ব্যাপার চাপা দেওয়া যায় না।

কল্যাণ বেশ ভর্ৎসনার সুরে বললো, এ আপনি কী করছিলেন, স্যার? হঠাৎ এমন খেপে গেলেন কেন? যা জিজ্ঞেসবাদ করার আমিই তো করছিলাম।

প্রবালের শরীরটা এখনো থরথর করে কাঁপছে। সে কোনো কথা বলতে পারছে না।

কল্যাণ তার দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। প্রবাল নিল না। সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জলের দিকে। সবুর আলির বদলে এখন তার এই নদীর গলা টিপে ধরতে ইচ্ছে করছে। বিশ্বাসঘাতিনী নদী তাকে বাঁচাতে পারলো না!

নৌকোটা কোন্ দিকে যাচ্ছে এখন তা কিছুই খেয়াল করছে না প্রবাল। তার বাড়ি ফেরার কোনো তাড়া নেই। এরকম একটা জ্যোৎস্না রাতে নদীর ওপর নৌকো ভ্রমণ অন্য কোনো উপলক্ষে কত উপভোগ্য হতে পারতো। কিন্তু এই নদীতে একটি নিষ্পাপ মেয়ের

মৃতদেহ ভেসে উঠেছিল, এই নৌকোতে তার শরীর থেকে সব বস্ত্র খুলে নেওয়া হয়েছে !

একটু পরে একজন কনস্টেবলের কথা শুনে আবার চমকে উঠলো প্রবাল।

সেই পুলিশটি কল্যাণকে বলছে, ঐ যে দেখুন স্যার, ডান দিকের পাড়ে একজন হ্যারিকেন নিয়ে বসে মাটি খুঁড়ছে। বোধহয় সেই বুড়ো !

কল্যাণ জিজ্ঞেস করলো, কোন্ বুড়ো ? মাটি খুঁড়ছে কেন ?

পুলিশটি বললো, আজ দুপুর থেকে স্যার একজন এই নদীর ধারে ধারে সাইনবোর্ড বসাচ্ছে। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে গেঁথে দিচ্ছে। সেগুলো তুলে ফেলতে হবে কি না, সেরকম কোনো অর্ডার পাইনি।

—কিসের সাইনবোর্ড ?

—এই নদীর নাম বদলে কী যেন একটা অন্য নাম।

—বোধহয় তাই হবে। বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এত রাতেও মাটি খুঁড়ছে।

কল্যাণ গলা তুলে প্রবালকে বললো, স্যার শুনলেন ব্যাপারটা ? দারুকেশ্বর ভটচাজ নিজেই সাইনবোর্ড বসাচ্ছে ! ওগুলো কি তুলে ফেলা হবে ?

প্রবাল উত্তর না দিয়ে ডান দিকে তাকালো। নৌকোটা পাড় ঘেঁষেই যাচ্ছে এখন। এদিকটা ফাঁকা। এক জায়গায় হ্যারিকেনের পাশে বসে আছে একজন মানুষ। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, সে যে মাঝে মাঝে শাবল তুলছে, বোঝা যাচ্ছে সেটুকু।

প্রবাল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমাকে এখানে নামিয়ে দাও। একা নামবো। তোমরা কেউ সঙ্গে এসো না।

কল্যাণ বললো, এখানে নামবেন কেন ? আপনার গাড়ি অনেক দূরে। আমরা এখন সেদিকেই ফিরছি।

প্রবাল আদেশের সুরে বললো, নৌকো ভেড়াতে বলো ! আমি নামবো।

নৌকোটা লাগলো একটু দূরে। কাদার মধ্যে লাফিয়ে নেমে প্রবাল বললো, কল্যাণ, তোমরা এগিয়ে যাও, আমি একটু পরে আসছি। যাও, এগিয়ে যাও !

বৃদ্ধটি এক মনে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে। তার কাছে কে এলো, না এলো, সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘামে জবজব করছে তার গায়ের জামা। কপাল দিয়ে টপটপ করে ঝরে পড়ছে ঘাম।

সাইনবোর্ডটি পড়ে আছে একপাশে। প্রবাল সেটা তুলে নিয়ে দেখলো বড় বড় অক্ষরে লেখা বেদবতী। তলায় ব্রাকেটে ছোট অক্ষরে লেখা কেলেঘাই নদীর নতুন দাম। তার নীচে লেখা, এই নদীর জলে বেদবতী নামে এক কন্যা প্রাণ দিয়াছে, এই নদীর নামে সেই কন্যা চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবে।

দারুকেশ্বর ভট্টাচার্য মুখ ফিরিয়ে একবার দেখলো প্রবালকে। অন্যদিনের মতন সে বিনয়ে বা ভক্তিতে গদগদ হলো না। শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলো, আপনি এগুলো তুলে দিতে এসেছেন?

পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রবাল বললো, না। নদীর ধারে কে কী সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে, তা নিয়ে সরকার মাথা ঘামাতে যাবে কেন? সবশুদ্ধ, এরকম কটা লাগিয়েছেন?

—পাঁচটা! আমি নিজের হাতে বানিয়েছি, নিজের হাতে লিখেছি।

—বেশ ভালোই বানিয়েছেন। তবে টিনের দাম আছে। সরকার কিছু না বললেও অন্য লোকেরা খুলে নিয়ে যেতে পারে।

—তা নেয় নিক। যার ধর্ম সে নেবে। আমার লাগাতে ইচ্ছে হয়েছে আমি লাগাচ্ছি। আমার কর্ম আমি করছি।

—এই সাইনবোর্ড লাগালেই কি এ জেলার মানুষ এই নদীর নাম বদল মেনে নেবে?

—তা জানি না। আমি যতদিন বাঁচবো, চেষ্টা করে যাবো।

শাবল খোঁড়া থামিয়ে প্রবালের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে কয়েক পলক তাকিয়ে দারুকেশ্বর জিজ্ঞেস করলো, ডি এম সাহেব, আপনি পরজন্মে বিশ্বাস করেন?

—একটু ইতস্তত করে প্রবাল বললো, না। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না।

দারুকেশ্বর বললো, আমি করি। আমরা পুরোনো লোক, আমরা মানি। আমার মেয়ে আবার জন্মাবে। আমার মতন গরিব আর দুর্বলের ঘরে না, অনেক বড় ঘরে সে জন্মাবে। এ জন্মে সে

বড় কষ্ট পেয়ে, বড় ব্যথা নিয়ে গেছে। পরের জন্মে সে শোধ তুলবে। সে সব দুষ্টের দমন করবে! আর কেউ কোনো নারীর ওপর অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি চোখ বুজবো!

প্রবাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

তারপর বললো, পণ্ডিতমশাই, আপনি বড্ড ঘেমে গেছেন। শাবলটা এবার আমাকে দিন। আমি গর্ত খুঁড়ে দিচ্ছি। তারপর আপনি সাইনবোর্ড বসিয়ে দেবেন।

দারুকেশ্বর বললো, না, না, তার দরকার নেই। আমিই পারবো। আপনি কেন কষ্ট করবেন!

প্রবাল তবু জোর করেই নিয়ে নিল শাবলটা।

সেটা মাটিতে পোঁতার পর তার মনে হলো, সে যেন তার বাবার জন্য গ্রামের বাড়িটা পাকা করে দেবার কাজের ভিত খুঁড়ছে।

সে জোরে জোরে শাবল চালাতে লাগলো।

এই পৃথিবীতে

মেয়েটি থাকে একটি ছোট পাহাড়ের একেবারে চূড়ার কাছে। একা।

কোনো এককালে, হয়তো ব্রিটিশ আমলে, এই পাহাড়টার মাথায় একটা অবজারভেটরি পোস্ট বানানো হয়েছিল। গোল গম্বুজের মতন একটা ঘর। সেকালে সবকিছুই মজবুতভাবে বানানো হতো, তাই গম্বুজ-ঘরটা এখনো ভেঙে পড়েনি, কিন্তু অনেকদিন এটার কোনো ব্যবহার নেই, বাইরের আলকাতরা দিয়ে লেখা, অ্যাবানডান্ড।

ঘরটা ভেঙে না পড়লেও তার চারপাশে এমন ঝোপঝাড় গজিয়ে গেছে তা একটু দূর থেকে প্রায় দেখাই যায় না। একটা বটগাছ মাথার দিকটা পুরো ঢেকে দিয়েছে। এদিকে কেউ হঠাৎ এসে পড়লেও গম্বুজ-ঘরটা সহজে লক্ষ্যই করবে না। অবশ্য, এখানে কাছাকাছি এমন অনেক পাহাড় আছে, পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ, সুতরাং এই বিশেষ পাহাড়টির চূড়ায় হঠাৎ কারুর আসার দরকারই হয় না।

এই গম্বুজ-ঘরটা অটুট থাকলেও এর দরজাটা কেউ খুলে নিয়ে গেছে একসময়। এই দরজা-ছাড়া ঘরেই মেয়েটি রাত্রিবেলা শুয়ে থাকে, তার এখন আর ভয় করে না।

রাত্তিরবেলা জঙ্গলে নানারকম শব্দ হয়। সামান্য একটা গাছের পাতা খসে পড়লেও বেশ জোরে শব্দ শোনা যায়। এক এক সময় মনে হয়, শুকনো পাতার ওপর কে যেন খড়মড়িয়ে হাঁটছে। প্রথম প্রথম মেয়েটি বাইরে এসে উঁকি দিয়ে দেখতো, কিছুই চোখে পড়ে না। হয়তো রাত্তিরবেলা অশরীরীরা আসে, কিংবা আকাশ থেকে নেমে আসে পরীরা, এক একটা জ্যোৎস্না রাতে সত্যিই মনে হয় আকাশ ছেয়ে গেছে পরীতে। যাই হোক, তারা কেউ ভয় দেখায় না মেয়েটিকে, তার সঙ্গে ভাব করতেও আসে না।

মাঝে মাঝে দু'একটা খরগোশ চোখে পড়ে। বেশ বড় বড় খরগোশ, সাদা নয় ধূসর রঙের। সে দূরে শেয়ালের ডাক শুনতে পায় কিন্তু তারা কাছে আসে না। আগে তার ধারণা ছিল সব জঙ্গলেই বাঘ-ভাল্লুক থাকে। কিন্তু এ পর্যন্ত একটাও বাঘ কিংবা ভাল্লুক দেখেনি, তাদের ডাকও শোনেনি। শুধু একদিন, অনেক দূরে, পাহাড়ের নীচের উপত্যকায় সে একপাল হাতি দেখেছিল। হাতিগুলো মড়মড় করে গাছের ডাল ভাঙছিল, সে খুব আশা করেছিল যে হাতিরা পাহাড়ের ওপর উঠে আসবে, তাকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে একটা আছাড় দেবে। কিন্তু হাতিরা ওপরে আসেনি, আর দ্বিতীয়বার তাদের দেখাও যায়নি। গাছ ভাঙতে ভাঙতে তারা অনেক দূরে চলে গেছে।

মেয়েটির নাম ওমি। তার বয়েস ছাব্বিশ কিংবা সাতাশ। অথবা আঠাশও হতে পারে।

এই পাহাড় থেকে নামার কোনো পথ নেই, কারণ এখানে মানুষ আসে না। পাহাড়ের গা-ভরা ঘন জঙ্গল অনেক বড় বড় গাছ, যাদের নাম ঐ মেয়েটি জানে না, অনেক ফুলও সে চেনে না। একটি মাত্র তার চেনা গাছ আছে, কাঁঠাল গাছ, তাতে যথেষ্ট কাঁঠাল ফলে। আর পাহাড়ের নীচের দিকে দেখা যায় কলা গাছের ঝাড়।

বড় বড় গাছের তলায় নানা রকম লতা-গুল্মের ঝোপ। সেইসব ঠেলে ঠেলে নীচে নেমে গেলে আর একটা ছোট পাহাড়, সেখানে রয়েছে একটা পাকদণ্ডী পথ। সেই ছোট পাহাড়টায় কিছু মানুষ কাঠ কাটতে আসে। এখানে সমতল প্রায় নেই-ই বলতে গেলে, শুধুই পাহাড়। এরকম তিনটে পাহাড় পেরুলে একটা ছোট্ট গ্রাম, সেখান দিয়ে ট্রেন যায়। মিটার গেজের ছোট ট্রেন, ওপর থেকে চলন্ত ট্রেনকে মনে হয় একটা শুঁয়োপোকার মতন। দিনে দু'বার সেই ট্রেন যখন কাছাকাছি একটা টানেলে ঢোকে, তখন ওপরের পাহাড়ে পর্যন্ত গুমগুম শব্দ হয়।

ওমি একা সেই গম্বুজ-ঘরে থাকে। তার কথা বলার কেউ নেই বলে এক এক সময় সে গাছপালার সঙ্গেই কথা বলে।

গম্বুজটা জড়িয়ে আছে যে বট গাছটা, সেটার সঙ্গে তার ভাব নেই। বটগাছটা কেমন যেন গম্ভীর ধরনের। কাঁঠাল গাছের

সঙ্গেও ঠিক বন্ধুত্ব হয় না যখন কাঁঠাল গাছের সারা গায়ে কাঁঠাল ফলে, তখন ঠিক তাকে ঠাকুমা-ঠাকুমা দেখায়।

একটা নাম-না-জানা মাঝারি উচ্চতার গাছ ওমির খুব বন্ধু। সেই গাছের কাণ্ডটা সোজা উঠে গেছে অনেকখানি, ওপরের দিকে ছাতার মতন ডালপালা মেলা। একেবারে ডগার দিকের পাতা-গুলো লাল রঙের, দূর থেকে সেগুলোকেই ফুল মনে হয়। গাছটার গা খুব পরিষ্কার, খুব মোটাও নয়, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরা যায়। ওমি সেই গাছটার নাম দিয়েছে রঞ্জন। খুব একটা ভেবে-চিন্তে সে এই নাম রাখেনি, হঠাৎই এই নামটা মনে এসেছিল। রঞ্জন নামে ওমির চেনাশুনো কেউ ছিল না কখনো।

গাছটার সঙ্গে ওমির খুব বন্ধুত্ব, আবার মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয়। তার খুব বিপদের সময় এই গাছটা তাকে কোনো সাহায্য করতে পারেনি।

তবু, গাছটাকে সে ক্ষমা করে দিয়েছে, মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে ওমি ফিসফিস করে বলে, রঞ্জন, রঞ্জন, ভালো আছো? আমার দিকে একবার তাকাও।

এখানে শীতই বেশি, বছরের প্রায় ছ'মাস শীত। বর্ষার দিনে দারুণ বৃষ্টি হয়, টানা তিন-চার দিন, সেই বৃষ্টির মধ্যেও বেশ শীত করে। আবার মাঝে মাঝে বেশ গরমও পড়ে। গরমের সময় এমন তেতে ওঠে পাথর যে পা রাখা যায় না, চিড়বিড় করে সারা শরীর, তখন ওমি শাড়ি খুলে ফেলে। কেউ তো দেখার নেই। প্রথম প্রথম তার খুব লজ্জা করতো, মনে হতো গাছগুলোই তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার দু'খানা মাত্র শাড়ি। একদিন বৃষ্টিতে সেই দু'খানাই ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল, সে গম্বুজ-ঘরের মধ্যে কিছু না পরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল গোটা একটা দিন।

আস্তে আস্তে তার লজ্জা কেটে গেছে। এখন সে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে থেকেই আস্তে আস্তে খুলে ফেলে নিজের শাড়ি, গাছটার গায়ে চুমু খায়, দুটো উরু ঘষতে ঘষতে বলে, রঞ্জন, রঞ্জন, আমায় একটু ভালোবাসবে?

এ পর্যন্ত কোনো পুরুষ ওমিকে ভালোবাসেনি, কেউ একজনও তার সঙ্গে একটু ভালো কথা বলেনি।

গম্বুজ-ঘরটার পেছন দিকে খানিকটা নেমে গেলে একটা জায়গায় পাহাড় ফুঁড়ে জল বেরোয়। ঠিক ঝর্ণা বলা যায় না। সামান্য একটু জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসে, একটা কলসী ভরতে অনেকক্ষণ সময় নেয়। কিন্তু সারা বছরে সেই জল কখনো শুকোয় না। এই পাহাড়গুলোর অনেক জায়গাতেই এরকম জলের উৎস আছে। এই সব জল গড়িয়ে গিয়ে নীচে কোথাও একটা নদী হয়েছে।

যদিও পাথর-চোঁয়ানো জল, তবু ওমি তার নাম দিয়েছে ঝর্ণা। জলের একটা টান আছে। সারাদিনের বেশির ভাগ সময়ই ওমি সেই ঝর্ণার ধারে বসে থাকে। সে জল বয়ে নিয়ে যাবার ঝামেলা করে না। এখানেই সে পাথর দিয়ে একটা ছোট উনুন বানিয়ে নিয়েছে, এখানে সে সেরে নেয় রান্নাবান্না। রান্না মানে শুধু খিচুড়ি। দিনের পর দিন, তাও তার একঘেয়ে লাগে না। কিছু একটা খেলেই তো হলো।

প্রথম প্রথম ওমি শুধু কাঁঠাল খেয়ে কাটিয়েছে। তখন গ্রীষ্মকাল ছিল। তিন-চার দিন পাকা কাঁঠাল খেয়েই শুরু হয়েছিল তার ভেদবমি। দশ-বারো বার বমি করার পর তার আর এক পাও চলার ক্ষমতা ছিল না। সে অজ্ঞানের মতন হয়ে পড়েছিল এই ঝর্ণার ধারে সে ভেবেছিল, এইবার তার মৃত্যু আসবে। সে ভয় পায়নি। মরতে তো তার একটুও আপত্তি ছিল না।

তবু তার মৃত্যু হলো না। মৃত্যুর জন্য যে সব সময় তৈরি হয়ে থাকে, মৃত্যুও তাকে নিয়ে খেলা করে।

তারপর ওমি অবশ্য পাকা কাঁঠাল আর কক্ষণো খায়নি। সে বুঝে গেছে, পাকা কাঁঠাল হজম করার ক্ষমতা তার নেই।

এই পাহাড়ে আসার আগে ওমি অন্তত সাত বার তীব্রভাবে মরে যাওয়ার কথা ভেবেছে। কিন্তু কীভাবে মরা যায়? মৃত্যুকে ভয় না পেলেও শারীরিক কষ্ট সম্পর্কে ওমির ভয় আছে। সেই জন্য সে গায়ে আগুন লাগাতে পারেনি, ট্রেন লাইনে ঝাঁপ দিতে পারেনি, গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে পারেনি। জলে ডুবে সে অবশ্য মরতেই পারবে না, কারণ সে সাঁতার জানে না।

এখন এই জঙ্গলে একা থাকতে থাকতে আর তার চট করে মরতে

ইচ্ছে করে না। এইরকম ভাবে যদি জীবন কাটে তো কাটুক। এক এক সময় খুব মন খারাপ লাগলে সে রঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে তার নগ্ন সুগোল দুটি স্তন চেপে ধরে বলে, রঞ্জন, আমায় একটু আদর করো। রঞ্জন, আমায় একটু ভালোবাসো!

॥ ২ ॥

ওমি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটা পড়েনি, তবে সিনেমায় দেখেছে। ওমি কপালকুণ্ডলার মতন নয়, সে জঙ্গলের মধ্যে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠেনি, এমনকি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত সে কোনো জঙ্গলই দেখেনি।

ওমির জন্ম হয়েছিল ব্যারাকপুরে, রেললাইনের ধারেই ছিল তার বাড়ি। ছ'টি ভাইবোনের মধ্যে সে সেজো। তার একটা ভালো নাম ছিল, ইস্কুলে তার নাম ছিল অমলা, কিন্তু ক্লাস এইটে ইস্কুল ছাড়ার পর সেই নামে কেউ আর তাকে ডাকেনি।

পাড়ার জুনিয়ার হাইস্কুলে ক্লাস এইট পর্যন্তই পড়েছিল ওমি, এক চান্সে পাশ করতে পারলো না। পরের বছর সেই স্কুলটা উঠে গেল। ওমিকে আর অন্য কোনো স্কুলে পাঠানো হলো না, সে পড়াশুনোয় ভালো ছিল না, তার বাবা-মায়েরই বা গরজ থাকবে কেন? ইস্কুলে মাইনে লাগে না বটে, তবু তো কিছু খরচ থাকে। সে বছর ওমির মায়েরও হাঁপানি হলো খুব, ওমিকে ভার নিতে হলো রান্নাঘরের।

ছেলেবেলা থেকেই ওমি শুনে আসছে যে তাকে খুব খারাপ দেখতে। তার কোনো গুণ নেই। বাবা-মায়ের সংসারে সে একটা বোঝা।

ওমির গায়ের রং কালো, তাও সে কালোর মধ্যে চকচকে ভাব নেই, কেমন যেন খসখসে ধরনের। বাচ্চা বয়েস থেকেই সে রোগা আর খুব পেটের অসুখে ভুগতো। তার মা পর্যন্ত মাঝে মাঝে রাগ করে বলতো, এই শাকচুন্নীটা আমার পেটে যে কী করে এলো!

ভাই-বোনদের মধ্যে কেউই সেরকম সুশ্রী নয়, তবে ছেলেদের

চেহারা নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামায় না। ছেলেরা হচ্ছে ছেলে। ওমির আর একটাই বোন, সে সবচেয়ে ছোট, তার গায়ের রং তেমন কালো নয়, বরং ফর্সারই দিকে, সেইজন্যই সবাই তাকে সুন্দর বলে। আর তার সঙ্গে তুলনা করেই ওমিকে সবাই বলতো শাকচুন্নী, পেত্নী, হাড়গিলে।

আঠারো-উনিশ বছর বয়েসে, যখন ওমির সমবয়েসী মেয়েরা বেশ ভার-ভারন্ত হয়ে উঠলো, তখনও ওমির বুক প্রায় শুকনো। তার স্তন যেন দুটি ছোট পেয়ারার মতন, তার উরু দুটি কলাগাছের বদলে বাঁশের মতন। বয়েসের হিসেবে যৌবন এসে গেলেও তার শরীরে যৌবনের জোয়ার এলো না। শুকনো-চিমসেই থেকে গিয়েছিল সে।

ওমিদের পাড়ারই মেয়ে জয়ন্তীর যেদিন বিয়ে হলো, সেইদিনই ওমির প্রথম মরে যেতে ইচ্ছে হয়েছিল।

জয়ন্তীর বাবা ওমির বাবারই মতন জুট মিলে কাজ করে। জয়ন্তীও লেখাপড়া শেখেনি বেশি, মাধ্যমিক পাশ করতে পারেনি, কিন্তু জয়ন্তীর গায়ের রং মাজা মাজা, স্বাস্থ্যটি বেশ সুন্দর, চোখ দুটো টানা টানা, সেইজন্যই তার বিয়ে হয়ে গেল এক গ্র্যাজুয়েট কেরানীর সঙ্গে, নগদ পণের টাকা দিতে হয়নি, শুধু বরযাত্রীদের জন্য বাস রিজার্ভ করতে হয়েছিল, আর দশখানা প্রণামীর শাড়ি, আর চার ভরি সোনার গয়না।

জয়ন্তীর বিয়েতে একটুও হিংসে হয়নি ওমির, জয়ন্তী ছিল তার বন্ধু! কিন্তু জয়ন্তীর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হতেই মা আর বড়বৌদি খোঁটা দিয়ে বলতে লাগলো, জয়ন্তীটা তো ভালোয় ভালোয় পার হয়ে গেল। এখন ওমির কী হবে? ওকে? ওকে কে নেবে?

ওমিকে কেউ নেবে না? সে দেখতে সুন্দর নয়, তার স্বাস্থ্য ভালো নয়, তার কোনো গুণ নেই। কিন্তু সে একটা মেয়ে। সে ছেলে হলে কোনো দোষ ছিল না, ছেলেরা যেমন খুশী থাকতে পারে, কিন্তু কোনো মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখা যায় না।

বিয়ের পরদিন জয়ন্তী যখন সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেল, তখন ওমি একটা ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেবেছিল, শাড়ির ফাঁস গলায়

বেঁধে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়বে। সে মরে গেলেই সকলের শান্তি। সে তার বাবা-মায়ের জন্য আর কিছু করতে পারে না, অন্তত মরে গিয়ে তো দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে পারে? একবার গলায় ফাঁস দিয়ে টেনে দেখেছিল ওমি। মৃত্যুর আগে কয়েকটা মিনিট যে অসম্ভব ব্যথা লাগবে, সেইটাতেই তার ভয়। সে ব্যথা সহ্য করতে পারে না। কেউ যদি জোর করে হাত-পা বেঁধে তাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়!

রেললাইনের কাছেই বাড়ি। এক একদিন ওমি রাত্তিরবেলা গিয়ে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থেকেছে। একটা ট্রেন তাকে এক ধাক্কায় শেষ করে দিলেই চুকেবুকে যায় সবকিছু। কিন্তু মরতে কতটা সময় লাগে? ট্রেনটা এসে ধাক্কা দেবার পরেও শরীরটা মুচড়ে দলা পাকিয়ে কিছুক্ষণ কি খুব কষ্ট দেয়? সেই দৃশ্যটা ভাবতেই ওমি শিউরে উঠে পালিয়ে গেছে রেললাইন থেকে।

জয়ন্তীর বিয়ে ছাড়াও আর একটা ঘটনা খুব দাগ কেটেছিল ওমির মনে।

ওমির পিসেমশাইরাও থাকতেন ঐ একই পাড়ায়। একমাত্র রাণু পিসিমাই ওমিকে কখনো বকাঝকা করতেন না, ওমির চেহারা নিয়ে খোঁটা দিতেন না, বরং অন্য কেউ ওমিকে অপমান করলে তিনি বকুনি দিতেন। রাণু পিসিমার বয়েস তখন তিরিশ-বত্রিশ হবে, বেশ চলনসই চেহারা, পিসেমশাই ওমির বাবার থেকে একটু ভালো চাকরি করতেন বলে ওদের সংসারটা মোটামুটি সচ্ছল। ঘরদোর সাজানো, একটা রুচির ছাপ আছে।

রাণু পিসিমা বলতেন, দ্যাখ ওমি, চেহারার ওপর তো মানুষের হাত নেই। এক এক জন এক এক রকম চেহারা নিয়ে জন্মায়। কিন্তু জীবনটা প্রত্যেকের নিজস্ব। ইচ্ছে মতন জীবনটা বদলানো যায়। যে-যাই বলুক, তুই কখনো মনের জোর হারাবি না।

রাণু পিসিমার চেহারা ওমির চোখে খুবই সুন্দর মনে হতো। অনেকেই তাঁকে পছন্দ করে। মাঝে মাঝে সেজেগুজে তিনি কলকাতায় সিনেমা দেখতে যান। একবার কলকাতায় কোথায় যেন সারারাত ধরে গান বাজনার ফাংশান হলো, রাণু পিসি জোর করে পিসেমশাইকে দিয়ে তার টিকিট কাটিয়ে, দু'জনে সেই ফাংশান

দেখতে গেলেন। এই রাণু পিসির মুখে এইসব কথা মানায়। তিনি ইচ্ছেমতন অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু ওমি কী করে তার জীবনটাকে বদলাবে? নিজেদের পাড়া ছেড়ে সে কখনো কোথাও যায়নি, যেতে তার সাহস হয় না। কোথায়ই বা যাবে!

হঠাৎ একদিন একটা দৃশ্য চোখে পড়ে গেল ওমির।

সেদিন সন্ধে থেকেই লোডশেডিং। নিজেদের বাড়িতে কিছুতেই মন টিঁকছিল না ওমির। অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতো চলে এলো রাণু পিসিদের বাড়ি। পিসেমশাইয়ের কারখানায় ডিউটি, রাণু পিসির ছেলে বীরু হ্যারিকেন জেবলে মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছে। রাণু পিসিকে রান্নাঘরে কিংবা শোওয়ার ঘরে পাওয়া গেল না।

গরমের দিনে অনেক সময় ওমি দেখেছে, রাণু পিসি ছাদে মাদুর পেতে বসে আর একটা বই খুলে গুন গুন করে গান গায়। ভারি ভালো লাগে শুনতে সেই গান। ওমিদের বাড়িটা টিনের, তাদের ছাদ নেই।

ওমির কাছে টর্চ ছিল না, সিঁড়ি হাতড়ে হাতড়ে সে উঠে এলো ওপরে। ছাদের দরজাটা বন্ধ। ওমি একবার ঠেলতেও খুলল না। কিন্তু ওমি জানে, ছাদের দরজাটা ওপাশ থেকে বন্ধ করা যায় না, ওদিকে কোনো-ছিটকিনি নেই।

সে আবার জোরে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল, ওপাশ থেকে দড়াম করে কিছু পড়ে যাবার শব্দ হলো। একটা লম্বা তক্তা কোনাকুনি রেখে দরজাটাকে আটকাবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা ঠিক লাগেনি।

ছাদের মাদুরের ওপর একজন নয়, দু'জন।

অন্ধকারে প্রথম ওমির মনে হয়েছিল, কেউ বুঝি রাণু পিসিকে গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। সে ও মা গো বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই তার ভুল ভাঙে। তাকে দেখেই একজন পুরুষ কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল একপাশে তার রাণু পিসি শাড়ি সামলাতে লাগলেন।

তখনও ওমি ভেবেছিল, পিসেমশাই আর রাণু পিসির দাম্পত্য

আনন্দের মধ্যে সে এসে পড়ে বাধার সৃষ্টি করেছে। লজ্জায় গরম হয়ে গিয়েছিল তার কান। নিশ্চয়ই পিসেমশাই আর রাণু পিসি খুব রাগ করবেন তার ওপর।

তবু এক্ষুণি সে ফিরে যেতেও পারছিল না, তা পা দুটো যেন গেঁথে গেছে মাটিতে। চতুর্দিকে লোডশেডিং, মেঘলা আকাশ, তবু তার মধ্যেও মানুষ চেনা যায়। পুরুষ মানুষটি পিসেমশাই নন, তপনদা।

তপনদা ছাদের এক কোণের দিকে চলে গেল। রাণু পিসি নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে উঠে বসলেন। তারপর একটুও লজ্জা না পেয়ে পরিষ্কার গলায় বললেন, ওমি, তুই নীচে গিয়ে বোস। আমি আসছি একটু পরে।

ওমি আর দাঁড়ায়নি। পেছন ফিরে সে হুড়মুড়িয়ে ছুট দিল, একটুও না থেমে সোজা চলে এলো নিজেদের বাড়িতে। রান্নাঘরের পেছনটায় গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে।

রাণু পিসির ওপর তার রাগ হয়নি। কারুকে হিংসে করার মতন মনের জোরও তার ছিল না। তার খুব অভিমান হয়েছিল তপনদার ওপর। এই তপনদা তার বড়দার বন্ধু, এ বাড়িতে প্রায় প্রত্যেক দিন আসে। তপনদার সঙ্গে যে রাণু পিসির ওরকম ভাব আছে, সে ঘুণাক্ষরেও কখনো টের পায়নি। তপনদা ওমির দাদার কাছে আসে, আড্ডা মারে, দু'তিনবার চা খায়। এক এক সময় দাদা বাড়িতে না থাকলেও দাদার বিছানায় শুয়ে থাকে, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলে, এই ওমি, এক কাপ চা করে দে তো!

একলা ঘরে তপনদাকে কতবার চা দিতে গেছে ওমি, কিন্তু তপনদা একবারও তার হাত ধরেনি। কোনোদিন তাকে একটুও আদর করেনি। তাকে যেন একটা মেয়ে বলেই মনে করে না!

পৃথিবীতে যাদের অনেক বেশি আছে, তারাই কি আরও বেশি করে পায়? রাণু পিসির কিছুরই অভাব নেই, তবু সে তপনদার ভালোবাসা পাবে! হয়তো আরো অনেকেই রাণু পিসিকে মনে মনে চায়। ওমিকে কেউ চায় না। আজ পর্যন্ত একজন পুরুষও ওমির দিকে সেরকম কোনো ইঙ্গিতও করেনি। কোনো পুরুষই তাকে যেন মেয়ে বলে গণ্য করে না!

রাণু পিসির বাড়ি যাওয়া সে একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিল তারপর থেকে। রাণু পিসি অবশ্য অনেকবার ডেকে পাঠিয়েছেন, নিজে এ বাড়িতে এসে ওমিকে বলেছেন, তোর কী হলো রে? আর আসিস না কেন? ওমি লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকতো। সেই সন্ধেবেলার ঘটনাটা সে ঘুণাক্ষরেও কারুকে জানায় নি, সেইজন্যই কি সেবার পুজোর সময় রাণু পিসি তাকে একটা ভালো শাড়ি দিলেন?

চব্বিশ বছর বয়েস হয়ে যাবার পর বাবা-মা ওমির বিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

মাঝে মাঝেই লোকজন আসে, ওমিকে সেজেগুজে তাদের সামনে দাঁড়াতে হয়। আড়াল থেকে ওমি শোনে পণের টাকা, গয়না-শাড়ির দাবিদাওয়া নিয়ে অলোচনা।

ওমি তার মাকে বলেছিল, তোমরা আমার বিয়ে দিও না। শুধু শুধু কেন টাকা খরচ করবে? আমি যেমন আছি তেমনিই থাকবো!

মা ওমিকে প্রায়ই বকাঝকা করতেন বটে, কিন্তু মেয়ের সম্পর্কে কি তাঁর একটুও স্নেহ ছিল না? ওমির বিয়ের জন্যই তিনিই তো পেড়াপীড়ি করছিলেন বেশি।

ওমির কথা শুনে তিনি বলেছিলেন, পোড়ারমুখী, আমরা মরে গেলে তারপর তোর কী হবে? কে তোকে খাওয়াবে পরাবে? দাদাদের সংসারে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে থাকবি? বৌদিরা যদি তোকে একদিন ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেয়! এর মধ্যেই তো তোর বড়বৌদি···

ওমি বলেছিল, তোমরা চিন্তা করো না। আমার যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।

মা বলেছিলেন, কী ব্যবস্থা তুই করবি শুনি? তুই তো কোনো চাকরিবাকরিও পাবি না। লোকের বাড়িতে দাসী-বাঁদীগিরি করবি, চক্রবর্তীদের বাড়ির মেয়ে হয়ে? তাও পারবি না। বিয়ে ছাড়া স্ত্রীলোকের গতি নেই। কোনো রকমে দাঁতে দাঁত চেপে যদি স্বামীর সংসারে টিঁকে থাকতে পারিস, তা হলে একটা জীবন তরে যাবে।

ওমি বলেছিল, মা, ওরা যদি আমাকে মারে?

মা বলেছিলেন, কারা মারবে ?

ওমি বলেছিল, ঐ যে ওরা, যাদের বাড়িতে তোমরা আমার বিয়ে দেবে ? ওরা তোমাদের কাছে বেশি টাকা চাইবে, আমি দেখতে ভালো না বলে আমার ওপর অত্যাচার করবে, আমার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেবে, গলা টিপে ধরে··· ।

ওমির খুব ব্যথা পাবার ভয়। তার ধারণা, শ্বশুরবাড়ি মানেই একটা অত্যাচারের জায়গা। কত সুন্দর সুন্দর চেহারার নতুন বউ পুড়ে মরে, সে তো কোন ছার। তাদের বাড়িতেই তো তার মায়ের সঙ্গে বড় বৌদির এক এক সময় বিশ্রী ঝগড়া হয়, কিন্তু দাদা তার বউয়ের খুব আঁচল ধরা বলেই মা বিশেষ সুবিধে করতে পারে না। ওমির বিয়ে হবে যার সঙ্গে, সে কেন ওমিকে পছন্দ করবে ?

শেষ পর্যন্ত ওমির বিয়ে ঠিক হলো এক জায়গায়। ওমির মতামতের কোনো মূল্যই নেই, জোর করে প্রতিবাদ জানাবার মত দৃঢ়তাও তার নেই।

পাত্রটি বেশ বয়স্ক, আগের পক্ষের দুটি ছেলেমেয়ে আছে। প্রধানত সেই ছেলেমেয়ে দুটিকে দেখাশোনা করার জন্যই তার বাড়িতে একজন স্ত্রীলোক দরকার। মাইনে দিয়ে কোনো মেয়েকে রাখতে গেলে তার অনেক খরচ হয়ে যেত। একজনকে বিয়ে করে আনলে উল্টে বরং সে কিছু জিনিসপত্র পাবে। তাছাড়া দু'হাজার টাকা পণও দাবি করেছে।

মাসের সাতাশ তারিখে ওমির বিয়ে হবার কথা, সেই মাসের দশ তারিখে ওমির বাবার জুট মিলে লক আউট হয়ে গেল। এরপর সংসার চলবে কী করে তার ঠিক নেই, তার মধ্যে আবার ওমির বিয়ের খরচ ? ওমির দাদা ছিট কাপড়ের ব্যবসা ঠিক করেছে, তার রোজগার বেশি না, সে একা সংসার চালাতে পারবে না, তাই সে বিয়ের ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানালো। এখন বিয়ে বন্ধ থাক।

কিন্তু ওমির বাবা জেদী মানুষ। তিনি গোঁ ধরলেন, একবার যখন বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তখন যেমন করেই হোক এ বিয়ে হবেই। তারপর আমাদের যেমন করে হয় চলে যাবে। একবার বিয়ে ভাঙলে আর ও মেয়ের বিয়ের কোনো আশা নেই।

এই নিয়ে শুরু হলো বাড়িতে তুমুল অশান্তি। দাদা-বৌদি

আর অন্য ভাইয়েরা একদিকে, মা-বাবা আরেক দিকে। সব সময় দু'পক্ষের চ্যাঁচামেচি।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওমি তখন জপ করতো, হে ভগবান, আমাকে মেরে ফেলো! আমাকে শেষ করে দাও!

কিন্তু ভগবান নিজের হাতে কারুর গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন না, কারুর গলাও টিপে ধরেন না।

ওমি কিছুতেই নিজে নিজে মরার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। প্রত্যেক দিনই তো কত মানুষ খুন হয়, কেউ এসে তাকে খুন করে যেতে পারে না?

ভাবতে ভাবতে ওমি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর একটা উপায় ঠিক করে ফেললো। তাকে বাড়ির বাইরে বেরুতে হবে। রাস্তায় ঘাটে, কিংবা ফাঁকা মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকলে নিশ্চয়ই একসময় কেউ এসে তাকে শেষ করে দেবে। সেই ভালো। কেউ মারতে এলে ওমি চোখ বুজে থাকবে।

একদিন রাত্তিরে একটা জামা-কাপড়ের পুঁটুলি আর দুশো টাকা নিয়ে ওমি বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। টাকাটা সে চুরি করলো সংসার খরচ থেকে। আগে সে টাকাটা নেবার কথা ভাবেনি। বাড়ি থেকে বেরুবার ঠিক আগের মুহূর্তে তার মনে হলো তার বিয়ের জন্য তো অনেক খরচ হতোই, সে খরচ থেকে সে তাদের পরিবারকে বাঁচিয়ে দিল, মোটে দুশো টাকা সে নিতেই পারে। যদি মরে যেতে পাঁচ-দশ দিন দেরি লাগে, তার মধ্যে ক্ষিদে পাবে। ওমি ক্ষিদের কষ্ট সহ্য করতে পারে না।

জীবনে প্রথম একা একা বাড়ি ছেড়ে রেলস্টেশনে গেল ওমি। সারাজীবনে আর এ বাড়িতে ফিরে আসবে না।

॥ ৩ ॥

রাত আড়াইটের একটা মেল ট্রেন থামে ব্যারাকপুরে। সেটাতে চেপে ওমি চলে এলো কলকাতায়। ভোরবেলা এই শহরে এসে ওমি জিলিপি আর চা কিনে খেল। চব্বিশ বছর বয়েসের মধ্যে এর আগে

সে কখনো কোনো দোকান থেকে শুধু নিজের জন্য কিছু কেনেনি, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে খায়ওনি।

চা খেতে খেতেই তার মনে হয়েছিল, কলকাতায় থাকলে সে ধরা পড়ে যাবে। তার দাদা রোজ কলকাতায় আসে। ব্যারাকপুর থেকে আরও অনেকে আসে, তারা কেউ দেখলেই বাড়িতে খবর দিয়ে দেবে। ওমি দুশো টাকা চুরি করে এনেছে, এজন্য তার দাদা তাকে নিশ্চয়ই খুব পেটাবে।

সে হাওড়ায় চলে এসে উঠে বসলো আর একটা ট্রেনে। সে ট্রেনটা কোথায় যাবে ওমি তা জানে না। জানার কোনো দরকারও নেই। সে টিকিটও কাটেনি। বিনা টিকিটে ধরা পড়লে কী হয়? ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয় কিংবা জেলে রাখে। কোনোটাই মরে যাবার চেয়ে খারাপ নয়। ওমি তো মরে যেতেই রাজী।

কেউ তার কাছে টিকিট চাইলো না।

সেই ট্রেন এসে পেঁছালো গোহাটি। দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় ওমি ভেবেছিল, সে বহুদূরে চলে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে সে মরলে সে খবরও কোনোদিন তার বাবা-মায়ের কাছে পেঁছোবে না। কিন্তু গোহাটি পেঁছে সে একটু নিরাশ হলো। সে অনেক দূর এসেছে বটে, কিন্তু এটা আসাম। ওমি শুনেছিল, আসামে তার এক মামা থাকেন, খুব সম্ভবত গোহাটিতেই। সুতরাং এখানে থাকা চলবে না, এখান থেকেও পালাতে হবে।

ট্রেনের কামরায় এক বৃদ্ধা মহিলা নিজে থেকেই আলাপ করেছিলেন তার সঙ্গে। কামরায় আর কোনো মেয়ে ছিল না, তাই ওমি বসেছিল সেই বৃদ্ধার পাশে। তাঁর বয়েস প্রায় আশির কাছাকাছি, বেশ জাঁদরেল চেহারা, তিনি ওমি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতে চাননি. তিনি নিজের কথা বলতেই ভালোবাসেন। তাঁর সাত ছেলেমেয়ে, এগারোটি নাতি-নাতনী, এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে হলো ওমিকে।

বৃদ্ধার এক নাতনীর বিয়ে হবে আগামী সপ্তাহে, সেই নাতনীর কথা, সে কেমন সুন্দরী, পাত্রপক্ষের কথা, পাত্র কত বড় চাকরি করে, বিয়েতে কত খরচ হবে, কত সোনার গয়না গড়ানো হয়েছে এইসব শুনতে শুনতে ওমির কান্না পাচ্ছিল, তবু সে চোখ শুকনো করে রেখেছিল।

বৃদ্ধা যাচ্ছেন হাইলাকান্দি। সেই জায়গাটা যে কোথায়, সে সম্পর্কে ওমির কোনো ধারণাই নেই। ওমিদের বাড়িতে খবরের কাগজ আসতো না, তাই সে অনেক কিছুই জানে না। কথা প্রসঙ্গে বৃদ্ধাটি বলেছিলেন যে গৌহাটি থেকে ট্রেন বদল করে তাঁকে আবার অন্য ট্রেন ধরতে হবে। হাইলাকান্দি অনেক দূর।

গৌহাটিতে গিয়ে ওমি সেই মহিলার পিছু পিছু গিয়ে আবার অন্য ট্রেনে উঠে বসলো।

আসামের মামাটিকে ওমি মাত্র দু'তিনবারই দেখেছে। বঙ্কু মামা। লম্বা সিড়িঙ্গে চেহারা, বেশ রাগী রাগী স্বভাব, ওমির বাবাকে তিনি ধমকে ধমকে কথা বলতেন। আসামে তিনি পুলিশে কাজ করেন। ওমির ধারণা হয়েছিল, সেই বঙ্কু মামার চোখে পড়ে গেলে তিনি নিশ্চয়ই তাকে আবার জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

গৌহাটি থেকে ওমি যে ট্রেনে উঠেছিল, সেটা ছোট ট্রেন। পাহাড়ের গা দিয়ে ঝিকঝিক করতে যায়। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। সে সব দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হবার চোখ ছিল না ওমির, সে প্রকৃতিকে ভালোবাসতে শেখেনি।

যে কোনো মানুষকেই ভালোবাসতে পারলো না, সে আর এই পৃথিবীকে কী করে ভালোবাসবে?

ছোট ট্রেনটায় অবশ্য ওমি সেই বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে এক কামরায় ওঠেনি। এবারের কামরাটায় আর একটিও মেয়ে নেই, শুধু নানা ধরনের পুরুষ। তাদের অনেক রকম ভাষা। ওমি এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল সর্বক্ষণ।

বেশ কয়েক ঘন্টা চলার পর ট্রেনটা হঠাৎ থেমে গেল মাঝপথে। কামরার কিছু লোক নীচে নেমে হৈ-চৈ করতে লাগলো। একটু পরে ওমি তাদের কথা শুনে বুঝলো যে একটু দূরে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে এক পাল হাতি ঢুকে বসে আছে, সেইজন্য ট্রেন আর এগোতে পারছে না।

আসার পথে এরকম বেশ কয়েকটা টানেলের মধ্য দিয়ে এসেছে ট্রেনটা। টানেলে ঢুকলেই সব একেবারে ঘুরঘুট্টে অন্ধকার হয়ে যায়। গা ছমছম করে।

সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে হাতি না তাড়ালে আর ট্রেন চলবে না। কে হাতিদের তাড়াবে? ট্রেনের ইঞ্জিন হুইশ্‌ল দিচ্ছে জোরে জোরে। তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। যাত্রীরা চিৎকার করছে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওমি দেখতে পেল দু'জন পুলিশকে। অমনি তার বুক কেঁপে উঠলো ভয়ে। পুলিশ! তার বঙ্কুমামাও পুলিশ! বঙ্কুমামা ওমিকে ধরলেই জেনে যাবেন যে ওমি বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে পালিয়েছে।

ওমির ধারণা, প্রত্যেক পুলিশই অন্য পুলিশদের চেনে। এই পুলিশ দু'জনের চেহারা অন্যরকম হলেও এরা নিশ্চয়ই ওমিকে ধরে নিয়ে যাবে বঙ্কুমামার কাছে।

আর কিছু চিন্তা না করে ওমি ট্রেনের উল্টো দিকের দরজা দিয়ে নেমে গেল। লাইনের পাশেই জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঢুকে পড়ে ছুটতে লাগলো সে।

সেই জঙ্গল এত ঘন যে দুপুরবেলাও তার মধ্যে আবছা অন্ধকার। জঙ্গলে হাতি আছে। হাতির পালের সামনে পড়লে নির্ঘাৎ মরণ। ওমি তো মরতেই এসেছে। খুব কি ব্যথা লাগবে? হাতিরা শুঁড়ে জড়িয়ে একটা আছাড় মারলেই ওমি শেষ হয়ে যাবে। ব্যথা টেরও পাবে না।

প্রথম রাতটা ওমি খোলা জঙ্গলেই একটা বড় গাছে ঠেস দিয়ে কাটালো। ট্রেন লাইন ছেড়ে সে অনেকটা দূরে, একটা টিলার ওপরে চলে এসেছিল। কেউ তার খোঁজ করেনি। একটা খারাপ চেহারার মেয়ে হারিয়ে গেল কিনা, তাতে কারুর কিছু আসে যায় না।

হাতিরাও আসেনি। অন্য কোনো হিংস্র প্রাণীও তাকে খায়নি। জঙ্গল তাকে আশ্রয় দিল। পরের দিন ওমি ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গিয়েছিল গম্বুজ-ঘরটা। সে মৃত্যুর জন্য পুরোপুরি তৈরি, তবু এই জঙ্গল যেন ফিসফিস করে তাকে জানালো, মরার জন্য এত ব্যস্ত হবার কী আছে, যে-কটা দিন বাঁচতে পারা যায়, বেঁচে থাকো না, তাতে ক্ষতি কি?

॥ ৪ ॥

মানুষের ছদ্মবেশে মৃত্যুকে দেখতে পেয়েছিল ওমি দিন সাতেক বাদে।

দুপুরবেলা সে ঘুমিয়ে ছিল একটা শিমুল গাছের তলায়। নরম রোদ্দুর বেশ আরাম দিচ্ছিল তার শরীরে। হাওয়া খেলা করছিল তার চুলে। হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দে সে চমকে জেগে উঠলো।

রাজা দুষ্মন্ত একটা হরিণকে তাড়া করতে করতে এসে পৌঁছেছিলেন তপোবন আশ্রমে, সেখানে দেখেছিলেন শকুন্তলাকে।

এই জঙ্গলটা তপোবন নয়, ওমির সঙ্গেও শকুন্তলার সামান্যতম মিলও নেই।

মিল শুধু এইটুকুই যে একটা খরগোশকে তাড়া করতে করতে সেই দুপুরে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল একটি পাহাড়ী যুবক, হাতে তার ধারালো টাঙ্গি।

জিন্‌স্ আর গেঞ্জি পরা যুবকটির বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, গলায় একটা লাল রুমাল বাঁধা। ওমিকে দেখে সে ভূত দেখার মতন চমকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, ভুলে গেল খরগোশটার কথা।

বেশ কয়েক মুহূর্তে সে থেমে রইলো এক জায়গায়, ওমি তার দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টিতে। যুবকটির হাতের টাঙ্গিটায় রোদের একটা রশ্মি পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে।

যুবকটি দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করলো ওমিকে।

কেমন যেন কর্কশ তার স্বর, ওমি কিছুই বুঝতে পারলো না।

তারপর যুবকটি তার দিকে এক পা এগোতেই ওমি ধড়ফড় করে উঠে এক ছুট দিল। তার ধারণা হলো, ঐ যুবকটি টাঙ্গির এক কোপে তার গলা কাটবে।

মরার জন্য প্রস্তুত থাকলেও টাঙ্গির কোপে খুব ব্যথা লাগবে, ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে, এক কোপে গলাটা একেবারে কেটে না গেলে বারবার কোপাবে। এই চিন্তাতেই ওমি দৌড়োতে লাগলো প্রাণপণে।

পাহাড়ী যুবকটির গায়ের রঙ কালো নয়, ওমির চোখে বেশ ফর্সাই। ছিপছিপে সুগঠিত শরীর। বেশ সুপুরুষই বলা যায়। এই ধরনের পুরুষরা ওমিকে সবসময়ই ঘৃণাই করে। তা ছাড়া, ওমির একটা ক্ষীণ ধারণা ছিল, পাহাড়ের মানুষ বাইরের লোক দেখলেই মেরে ফেলে।

মৃত্যু ভয়ে নয়, মৃত্যু-যন্ত্রণার ভয়েই ওমি পালাতে চাইছিল, তবু কত দূর আর সে যাবে! একটা খরগোশকে ধরা সহজ নয়, কিন্তু একটি মেয়ে একটি পুরুষের তাড়া খেয়ে বেশিদূর পালাতে পারে না।

একসময় যুবকটি ঝাঁপিয়ে পড়লো ওমির ওপর!

তারপর ওমি যখন ভাবছে টাঙ্গির কোপ পড়বে তার গলায়, সেই সময় যুবকটি দাঁত বসালো তার ছোট্ট স্তনে।

যুবকটির গায়ে দারুণ শক্তি, বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না ওমির। শেষের দিকে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। অজ্ঞান হবার আগের মুহূর্তে ওমি ভেবেছিল, এটাই মৃত্যু।

তবু ওমি মরলো না। এমনই তার কড়া জান। এই পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের কানাকড়ি মূল্য নেই, তবু এ পৃথিবী যেন ছাড়তে চাইছে না তাকে।

যুবকটি আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল ওমির শরীর, এই কটা দিন প্রায় অনাহারে সে দুর্বলও হয়ে পড়েছিল খুব, তাই ওমির জ্ঞান ফেরেনি অনেকক্ষণ। সে পড়েই রইলো এক জায়গায়। তারপর এক পশলা বৃষ্টি এসে তাকে জাগিয়ে ছিল।

ওমির সর্বাঙ্গ ব্যথা, তবু সে বুঝলো যে সে মরে যায়নি। যুকটি তাকে খুন করতে চায়নি, তাকে ভোগ করে চলে গেছে। এটা উপলব্ধি করতেই ওমির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো। তার মতন একটা মেয়েকেও কোনো পুরুষ ভোগের যোগ্য ভাবতে পারে? এর আগে তো কেউ তার দিকে ফিরেও চায়নি। সে তো শাকচুন্নী, সে পেত্নী, সে কালো, রোগা, হাড়-জিরজিরে।

পুরুষ ও মেয়েদের শরীরের মিলনকে ওমি জানতো 'অসভ্য ব্যাপার' বলে। তাদের পাড়ার কোনো কোনো ছেলে মেয়ে ঐসব অসভ্য ব্যাপার করতো, একদিন একটা ছাদে সে ঐরকম একটা

দৃশ্যও দেখে ফেলেছিল। একমাত্র বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই এই ব্যাপারটা আর 'অসভ্য' থাকে না। ওমির জীবনে এই অভিজ্ঞতার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

সারা শরীর খুব ব্যথা হলেও তার সঙ্গে মিশে ছিল অপূর্ব এক ভালো-লাগা। 'অসভ্য ব্যাপারটা' তা হলে এই রকম?

পাহাড়ী যুবকটি তাকে ফেলে পালালেও ফিরে এলো আবার দু'দিন বাদে। আজ তার টাঙ্গিটা কোমরে গোঁজা, হাতে একটা ঠোঙা।

আজ সে এসেই ওমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো না। একটু দূরে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো। তার মুখে একটা লজ্জা লজ্জা ভাব।

ওমি বেশ কিছুক্ষণ দেখতেই পায়নি ওকে। সে আপন মনে কথা বলছিল বড় গাছটির সঙ্গে। সারাদিন একটাও কথা না বললে তার পাগল পাগল লাগে।

হঠাৎ শুকনো পাতার আওয়াজ হতে ওমি ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেল পাহাড়ী যুবকটিকে। আজ আর ওমি ছুটে পালাতে চাইলো না, যুবকটিও তেড়ে এলো না, পরস্পরের দৃষ্টি মিলে রইলো বেশ কয়েক পলক।

ওমির শরীরের ব্যথা কমে গেছে। তার সারা শরীর যেন বলছে, ঐ ছেলেটি এসে আর একবার তার সঙ্গে অসভ্যতা করুক। ওমির কান দুটো গরম হয়ে উঠছে লজ্জায়।

যুবকটি এবার খানিকটা কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করলো, তুম কৌন হো? কাঁহা সে আয়া?

ওমি কোনো উত্তর দিল না। সে হিন্দী একটু একটু বোঝে, তাদের পাড়ায় অনেক অনেক অবাঙালী শ্রমিক পরিবার ছিল। তবু ওমি উত্তর দিল না, কারণ তার পূর্ব পরিচয়টা মুছে গেছে।

যুবকটি আর একটু এগিয়ে এসে বললো, তুম বাংগালী? তুমি আমার উপর রাগ করেছো?

ওমি এবারও কোনো উত্তর দিল না। তার আবার রাগ করার ক্ষমতা আছে নাকি? এই নির্জন জঙ্গলে ঐ শক্তসমর্থ পুরুষটি ইচ্ছে

করলেই টাঙ্গির এক কোপে তার গলা কেটে ফেলতে পারে, ওর ওপর ওমি রাগ করলো কি করলো না, তাতে কী আসে যায় ?

যুবকটি ওমির পিঠে হাত রাখলো।

ওমি সরে গেল না। তার সারা শরীরে একটা শিহরন হলো। একটা তীব্র ভালো-লাগার বোধ। ঐ স্পর্শের একটা ভাষা আছে। এমনভাবে কেউ তাকে আগে কখনো স্পর্শ করেনি।

ওমি জানে, বিয়ের আগে এই সব অসভ্যতা করা অন্যায়। যারা করে, তাদের খুব নিন্দে হয়। মা-বাবারা বকে, মারে। কিন্তু ওমি তো এখানে মরতেই এসেছে। এমনি এমনি মরে যাওয়ার চেয়ে তো বড় অন্যায় কিছু হতে পারে না। তা হলে অসভ্যতা করলেই বা ক্ষতি কী ? কেউ এখানে তাকে নিন্দে কিংবা বকুনি দিতেও আসবে না।

মৃত্যুর আগে যেটুকু ভালো-লাগা পাওয়া যায়, তার দামই তো অনেক।

টাঙ্গির বদলে হাতে একটা ঠোঙা নিয়ে এসেছে যুবকটি, তার মধ্যে কয়েকটা কমলালেবু।

ওমির চোখে জল এসে গেল। এ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু উপহার দেয়নি। তাদের পাড়ার মেয়েরা মাঝে মাঝে লজেন্স খেত। মিতা একদিন একটা মস্ত বড় চকলেট সবাইকে দেখিয়ে একটু একটু করে কুটকুট করে খাচ্ছিলো, তাকে দু'তিনজন জিজ্ঞেস করেছিল, এই এটা কোথায় পেলি রে ? দু'চোখে ঝিলিক দিয়ে অদ্ভুত একটা মুখভঙ্গি করে মিতা বলেছিল, আমাকে একজন দিয়েছে ! মিতার গায়ের রং ফর্সা, গাল দুটো ফুলো ফুলো, তাকে দেখলেই মামা-কাকার বয়েসী পুরুষরা জড়িয়ে ধরে আদর করে।

ওমি কবে যে কমলালেবু খেয়েছে, তা মনেই পড়ে না। তাদের বাড়িতে কমলালেবু আসে না। পাড়ায় সরস্বতী পুজোর প্রসাদের মধ্যে দু'এক কোয়া কমলালেবু থাকে।

যুবকটি ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললো, লেবু খাবে ?

তা হলে পাহাড়ের তই ফর্সা যুবকটি তাকে কালো বলে ঘেন্না করছে না ? সে তাকে মেরে ফেলতেও চায় না ?

এর পর থেকে যুবকটি মাঝে মাঝেই দুপুরের দিকে আসতে লাগলো ওমির কাছে।

সে ওমিকে আদর করে, শরীরটা নিয়ে খেলা করে, গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকে ওমির পাশাপাশি। হঠাৎ একসময় চলে যায়। সে কথা বলে খুব কম। প্রথম বেশ কিছুদিন ওমি তার নামটাও জানতে পারেনি।

একদিন সে নিজেই বললো, আমার নাম গুরুং। তোমার নাম কী?

গুরুং থাকে হাফলং বাজারের পেছনের বস্তিতে! সে যে বিশেষ কিছু কাজ করে না, তা বোঝাই যায়। কাজের লোক হলে সে সারা দুপুর জঙ্গলে এসে ওমির কাছে শুয়ে থাকবে কী করে? কিন্তু সে কাঠুরেও নয়, মাঝে মাঝে সে তার টাঙ্গিটা নিয়ে আসে বটে, কিন্তু তার প্যান্ট ও শার্ট বেশ পরিচ্ছন্ন, গরিব কাঠুরেদের মতন নয়। সে বিড়ি খায় না, সিগারেট টানে।

প্রত্যেকবারই সে নিজে সিগারেট ধরাবার সময় ওমির দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, খাবে?

ওমি দু'দিকে মাথা নাড়ে। একজন কেউ বিনা পয়সায় পেলেও সিগারেট খেতে চায় না দেখে গুরুং অবাক হয়ে যায়।

মেয়েরা সিগারেট খাবে, এটা ওমির কাছে অকল্পনীয়। একমাত্র একবার একটা হিন্দী সিনেমাতেই শুধু একটা মেয়েকে লম্বা সিগারেট টানতে দেখেছিল। কিন্তু হিন্দী সিনেমার ঐ সব নায়িকারা তো বহু দূর জগতের মানুষ! সাহেব-মেমদের মতনই!

একদিন অবশ্য ওমির মনে হলো একটা সিগারেট টেনে দেখলেই বা ক্ষতি কী? জীবনে আগে কক্ষণো যা করেনি, সেই রকম অনেক কিছুই সে করছে এখন। সে কি কখনো অচেনা অজানা দেশে একটা জঙ্গলের মধ্যে থাকার কথা স্বপ্নেও ভেবেছিল? বিয়ে না করেই একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে বর-বউয়ের মতন ঐ অসভ্য ব্যাপার করার কথা কখনো সম্ভব বলে জানতো? যেন তার মৃত্যু হয়ে গেছে, সে এখন অন্য ওমি, এখন সে যা খুশী করতে পারে, কিছুতেই কোনো দোষ নেই।

ওমি ঘাড় নেড়ে যেই বললো যে সে সিগারেট খাবে, অমনি হেসে উঠলো গুরুং। ফটাস করে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিল সিগারেট। ওমিকে দেখিয়ে দিল, এই ভাবে টানো!

এক টান দিতেই কেশে উঠলো ওমি। সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে যেন অজস্র সূচ বিঁধে গেল তার গলায়। ভয়ের চোটে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাশতে কাশতে নুয়ে পড়লো ওমি। আর গুরুং হেসে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

তারপর আর দ্বিতীয়বার সিগারেট টানার ইচ্ছে হয়নি কখনো ওমির।

সেই সময়টায় গম্বুজ-ঘরটায় আস্তে আস্তে একটা ছোট সংসার গড়ে উঠেছিল ওমির।

গুরুং মাঝে মাঝেই নানা রকম জিনিস নিয়ে আসে। সে কম কথা বললেও ঠিক বোঝে ওমির কী কী দরকার। একদিন সে নিয়ে এলো হাঁড়ি, একদিন প্রায় পাঁচ কিলো আলু, একদিন একটা আয়না আর চিরুনি। চাল আর ডাল নিয়ে আসে প্রায়ই।

একদিন ওমি খিচুড়ি রান্না করেছিল, তা খেয়ে গুরুং একেবারে মুগ্ধ। সে যেন জীবনে কখনো খিচুড়ি খায় নি। এক হাঁড়ি খিচুড়ির প্রায় সবটাই খেয়ে নিল সে একা, ওমির জন্য আর প্রায় কিছুই রইলো না। তাতে লজ্জা পেয়ে সে বললো, আবার খিচুড়ি রান্না করো!

দ্বিতীয়বার রান্না হতে তার থেকেও সে আবার খেল খানিকটা। এরপর থেকে সে প্রায়ই খিচুড়ি রান্না করতে বলে ওমিকে।

গুরুং অবশ্য রোজ আসে না। কখনো পরপর তিন-চার দিন আসে, আবার দু'তিন দিন তার পাত্তাই পাওয়া যায় না। ওমি কিছু জিজ্ঞেস করলে সে শুধু ঠোঁট ওল্টায়।

গুরুং দু'তিন দিন না এলে ওমির সময়ই কাটতে চায় না। তার মন খারাপ হয়ে থাকে, তার বুক ব্যথা করে। একজন পুরুষ তার কাছে নিজের থেকেই আসে, তাকে আদর করে, তাকে অনেক জিনিস দেয়। এতখানি সৌভাগ্য যে তার আসবে কোনোদিন তা কি সে জানতো? এ যেন তার প্রতি মৃত্যুর উপহার।

গুরুং না এলে ওমি শুকনো পাতার ওপর কোনো আওয়াজ পেলেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। কখনো একটু দূরে গাছের ডালপালার শব্দ হলে সে ছুটে যায়। কখনো মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে সে একলা কাঁদে।

গুরুং একটা ছোট আয়না এনে দিয়েছে, তাতে মুখ দেখা যায়। ঝর্ণার জলে সে দেখতে পায় নিজের ছায়া। এক একদিন সে চমকে উঠে। সে যেন নিজেকেই চিনতে পারে না। তার গাল ছিল চোপসানো, এখন ভরাট হয়ে গেছে। হাতে-পায়ে এসেছে গোল গোল ভাব। স্নান করার সময় নিজের বুকে হাত দিয়ে অদ্ভুত একটা আনন্দে তার মন ভরে যায়। সমবয়েসী মেয়েদের তুলনায় তার স্তন দুটি খুব ছোট ছিল, অন্য মেয়েরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো, এখন তার স্তন দুটি নতুন কাকিমার মতন।

নিজের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে ওমির মনে হয়, সে যেন অন্য মেয়ে হয়ে গেছে। সে যেন সত্যিই মরে গিয়ে আবার জন্মেছে। সে মরে যাবার জন্য পুরোপুরি তৈরি ছিল, গুরুং এসে তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। গুরুং তাকে ছোঁয়ার পরেই তার শরীরটা সত্যিকারের মেয়েদের মতন হয়েছে। এখন কেউ তাকে পোড়াকাঠ কিংবা শাকচুন্নী বলুক দেখি। তার চামড়াতেও এসেছে একটা চকচকে ভাব।

গুরুং সাধারণত সন্ধের আগেই ফিরে যায়। একদিন সে গেল না। সে রাত্তিরটাও সে কাটালো ওমির সঙ্গে। পরের দিনও তার যাবার কোনো গরজ নেই। অলসভাবে সে শুয়ে থাকে আর সিগারেট টানে। তিন দিন কেটে গেল এইভাবে। তার সিগারেট ফুরিয়ে এলো। এমনকি ওমির কাছে চাল-ডালও ফুরিয়ে গেল। চতুর্থ দিনে রান্না করারও আর কিছু নেই, শুধু রয়েছে কিছু আলু। ওমি সেই আলুগুলোই সেদ্ধ করে খাওয়ালো গুরুংকে, নুন দিয়ে সেই আলুই খেয়ে নিল গুরুং।

তাতেও ওমির কত আনন্দ। রাত্তিরবেলা পাশে শুয়ে আছে একজন পুরুষ তার ফলে রাত্তিরটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে একা একা থাকা আর একজন বন্ধুর সঙ্গে থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ। বাড়ি ছেড়ে যখন ওমি মরতে বেরিয়েছিল, তখন সে ভেবেছিল, এই অভিজ্ঞতাটা তার জীবনে হবে না।

এটাই কি বিয়ে হওয়া? বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীরা এরকম আনন্দে থাকে? গুরুং-এর সঙ্গে তার মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয়নি বটে, কিন্তু সম্পর্কটা তো প্রায় সে রকমই। সে গুরুং-এর জন্য রান্না করে

দেয়, গুরুং-এর জামা-প্যাণ্ট কাচে, ঝর্ণার জলে গুরুং উলঙ্গ হয়ে স্নান করে, ওমি তখন একটি সম্পূর্ণ সুন্দর পুরুষ শরীর প্রাণভরে দেখে। সে নিজে থেকে গুরুংকে আদর করতে লজ্জা পায়, বটে, কিন্তু আদরের ব্যাপারে গুরুং-এর একটুও কৃপণতা নেই।

গুরুং-এর নিশ্চয়ই কোথাও একটা বাড়ি আছে, কিন্তু সেখানে সে ওমিকে নিয়ে যায় না কেন? এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে ওমির মনে জাগে, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। এক হিসেবে সেখানে না যাওয়াই ভালো। গুরুং তাকে পছন্দ করে বটে, কিন্তু গুরুং-এর বাড়িতে তার আত্মীয়স্বজনরাও কি ওমিকে পছন্দ করবে? কালো বলে যদি অবজ্ঞা করে? কোথাকার কে একটা মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে বলে যদি লাথি-ঝ্যাঁটা মারে? দরকার নেই আর সে সব ঝঞ্চাটের মধ্যে যাওয়ার। এই জঙ্গলই ওমির ভালো।

সেই রকম এক রাত্তিরে ওমি জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি রাত্তিরে বাড়ি না ফিরলে তোমার জন্যে বাড়ির লোকজন চিন্তা করবে না?

গুরুং অতি সংক্ষেপে উত্তর দেয়, আঁ হা।

আর একটু সাহসে ভর করে ওমি জিজ্ঞেস করে, তোমার মা-বাবা আছেন?

গুরুং বললো, বাবা নেই আছে, মা আছে।

—ভাই-বোন আছে?

—আছে চার-পাঁচজন?

ওমি বেশ অবাক হয়। চার-পাঁচজন মানে কী? ঠিক ক'জন ভাই-বোন, তা গুরুং জানে না?

—তোমাদের বাড়িতে আর কেউ আছে?

—আছে, আরও মানুষ আছে।

একটুক্ষণ থেমে থেকে, আরও খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে ওমি জিজ্ঞেস করলো, তোমার বউ আছে?

উল্টো দিকে মুখ করে শুয়েছিল গুরুং, এবার পাশ ফিরে ওমির চোখে চোখ রেখে বললো, হাঁ, আছে।

ওমির বুক কাঁপতে লাগলো, তার চোখে জল এসে গেল।

যদিও সে আগেই ধরে নিয়েছিল, গুরুং-এর মতন একজন সুপুরুষ জোয়ানের বউ থাকাই তো স্বাভাবিক। যে-কোনো মেয়েই

এমন স্বামী পেলে বর্তে যাবে। কিন্তু গুরুং একসঙ্গে তিন-চার রাত থেকে যাওয়ায় তার ক্ষীণ ধারণা হয়েছিল, তবে বোধহয় সে বিবাহিত নয়।

তা হলে কি তার বউ কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি গেছে ? সেইজন্যই গুরুং এখানে রাত কাটাচ্ছে ?

গুরুং-এর বাড়িতে বউ আছে, তবু গুরুং এই জঙ্গলে এসে ওমিকে আদর করে। বউয়ের সঙ্গে ওর ঝগড়া, কিংবা বউকে ওর পছন্দ নয় ? গুরুং-এর বউ যদি কখনো টের পায় যে তার স্বামীর ওপর অন্য একটা মেয়ে ভাগ বসিয়েছে ? গুরুং-এর পিছু পিছু একদিন এসে পড়ে ওমিকে দেখতে পেলে সে কী করবে ?

এইসব ভেবে ভেবে ওমি আর কূল-কিনারা পায় না।

গুরুং-এর বউ আছে শোনার পর থেকে বারবার তার চোখ জলে ভরে আসে। একটা অন্যায়বোধ তাকে পেয়ে বসে, সে যেন অন্য একটি মেয়েকে ঠকাচ্ছে !

গুরুং তো মিথ্যে করেও বলতে পারতো যে তার বউ নেই ! ওমি কি কোনোদিন ওর বাড়িতে গিয়ে দেখতো ? পাহাড়ের মানুষ বোধহয় মিথ্যে কথা বলতে জানে না।

এরপর গুরুং তাকে আবার জড়িয়ে ধরে আদর করতেই ওমির কান্না থেমে গেল। গুরুং তার বুকে হাত রাখলেই তার সমস্ত শরীর ঝনঝন করে। এক অপূর্ব মাদকতায় সে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তার তো মরে যাবারই কথা ছিল, গুরুং এখানে তাকে খুন করে রেখে যেতে পারতো, প্রথম দিন দেখার পর ওমির সেই রকমই মনে হয়েছিল। মৃত্যুর বদলে সে যে আনন্দ পাচ্ছে, তাই-ই তো যথেষ্ট !

॥ ৫ ॥

একবার গুরুং এলো মাঝরাত্তিরে। ওমি তখন ঘুমিয়েছিল গম্বুজ-ঘরে। সন্ধে থেকেই টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তাই বাইরে থাকা যায় না। বৃষ্টির সময় জঙ্গলে একটা সাঁ সাঁ শব্দ হয়, আর কিছু শোনা যায় না, তাই ওমি গুরুং-এর পায়ের শব্দ পায়নি।

গুরুং-এর মুখে ভকভকে মদের গন্ধ, তার পা টলছে, হাতে একটা

টর্চ। সে এসেই ওমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আদর করতে লাগলো। ঠিক প্রথম দিনের মতন। যেন ওমিকে সে নতুন দেখছে।

সেই ব্যাপারটা হয়ে যাবার পর সে বললো, আমি ঘুমোচ্ছি। তুমি ঘুমাবে না। জেগে থাকো। যদি কোনো আদমি এদিকে এসে পড়ে আমাকে ডাকবে!

ওমি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করলে, কে আসবে?

গুরুং বললো, যে কোনো আদমি আসুক।

তারপরই সে উপুড় হয়ে ভোঁস ভোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো!

গুরুং-এর হুকুম অগ্রাহ্য করতে পারে না ওমি। সে বসে রইলো গম্বুজের দরজার কাছে। বৃষ্টির মধ্যে কেউ খুব কাছে আসার আগে টের পাওয়া যাবে না। ভয়ের চোটে ওমির শীত করতে লাগলো। এতদিনের মধ্যে এখানে আর একটাও মানুষ আসেনি, আজ হঠাৎ রাতে কে আসবে? গুরুং-এর বউও নয়, কারণ ও বললো আদমি। কেউ ওকে তাড়া করে আসবে?

খর চোখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে রইলো ওমি।

আস্তে আস্তে ভোরের আলো ফুটলো, কিন্তু কেউ এলো না। বৃষ্টিও থেমে গেছে, ডানা ঝাপটে জল ঝেড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে আসছে পাখিরা। একটা বনমোরগ ডাকতে লাগলো অবিশ্রান্তভাবে।

গুরুং জেগে উঠেই বললো, ভুখ লেগেছে। খিচুড়ি বানাও!

ঝর্ণার জলে চোখ মুখ ধুয়ে এসে রাঁধতে বসলো ওমি! গুরুং-এর একটা বউ থাকলে কী হয়, সে তো ওমিরও স্বামীরই মতন। তার পাশে এসে ঘুমোয়, তাকে রান্না করে দিতে বলে। গুরুং তার জন্য আয়না-চিরুনি কিনে এনেছে, শীতের সময় একটা কম্বলও এনে দিয়েছে।

ওমি রান্না করছে, তার পাশে বসে গুরুং একটা রিভলভার নিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলো।

সেটা দেখে চমকে উঠলো ওমি। গুরুং-এর কাছে ঐ অস্ত্র সে আগে কখনো দেখেনি। জিনিসটা চিনতে পেরেও ওমি জিজ্ঞেস করলো, ওটা কী?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রিভলভারের নলে ফুঁ দিতে দিতে গুরুং জিজ্ঞেস করলো, তুমি বাঙ্গালী, তোমার ঘর কোথায়? শিলচর?

গুরুং এই সব প্রশ্ন আগে কখনো করেনি। ওমি শিলচর নামে নামে কোনো জায়গায় নামই শোনেনি কখনো।

গুরুং আবার বললো, তুমি ঘর ছেড়ে এসেছো কেন? আমি শিলচর চিনি. তোমাকে তোমার ঘরে পেঁাছে দিতে পারি। যাবে?

ওমি প্রবলভাবে দু'দিকে মাথা নাড়লো।

গুরুং অবাক হয়ে বললো, যাবে না? এই জঙ্গলেই থাকবে?

ওমি বললো, হ্যাঁ।

—কেন?

—এই জঙ্গল আমার ভালো লাগে।

—আমি যখন থাকি না, তোমার ভয় করে না?

—না।

—আমি যদি কোনোদিন না আসি আর?

—তা হলে আমি মরে যাবো!

গুরুং হা হা করে হেসে উঠলো, মৃত্যুটা যেন সত্যিই খুব হাসির ব্যাপার।

তারপর সে কোটের পকেট থেকে এক গোছা দশ টাকার নোট বার করে ওমির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, এগুলো তুমি রাখো!

ওমি বললো, আমি টাকা নিয়ে কী করবো?

—তোমার কাছে লুকিয়ে রাখো। আমার দরকার পড়লে আমি নিয়ে নেবো ফের!

গম্বুজের মধ্যে বৃষ্টির জল পড়ে। এই সব টাকা ভিজে নষ্ট হয়ে যায় যদি?

—কাপড়ে মুড়ে রাখো। এরপর যেদিন আসবো, তোমার জন্য একটা বাক্স কিনে আনবো। তোর আর কিছু চাই? একটা শাড়ি লাগবে, না;

খিচুড়ি রান্না সবে মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় হঠাৎ বাইরে শোনা গেল একটা কুকুরের ডাক।

গুরুং তড়াক করে উঠে মুখ বাড়ালো বাইরে।

কুকুরের ডাক খুব কাছে এসে পড়েছে, তার পেছনেই মানুষের পায়ের আওয়াজ।

গুরুং-এর মুখখানা বদলে গেছে, হঠাৎ সাংঘাতিক হিংস্র দেখাচ্ছে তাকে। সে চাপা গলায় ওমিকে বললো, তুমি পেছনের ঝোপে গিয়ে লুকোও, তোমাকে যেন কেউ দেখতে না পায়। আমি এখন যাচ্ছি।

গুরুং একটা দৌড় দিল পাহাড়ের ওপরের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর তেড়ে গেল তাকে।

ওমি গম্বুজ ঘর থেকে বেরিয়ে পেছনের ঝোপের মধ্যে শুয়ে পড়লো। সেই অবস্থায় সে দেখলো, দু'জন লোক, প্রায় গুরুং-এর মতনই চেহারা, ছুটছে গুরুং-এর দিকে। তাদের একজনের হাতে একটা কুকরি, আর একজনের হাতে রিভলবার।

কুকুরটা ছুটতে ছুটতেও একবার ফিরে এসে গম্বুজ-ঘরটার কাছে এসে গন্ধ শুঁকতে লাগলো।

ওমির সমস্ত শরীরটা কুঁকড়ে গেছে। কুকুরটা যদি তার দিকে আসে? ওমি কুকুরদের সাংঘাতিক ভয় পায়। কুকুরটা এসে নির্ঘাৎ তাকে ছিঁড়ে খাবে। কোনোক্রমে আত্মরক্ষার জন্য ওমি হাতে তুলে নিল এক খণ্ড পাথর।

কুকুরটা কিন্তু তার দিকে এলো না! ঘরে ঢুকে খিচুড়িতেও মুখ দিল না। প্রবলভাবে ডাকতে ডাকতে সে আবার ছুটে গেল সামনের দিকে।

একটু বাদেই সেই মানুষ দুটো ও কুকুরের ডাক মিলিয়ে গেল অনেক দূরে।

তারপর সারাদিন আর কোনো শব্দ নেই!

গুরুং মুখের গ্রাস ফেলে চলে গেছে, তার খিদে পেয়েছিল, কিন্তু একটু খিচুড়িও খেতে পারেনি, সেই দুঃখে ওমি কাঁদলো অনেকক্ষণ ধরে। সে নিজেও কিছু খেল না।

ব্যাপারটা যে কী ঘটলো, সেটাই বুঝতে পারলো না ওমি। ঐ লোক দুটো কারা? ওদের দেখে অত ভয় পেল কেন গুরুং? ওরা কি পুলিশ?

ওমির ধারণা, পুলিশরা থাকি পোশাক পরে, ঐ লোক দুটোর

পোশাক সেরকম নয়? পুলিশ হলেই বা তাদের এত ভয় পাবে কেন গুরুং? সে কি চোর, না ডাকাত? না, না, গুরুংকে তো কখনো সে রকম মনে হয়নি। অবশ্য পুলিশরা নিরীহ মানুষদের ওপরেও যে অনেক সময় অত্যাচার করে, সে কথা ওমি শুনেছে। তার বাবার একজন বন্ধু কারখানায় হরতালের সময় খুব স্লোগান দিত, একবার পুলিশের লোক পিটিয়ে তার হাত ভেঙে দিয়েছিল।

সারাদিনটা অসহ্য কষ্টে কাটলো ওমির। বারবার মনে পড়তে লাগলো গুরুং-এর একটা কথা। আমি যদি আর কোনোদিন ফিরে না আসি? কেন এই কথা বললো? আগে কোনোদিন সে ওমিকে জঙ্গল থেকে শহরে চলে যাবার কথাও উচ্চারণ করেনি।

গুরুং কি তাহলে আর ফিরবে না? তা হলে এবার সত্যিই ওমি মরবে। যেমন করেই হোক সে মরবে।

গুরুং কিন্তু ফিরে এলো সন্ধের পর। একটু আগে জঙ্গলে অন্ধকার নেমেছে। থেমে গেছে সব পাখির ডাক। গুম গুম করে মেঘ ডাকছে মাঝে মাঝে। টর্চ জ্বেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে গম্বুজ-ঘরে ঢুকলো গুরুং।

তার ডান পায়ে একটা গভীর ক্ষত। প্যান্টে রক্ত শুকিয়ে গেছে। সে এসে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে।

ওমি আঁতকে উঠতেই গুরুং ফিসফিস করে বললো, চুপ! শালা লোগ আমায় ধরতে পারেনি। আমি একটা খাদের মধ্যে শুয়েছিলাম। আমার কিছু হয়নি।

ওমি প্রথমে তার চোখের জলের ফোঁটা ফেললো গুরুং-এর রক্তাক্ত শরীরে।

তারপর সে ঝর্ণা থেকে জল এনে গুরুং-এর ক্ষত ধুয়ে দিল। শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে বেঁধে দিল তার পা।

গুরুং জিজ্ঞেস করলো, খিচুড়ি সব শেষ হয়ে গেছে?

ওমি খিচুড়ি ছোঁয়নি পর্যন্ত, হাঁড়িতেই পড়ে আছে সকাল থেকে। এবার একটুখানি আঙুলে তুলে সে চেখে দেখলো।

বৃষ্টির দিনে বেশ ঠান্ডা পড়ে যায় তাই খিচুড়ি পচেনি একটুও। অনায়াসে খাওয়া যায়। গুরুং সেই খিচুড়ি গরম করারও সময় দিল না। বুভুক্ষুর মতন খেতে লাগলো হাঁড়ি থেকে তুলে তুলে।

পেট ভর্তি হবার পরেও তার শরীরের ক্ষুধা গেল না। সে ওমিকে টেনে নিল বুকে।

ওমি জিজ্ঞেস করলো, ঐ লোক দুটো কারা? তোমাকে ধরতে এসেছিল কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় নেই গুরুং-এর। সে ওমির মুখে হাত চাপা দিল। গুরুং-এর হাতখানা অসম্ভব গরম। তার হু হু করে জ্বর এসে যাচ্ছে।

একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়লো গুরুং।

ওমি আর এক টুকরো ন্যাকড়া ছিঁড়ে ভিজিয়ে জলপট্টি দিল গুরুং-এর কপালে। গুরুং-এর নিশ্বাসে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে কাতর শব্দ করছে সে। জ্বর খুবই বেড়েছে।

জ্বরের সময় কপালে জলপট্টি দেবার কথাই শুধু জানে ওমি। এখানে আর কি ওষুধ পাওয়া যাবে? তার বাবার জ্বর হলে সে দেখেছে তার মা পাখা দিয়ে মাথায় হাওয়া করে। কিন্তু এখানে শীত আছে, হাওয়া করার দরকার নেই বোধহয়। নিজের কম্বলটা গুরুং-এর গায়ে দিয়ে ওমি বসে রইলো। সে ঠিক করলো, সে সারারাত জেগে থেকে গুরুং-এর সেবা করবে।

কিন্তু ওমি সারাদিন ধরে কেঁদেছে। কিছু খায়নি। এখনও তার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। আজ তাকে প্রবলভাবে আদর করেছে, তার স্তনে গুরুং প্রায় দাঁত বসিয়ে দিয়েছে। শরীর প্রায় অবশ হয়ে এসেছে ওমির। কান্নারও একটা ক্লান্তি আছে।

ঘুমে তার চোখ টেনে আসতে লাগলো, কখন যে সে শুয়ে পড়লো তা যেন সে নিজেই জানে না।

সকালের দিকে এত জোর বৃষ্টি নামলো যে বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগতে লাগলো ওমির গায়ে। তাতেই তার ঘুম ভাঙলো।

ধড়মড় করে উঠে বসেই সে দেখলো, পাশে গুরুং নেই!

এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে গেল কেন গুরুং? বাথরুম সারতে একটু দেরি করতে পারতো না?

ওমি বাইরে উঁকি মারলো। কাছাকাছি কোথাও সে নেই। ওমি জোরে জোরে দু'বার ডাকলো, গুরুং, গুরুং!

কোনো উত্তর এলো না।

খুব জোরে ডাকতে ওমির ভয় করে। গুরুং-এর সঙ্গে থাকতে থাকতে তার আস্তে কথা বলা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। গুরুং একেই তো কম কথা বলে, যে-টুকু বলে তাও দাঁতে চেপে চেপে। জঙ্গলে নির্জনতার মধ্যে চিৎকার চ্যাঁচামেচি যেন মানায় না।

অসুস্থ শরীর নিয়ে কোথায় গেল গুরুং? সারা সকাল ধরে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। গুরুং-এর আর দেখা নেই।

সকাল গড়িয়ে দুপুর এলো, তারপর সন্ধে। বনের মধ্যে বিকেলটা ঠিক টের পাওয়া যায় না, দুপুরের পর হঠাৎ অন্ধকার হতে শুরু করে।

ওমি রান্না করলো না, কিছু খেল না। অসুস্থ মানুষটাকে সেবা করারও সুযোগ পেল না সে? কী এমন তাড়া ছিল গুরুং-এর? সে ওমিকে একটা কথাও বলে গেল না?

সন্ধের পর রাত যখন গাঢ় হয়েছে, তখন আবার শোনা গেল কুকুরের ডাক।

সেই ডাক শুনেই ওমির বুক কাঁপতে লাগলো। কুকুর একা আসে না, কুকুরের সঙ্গে থাকে মানুষ। সেই লোকদুটো ফিরে আসছে!

ওমি কোথায় পালাবে? অন্ধকারের মধ্যে এত লুকোনোর জায়গা, কিন্তু কুকুররা যে অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পায়।

কুকুরটা গম্বুজ-ঘর চিনে গেছে, তাই ওমি সেখান থেকে বেরিয়ে ছুটে গিয়ে ঝর্ণাটার ধারে একটা ঝোপের মধ্যে শুয়ে রইলো মাটিতে গা মিশিয়ে।

কুকুরটা প্রথমে গম্বুজ-ঘরের মুখটায় এসে ডাকতে লাগলো খুব জোরে। সেই ঘেউ ঘেউ শব্দে যেন সমস্ত পাহাড় কাঁপছে। ওমিরও সারা শরীর কাঁপছে, কুকুরের ডাক শুনলেই তার সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

কুকুরটা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ছুটে তারপর ঠিক চলে এলো ঝোপটার পাশে। ওমি নিশ্বাস বন্ধ করে রইলো। কাছেই দেখা যাচ্ছে টর্চের আলো। একজন মানুষ শিস দিচ্ছে

কুকুরটা ওমির শাড়িটা দাঁতে চেপে টান দিতেই ওমি আর

নিজেকে সামলাতে পারলো না, চেঁচিয়ে উঠলো, বাবারে, মারে, বাঁচাও! বাঁচাও!

লোকদুটো ছুটে এসে টর্চের আলো ফেলে রীতিমতন অবাক হয়ে বললো, জেনানা!

একজন সরিয়ে নিল কুকুরটা, একজন চুলের মুঠি ধরে ওমিকে টেনে তুললো।

ওমি চোখ বুজে আছে, সে ওদের দেখতে চায় না। ওরা তাকে মেরে ফেলুক, কুকুর দিয়ে যেন না খাওয়ায়, একটা গুলি খরচ করলেই তো ওমি শেষ হয়ে যাবে। মরে যেতে তার একটুও আপত্তি নেই!

ওমিকে টানতে টানতে একটা ফাঁকা জায়গায় এনে ফেলে দিল ওরা। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে খুঁজতে লাগলো গুরুংকে। ওদের একজন গম্বুজ-ঘরের মধ্যে ঢুকে তছনছ করতে লাগলো ওমির সামান্য সংসার।

অন্যজন ওমির শরীরে একটা পায়ের খোঁচা দিয়ে হিন্দীতে বললো, তোর মরদ কোথায়?

ওমি কোনো উত্তর দিল না।

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তুই কে? বর্ডার ক্রস করে এসেছিস?

ওমি কোনো কথাই বলবে না ঠিক করেছে। এরা তাকে মেরে ফেলতে দেরি করছে কেন? মনে মনে সে শুধু ভগবানকে ডেকে বলছে, হে ভগবান, এরা যেন বেশি কষ্ট না দেয়, কুকুর দিয়ে না খাওয়ায়, হে ভগবান, এদের বলো, আমাকে তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে!

অন্যজন গম্বুজ-ঘরটা খোঁজাখুঁজি করে এসে বললো, ঘরের মধ্যে মালটা নেই। এই মেয়েছেলেটা নিশ্চয়ই জানে।

সে একটা সিগারেট ধরিয়ে জোরে জোরে দু'বার টান দিয়ে এগিয়ে এলো ওমির কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে ওমির ঘাড়ের কাছে সিগারেটটা একটু ছুঁইয়ে পাহাড়ী হিন্দীতে বললো, যদি প্রাণে চাস, বল মালটা কোথায়?

ওমি তো প্রাণে বাঁচতে চায় না। কিন্তু ওরা কি তাকে একটু

একটু করে পুড়িয়ে মারবে? কোন মালের কথা ওরা জিজ্ঞেস করছে, তা সে কিছুই জানে না।

কথা না বললেও সিগারেটের ছ্যাঁকা লাগা মাত্রই ওমি উঃ উঃ করে চিৎকার করে উঠছে যন্ত্রণায়। সে ব্যথা সহ্য করতে পারে না। মৃত্যুকে তার ভয় নেই, শুধু ব্যথা পাওয়াতেই ভয়।

লোকটি আবার তাকে কী যেন জিজ্ঞেস করলো। ওমি অতখানি হিন্দী কথার মানেই বুঝতে পারলো না।

অন্যজন খুলে ফেললো ওমির শাড়িটা। টর্চের আলো ওমির সারা গায়ে ফেলে বললো, হুঁ, শরীরে মাংস আছে। আমি একে খাবো!

যার হাতে সিগারেট সে হেসে উঠলো হা হা শব্দে। তারপর বললো, তুই একলা খাবি কেন, আমিও খাবো। খাওয়া হয়ে গেলে একে মেরে গাছে লটকে দিয়ে যাবো। গুরুং এসে দেখবে। গুরুং ব্যাটা এই মেয়েটার জন্যই মাঝে মাঝে পালিয়ে আসতো! এর জন্যই আমাদের সঙ্গে বেইমানি করে মালটা সরিয়েছে। সে পালাবে কোথায়, তাকে তো ঠিক মারবোই। তার আগে একে শেষ করে দিয়ে যাবো।

প্রথম লোকটা বললো, তুই সরে আয়, আমি আগে খাবো।

অন্য লোকটি বললো, আরে যাঃ তুই একটু দূরে দাঁড়া, আমি আগে খেয়ে নিই! আমার কুকুরই ওকে দেখেছে!

প্রথম লোকটি গর্জন করে বললো, চোপ! আমি আগে!

অন্য লোকটি আবার হাসতে হাসতে বললো, আরে, আরে একটা ফালতু মেয়েমানুষের জন্য আমরা ঝগড়া করবো নাকি? একটা কয়েন নিয়ে টস্ কর। তোর কাছে কয়েন আছে?

প্রথম লোকটি একটা মুদ্রা নিয়ে টস্ করে হেরে গেল। তখন সে জেদীর মতন বললো, বারবার তিনবার হবে!

সে দ্বিতীয়বার টস্ করবার আগেই কুকুরটা দারুণ চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ফিরে এলো। সে যেন দারুণ ভয় পেয়েছে! দূরে আর একটা কিছুর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে!

লোকদুটো উঠে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরলো। একজন বার করলো রিভলভার। অন্যজনের হাতে কুকরী।

পাহাড়ের উঁচুর দিকে গাছ ভাঙার মড়মড় শব্দ হচ্ছে। লোক-দুটো কান খাড়া করে শুনছে সেই শব্দ। কুকুরটা ছুটতে ছুটতে একবার নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে, আবার প্রভুর কাছে ফিরে এসে কুঁই কুঁই করছে।

বেশ বড় একটা গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ হতেই লোকদুটো প্রায় লাফিয়ে উঠে বললো, হাঁতি! হাঁতি!

তারপরেই তারা দৌড় লাগালো।

ওমি শুয়ে রইলো সেখানেই। সেও বুঝতে পেরেছে, হাতির পাল আসছে। দু'একবার ডাকও শোনা গেল। এর আগে, একবার মাত্র সে হাতি দেখেছে এই জঙ্গলে, সেটা দিনের বেলায়। তিনটে হাতি ঝর্ণার কাছে এসে কিছুক্ষণ জল নিয়ে খেলা করে নেমে গিয়েছিল উপত্যকার দিকে।

এবার হাতির পাল যেন ঠিক এই দিকেই আসছে। ওমি ইচ্ছে করলে গম্বুজ-ঘরে গিয়ে লুকোতে পারে। কিন্তু তার যেন ওঠারও শক্তি নেই। উঠে পালাবার দরকারই বা কী! হাতির পায়ের তলায় পড়লেই এক নিমেষেই তার প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, সে কোনো ব্যথাও টের পাবে না।

হাতির পাল এদিকে এলো ঠিকই। ওমির খুব কাছ দিয়েই চলে গেল। ওমিকে তারা গ্রাহ্যও করলো না। ওরা ঝর্ণায় দাপা-দাপি করছে, সেও শুনতে পাচ্ছে ওমি। সে দারুণ অবাক হয়ে গেছে!

সে শুধু প্রাণেও বাঁচেনি, ঐ লোকদুটো তার শরীরটা নিয়ে যে কামড়া-কামড়ি করতো, সে কষ্টও তাকে সহ্য করতে হলো না। কে তাকে বাঁচালো? ভগবান? ভগবান ঠিক সময়ে হাতির পাল পাঠালেন এখানে? কিন্তু ভগবানের কাছে সে তো কখনো বাঁচিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানায়নি। সে তো বারবার মরতেই চেয়েছে। তবু ভগবান যদি বাঁচাতেই চান, তাহলে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? মানুষকে এত কষ্ট দিয়ে ভগবান কী আনন্দ পান?

এক সময় উঠে পড়ে সে আস্তে আস্তে গম্বুজ-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লো।

॥ ৬ ॥

গুরুং আর এলো না।

ওমির কাছে চাল-ডাল যা ছিল, ফুরিয়ে গেল সব। তার কাছে আর এক দানাও খাদ্য নেই। তার অবশ্য আর কিছুই খেতেও ইচ্ছে করে না। গুরুং-এর সঙ্গে তার শেষ রাত্তিরটার কথা বারবার মনে পড়ে।

গুরুং তাকে যেমনভাবে আদর করেছে, সে রকম আদর কোনো পুরুষের কাছ থেকে সে যে পাবে এ জীবনে, সেই আশাই তো তার ছিল না। গুরুং তাকে সত্যিকারের ভালোবেসে আদর করতো। তারপর গুরুং আহত হয়ে নিজের বাড়িতে গেল না, তার কাছেই এসে আশ্রয় নিল। যেন গুরুং তার স্বামী। সে গুরুংকে রেঁধে খাইয়েছে, তার সেবা করার সুযোগ পেয়েছে, এতেই যেন ধন্য হয়ে গেছে তার নারী-জীবন। তার তো আর কিছুই চাই না?

যতদিন সে নিজের মা-বাবার কাছে ছিল, ততদিন সে শুধু লাঞ্ছনা আর বিদ্রূপই পেয়েছে সবার কাছ থেকে। এই পাহাড়-জঙ্গলে এসে সে সম্পূর্ণ একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেল। হোক না সেই জীবনটা সংক্ষিপ্ত, তবু তাই-ই যথেষ্ট। এবার এখানে সে মরে যাবে, তার শরীরটা মিশে যাবে মাটির সঙ্গে, এটাই তার নিয়তি।

কিন্তু খিদের দাপটে নিয়তিও তুচ্ছ হয়ে যায়। দিন তিনেকের মধ্যেই খিদের জ্বালায় ওমির প্রায় পাগলের মতন অবস্থা। ঘরে খাদ্য নেই, কিন্তু জঙ্গলের কাঁঠালগাছে কচি কচি কাঁঠাল ফলতে শুরু করেছে। শুধু এঁচোড়ও তো সেদ্ধ করে খাওয়া যায়।

একসঙ্গে বেশি খায় না ওমি, তাতে পেট ব্যথা হয়। দু'দিন শুধু এঁচোড় খেয়েই খিদে মেটাবার পর ওমির শরীরটা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, মৃত্যুও এত সহজ নয়, চাইলেই পাওয়া যায় না। মানুষ কতরকম ভাবে বাঁচতে পারে।

বুকটা সব সময় হু হু করে গুরুং-এর জন্য। তার জীবনের একমাত্র পুরুষ! কুকুর নিয়ে যে লোক দুটো এসেছিল, তারা শেষ পর্যন্ত তার শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারেনি।

এক একটা গাছকেই গুরুং মনে করে সে গাছটার সঙ্গে কথা বলে। গাছটাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে। তাতেও বেশিক্ষণ মন মানে না।

গুরুং তাকে যে টাকার বাণ্ডিল রাখতে দিয়েছিল, সেটা সে-ই নিয়ে গেছে। কুকুর সঙ্গে নিয়ে লোক দুটো তার ঘর লণ্ডভণ্ড করে করে গেছে, কিন্তু তারা ওমির যে নিজস্ব কিছু টাকা ছিল, তা দেখতে পায়নি। জঙ্গলে সেই টাকা দিয়েই বা কি হবে ?

গুরুং এলো না, কিন্তু সেই লোক দুটো যদি ফিরে আসে ? ওমি যে এই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, তা এখন অন্তত তিনজন মানুষ জানে !

একদিন ওমি আরও তিনজনকে দেখতে পেল। এরা তিনজনই পাহাড়ী মেয়ে। প্রত্যেকের কোমরে একটা করে ঝুড়ি। এরা এসেছে জঙ্গল থেকে এঁচোড় সংগ্রহ করতে।

ওমি তখন স্নান করছিল ঝর্ণায়, সেই তিনটি মেয়েও এলো ঝর্ণার কাছে। তারা ওমিকে দেখে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করলো, হাসলো। কিন্তু খুব একটা অবাক হবার ভাব দেখালো না, ওমিকেও বললো না কিছু।

মেয়ে তিনটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ওমি। কী সুন্দর রং ওদের, কী চমৎকার শরীরের গড়ন। ঝলমলে হলুদ-লাল-নীল রঙের শাড়ি পরেছে। ওদের দেখে ওমির মনে ভয় জাগলো না। ওরা কি ওমির কালো রং দেখে ঘেন্না করছে।

ওমির খুব ইচ্ছে করলো ওদের সঙ্গে কথা বলতে! ওরা হয়তো গুরুং-এর খবর জানতে পারে! কিন্তু ওমির মুখে একটাও কথা সরলো না। লজ্জায় শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে আসে! ওরা যদি জিজ্ঞেস করে, গুরুং তোমার কে হয় ?

মেয়ে তিনটির চলে যাবার পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওমি।

এরপর আরো দুটো মেয়ের দলকে পরপর দু'দিন দেখলো ওমি। সবাই আসছে জঙ্গল থেকে এঁচোড় নিতে। ওমি দেখেছে তার বাবাকে বাজার থেকে মাঝে মাঝে এঁচোড় কিনে আনতে। কলকাতা-নৈহাটি-ব্যারাকপুরের দিকে এঁচোড় বিক্রি হয়, কিন্তু

এখানে এত এঁচোড়, এখানে আর কে কিনছে?"এরা নিশ্চয়ই নিজেদের খাবার জন্য নিতে আসে।

আর একদিন ওমি দেখলো দশবারো জন মানুষের একটি দল এই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নেমে যাচ্ছে উপত্যকার দিকে। দলটির মধ্যে নারী পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু সবই আছে, কিন্তু তারা পাহাড়ীদের মতন ফর্সা নয়। রোদে-পোড়া তামাটে চেহারা, দেখলে মনে হয় অনেকদিন ভালো করে খেতে পায়নি। এরা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়?

জঙ্গলটা এখন আর আগেকার মতন সম্পূর্ণ নির্জন নয়। মাঝে মাঝেই দেখা যায় মানুষজন। শীত কেটে গিয়ে গরম পড়েছে বলেই এখানে মানুষ আসতে শুরু করেছে। কেউ অবশ্য এ পর্যন্ত ওমিকে বিরক্ত করেনি।

লোকগুলো সবাই উপত্যকার দিকে নেমে যায়। তা দেখে একদিন ওমির মনে হলো, সেও তো একবার পাহাড়ের তলা থেকে ঘুরে আসতে পারে। গুরুং বলেছিল, ঐখানে গ্রাম আছে। বাজার আছে। একবার গেলে কী আর বিপদ হবে?

মানুষ সম্পর্কে ভয় আর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল ওমির! রেলের কামরা থেকে নেমে পড়ে এই পাহাড়ের জঙ্গলে এসে পেঁছোবার পর ওমি ভেবেছিল, সে আর কোনদিন মানুষের মুখ দেখবে না। জঙ্গলের গাছপালাই হবে তার বন্ধু। গাছপালারা তার মতন কালো মেয়েকে তো কুৎসিত বলে বিদ্রূপ করে না।

তারপর এলো গুরুং। সে ওমিকে ঘৃণা করেনি, ভালোবেসেছিল। নইলে বারবার তার কাছে ফিরে ফিরে আসবে কেন? আহত অবস্থাতেও সে নিজের বাড়িতে না গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ওমির কাছে।

এখন জঙ্গলেই অনেক মানুষজন দেখছে ওমি। তারাও ওমিকে দেখে কোনো সাড়া শব্দ করে না। মানুষ সম্পর্কে আস্তে আস্তে তার ভয় ভেঙে গেল।

একদিন নিজের টাকাগুলো আঁচলে বেঁধে ওমি নামতে লাগলো পাহাড়ের নীচে।

একটা পাহাড় ডিঙোবার পর সে পেয়ে গেল পায়ে চলা একটা

পথ। সেই পথ তাকে নিয়ে গেল একটা গ্রামে। সেখানে তখন হাট বসেছে, বেশ মানুষজনের ভিড়।

প্রথমেই একটা হলুদ গেঞ্জি পরা যুবককে দেখে চমকে গেল ওমি। ঐ তো গুরুং! সে ছুটে গেল তার সামনে।

যুবকটি বাঁ হাতের মুঠোয় একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিল। ওমির দিকে একবার ত্যারছা চোখে তাকিয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

ওমির বুক ধক ধক করছে। গুরুং তাকে চিনতে পারছে না? গুরুং তাকে ইচ্ছে করে চিনবে না? যদি না চেনে, ওমি তো তার কাছে কোনো দাবি জানাতে পারবে না!

একটু পরেই ওমির ভুল ভাঙলো। এখানকার অনেক যুবককেই গুরুং-এর মতন দেখতে, পোশাকও একই রকম, আলাদা করে চেনা মুস্কিল। তাছাড়া গুরুং-এর পায়ে খুব চোট লেগেছিল, এত তাড়াতাড়ি সে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে কি?

হাটের মধ্যে ওমিকে নিয়ে মাথা ঘামালো না কেউ। সে কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, তা কেউ জানতে চায় না। দোকান থেকে সে চাল-ডাল কিনলো। এক জায়গায় মাছ বিক্রি হচ্ছে দেখে তার খুব লোভ হলো মাছ খাবার। কতদিন সে মাছ খায়নি! মরে যাবার আগে সে আর একবার মাছ খেয়ে নেবে না?

এই হাটে এঁচোড়ও বিক্রি হচ্ছে দেখে ওমি অবাক হয়ে গেল নানান জায়গায় এঁচোড় ডাঁই করা আছে। পাইকাররা এসে এখানকার এঁচোড় আর অন্যান্য তরকারী নিয়ে যায় শহরের বাজারে।

ওমি বুঝতে পারলো, পাহাড়ী মেয়েরা জঙ্গল থেকে এঁচোড় এনে এখানে বিক্রি করে। তখন তার বুদ্ধি এলো, তার টাকা ফুরিয়ে গেলে সেও তো জঙ্গল থেকে এঁচোড় কিংবা কাঁঠাল এনে এখানে বিক্রি করতে পারে।

চাল-ডাল-তেল-নুন-মশলা-মাছ এইসব অনেক কিছু কিনে ফেললো ওমি। জীবনে কখনো সে একসঙ্গে এত টাকা খরচ করেনি। তেলের জন্য একটা শিশি কিনতে হলো এক টাকা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত তিরিশ টাকা দিয়ে একটা শাড়িও কিনে ফেললো ওমি।

আনন্দে তার সারা শরীরে একটা হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। একেই যেন বলে বেঁচে থাকার আনন্দ।

সব কিছু বয়ে নিয়ে অন্ধকার হবার একটু আগে হাট থেকে ফিরে এলো ওমি। কেউ তার পিছু নিল না।

পাহাড়ের ওপরে উঠতে উঠতে অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু ওমির মন থেকে ভয়-ডর একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অন্ধকারেও জঙ্গলের মধ্যে পথ চলতে তার কোনো অসুবিধে হয় না।

দু'চারটে সস্তার বাসনপত্রও কিনে এনেছে ওমি। যেন আবার নতুন করে সে সংসার সাজাবে। মৃত্যুর কথা তার আর মনেই পড়ছে না। গায়ে একটু জোর এলেই বাঁচতে ইচ্ছে করে।

বাড়ি ছেড়ে আসার পরে এই প্রথম ওমি আলাদা করে ডাল আর ভাত রাঁধলো, দু'খানা বেগুন ভাজলো। মাছের ঝোল করলো। যেন রীতিমতন একটা ভোজ।

সব রান্না শেষ করার পর সে পা ছাড়িয়ে কাঁদতে বসলো।

শুধু নিজের জন্য কি কেউ এতসব রান্না করে? সে কি এতই হ্যাংলা? যদি গুরুং থাকতো, তা হলে কত আনন্দ হতো! গুরুং খিচুড়ি খেতে এত ভালোবাসে, সে কখনো ওমির হাতে মাছ রান্না খায়নি!

এত যত্নের রান্না, তবু ওমির মুখেই রুচতে চায় না। নষ্ট করারও কোনো মানে হয় না। চোখ দিয়ে জল ঝরছে, সেই সঙ্গে ওমি একটু একটু করে খেয়ে যাচ্ছে। বাইরে ঝিমঝিম করছে রাত। কোথাও কোনো শব্দ নেই। মাঝে মাঝে একটা-দুটো গাছের পাতা খসে পড়লেই ওমি চমকে উঠছে। গুরুং আসছে?

ওমির ধারণা গুরুং ফিরে আসবেই একদিন না একদিন। ঐ লোক দুটোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে গুরুং এখন লুকিয়ে আসে। একটু সুস্থ হয়ে উঠে সে ঐ লোক দুটোকে শাস্তি দেবে।

সেই রাতটা কাটবার পর ওমির মনের ভাব অনেকটা বদলে গেল। ঘুম থেকে ওঠার পরই তার মনে হলো, এত দিনেও সে যখন মরেনি, তাহলে আর শুধু শুধু সব সময় মরার চিন্তা করে কী হবে? তার থেকে বাঁচার চিন্তা করাই তো ভালো। আরও যে-কটা দিন বেঁচে থাকা যায়, সেই কটা দিনই তো লাভ! মৃত্যুর পর কী আছে কে জানে!

তাকে বাঁচতে হবে গ্রুং-এর জন্য। গুরুং-এর জন্য সে অপেক্ষা করবে। সে জন্য তার শরীরটাকে সুস্থ রাখতে হবে। পাহাড়ের নীচের গ্রামটায় গিয়েও সে নতুন ভাবে বাঁচার প্রেরণা পেয়েছে। কত লোক বেঁচে আছে? কয়েকজন থুত্থুরে বুড়িকেও সে দেখেছে, তারাও যদি বেঁচে থাকতে পারে, তা হলে সে বাঁচবে না কেন?

তার টাকা-পয়সা আর খাবার-দাবার ফুরিয়ে গেলে সেও এঁচোড় কিংবা কাঁঠাল বিক্রি করতে নিয়ে যাবে হাটে। একটা কলা গাছে সে মোচা ফলতে দেখেছে। ঐ মোচা থেকে যদি এক কাঁদি কলা হয়, তাহলে সেই কলাও খাওয়া যায় কিংবা বিক্রি করা যাবে। একটা না একটা কিছু জুটে যাবেই।

একদিন ওমি দেখলো, খানিকটা নীচে, জঙ্গলটা যেখানে কিছুটা ফাঁকা, সেখানে দু'খানা ঝুপড়ি ঘর গজিয়ে উঠেছে। সাত-আটজন মানুষ যেখানে থাকে, স্ত্রীলোক এবং দুটি বাচ্চাও রয়েছে। জঙ্গল সাফ করে তারা কী যেন চাষের চেষ্টা করছে।

প্রথম দিন ওমি বেশ রেগে গিয়েছিল। পাহাড়টা যেন তার একার সম্পত্তি, এখানে অন্যেরা এসে ভাগ বসাবে কে?

কিন্তু ওমি ওপর থেকেই ওদের দেখে, নীচে নেমে ওদের কাছে যায় না! ওপর থেকে কখনো কখনো ক্ষীণ গলার আওয়াজও শোনা যায়। কিন্তু ওরা ওপরের দিকে আসে না। ওমি প্রায়ই তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। ক্রমশ সে বুঝতে পারলো, ওদের দেখতে তার ভালোই লাগে। কাছাকাছি অন্য মানুষ আছে, এটা জানতে পারলেও কিছুটা যেন ভরসা পাওয়া যায়। মানুষ মানুষকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না।

গম্বুজ-ঘরটার পেছনের ছাইগাদায় ওমি একদিন একটা নতুন গাছের চারা দেখতে পেল। ওমি বিশেষ গাছ চেনে না। কিন্তু এই চারাগাছের পাতা কেমন যেন চেনা চেনা। ওমিদের বাড়ির রান্নাঘরের পাশে দু'একটা লঙ্কা আর বেগুন গাছ ছিল। এই চারাগাছটা ঠিক বেগুন গাছের মতন! তা হলে এখানে একটা বেগুন গাছ হবে। সেই গাছে বেগুন ফলবে? একটা মাত্র গাছে কটা আর বেগুন ফলবে, তবু ওমির আনন্দের সীমা নেই। এই

গাছের বেগুনের বীজ নিয়ে নতুন নতুন গাছ হবে, এখানে একটা বেগুনের খেত হয়ে যাবে!

ওমি দারুণ উৎসাহের সঙ্গে সেই চারাগাছে জল দেয়। এখন তার মৃত্যুর কথা আর মনেও পড়ে না। রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সে কল্পনায় একটা বিশাল বেগুন খেত দেখতে পায়। তার নিজস্ব খেত।

এক রাত্তিরে হঠাৎ তার ঘরে ঢুকে পড়লো একজন পুরুষ।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ওমি ভেবেছিল গুরুং ফিরে এসেছে, সে আনন্দে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই লোকটি কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলো, তোর মরদ কোথায়?

গলার আওয়াজ শুনেই চিনতে পারলো ওমি। সেই গুরুং-এর শত্রু দু'জনের একজন। আজ সে একা এসেছে, কুকুরটাকেও আনেনি।

ওমি আজ আর সহজে ধরা দিল না। লোকটি ওমির চুলের মুঠি ধরার জন্য নীচু হতেই ওমি গড়িয়ে সরে গেল খানিকটা। হাতের কাছে রান্নার জিনিসপত্র যা পেল তাই-ই ছুঁড়ে মারলো লোকটার দিকে।

কিন্তু অত সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না। একটা নরখাদকের মতন ঐ লোকটি আজ ওমিকে খাবে বলেই ঠিক করে এসেছে। সেদিন হাতির পাল এসে পড়ায় ওদের মুখের গ্রাস ফস্কে গিয়েছিল।

লোকটি একটা লাথি কষালো ওমির পেটে। দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বললো, হারামীপনা করবি তো একেবারে জানে শেষ করে দেবো!

ওমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লোকটি তাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই সে প্রাণপণে তাকে একটা ধাক্কা মারলো। ওমি আর আগেকার সেই রোগা-দুর্বল মেয়েটি নেই। কয়েকদিন পেট ভরে খাবার পর তার শরীরে জোর এসেছে। তাছাড়া সে এখন আর মরতে চায় না, বাঁচতে চায়। সেই বাঁচার ইচ্ছেরও একটা শক্তি আছে।

লোকটিকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়লো ওমি। তারপর ছুটলো। কুকুরটা থাকলে সে এত সাহস পেত না। কুকুরের সঙ্গে সে ছুটেও পারতো না।

কিন্তু তার আক্রমণকারীও বেশ জোরে ছুটতে পারে। তার হাতে টর্চ। ওমি কোথাও লুকিয়ে পড়তে পারছে না।

ওমি পাহাড়ের ওপরের দিকে ছুটতে শুরু করেই ভুল করেছিল। নীচের দিকে, ঝর্ণাটার ধার দিয়ে ছুটে গেলে সে হয়তো ঝুপড়ি দুটোর কাছে পেঁাছেতে পারত। সেখানে মানুষজন আছে। তারা কি ওমিকে বাঁচাতো না?

এর আগে পাহাড়ে কোনো মানুষ ছিল না, চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পেত না। এখন ওমি চেঁচিয়ে ওদের ডাকবে? ডাক শুনতে পেলেও এই গভীর রাত্তিরে সেই লোকগুলো ওমিকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে কেন? তারা তো ওমিকে চেনে না!

একবার আছাড় খেয়ে পড়ে যাবার পর ওমি আর উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পেল না। লোকটি এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর। এক হাতে ওমির গলা চেপে ধরে অন্য হাতে সে জোরে জোরে চড় কষাতে লাগলো ওমির গালে।

মার খেতে খেতেও ওমি কিন্তু ভেঙে পড়লো না, তাকে গ্রাস করলো না নৈরাশ্য। আগের বারের চেয়ে অনেক তফাৎ। একবারও মরে যাবার কথা মনে আসছে না। সে খালি ভাবছে, যে-কোনো উপায়ে তাকে বাঁচতে হবে। এই লোকটা তার শরীর ছুঁয়েছে বলে তার ঘেন্না করছে। গুরুং ছাড়া আর কোনো পুরুষের কাছে সে ধরা দেবে না।

লোকটা চড় মারা থামিয়ে ওমির দুটো হাত মাটিতে চেপে ধরে তার মুখের কাছে মুখটা নামিয়ে আনতে লাগলো।

ওমি অদ্ভুত শান্ত ভাবে বললো, আমায় ছেড়ে দাও! আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করি নি!

লোকটি হিংস্রভাবে বললো, তোর মরদ আমাদের ফাঁকি দেবে ভেবেছিস? আগে তোকে শেষ করবো, তারপর তাকে।

ওমি আবার বললো, আমায় ছেড়ে দাও!

লোকটি আরও নীচু হয়ে ওমির ঠোঁট ছোঁবার চেষ্টা করতেই ওমি হঠাৎ মুখটা উঁচু করে কামড়ে ধরলো তার নাক। শরীরের সবটুকু রাগ, সবটুকু শক্তি দিয়ে ওমি তার নাকটা ছিঁড়ে নিতে চাইলো। একটা প্রেতিনীর মতন রক্তে ভরে গেল ওমির মুখ।

লোকটি বিকট চিৎকার করে উঠলো, নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। ওমিই তার নাকের খানিকটা কেটে নিয়ে এক ঠেলা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল।

তারপর আবার দৌড়ালো ওমি। থু থু করে সে মাংসের কুচি আর রক্ত ফেলতে লাগলো মুখ থেকে। ওমির একটুও ঘেন্না করছে না। বরং তাব শরীরটা আনন্দে উত্তেজনায় কাঁপছে। জীবনে এই প্রথম সে পুরুষের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পেরেছে, সে নিজের চেষ্টায় জিতেছে। লোকটা আর তাকে ধরতে পারবে না।

অন্ধকারে একটা খাদের মতন জায়গায় পড়ে গিয়ে গড়াতে লাগলো ওমি। তবু তার ভয় করছে না। এখন মরে গেলেও ক্ষতি নেই। সে একবার অন্তত বিজয়িনী হয়েছে, এখন তার জীবনটা ব্যর্থ নয়।

পায়ে কিছুটা চোট লাগলেও ওমি মরলো না। সে গড়িয়ে গিয়ে পড়লো একটা ঝোপের মধ্যে। সেখানেই শুয়ে রইলো সে।

সেই লোকটি আর ওমিকে খোঁজার চেষ্টা করেনি। সে তখন নিজের যন্ত্রণায় পাগল। খাদের মধ্যে থেকেই ওমি শুনতে পেল, লোকটা চিৎকার করতে করতে পাহাড়ের নীচের দিকে ছুটছে।

সেইখানে শুয়ে শুয়েই ওমি ঠিক করলো, এবার হাটে গিয়ে সে একটা বড় বঁটি কিংবা দা কিনে আনবে। রাত্তিরবেলা সে সেই অস্ত্রটা পাশে নিয়ে শোবে। ঐ লোকটি যদি আবার কোনো রাত্তিরে ফিরে আসে কিংবা ওর সঙ্গের অন্য লোকটা, তা হলে সে না লড়াই করে ধরা দেবে না।

সকালবেলা ঝর্ণার জলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলো ওমি। অন্য দিন সে কোনো একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করে, আজ যেন তার মুখ থেকে কিছুতেই রক্তের স্বাদটা যাচ্ছে না। সে নানান গাছের কচি কচি পাতা ছিঁড়ে চিবুতে লাগলো।

সেদিন কেউ এলো না, পরের দিনও না।

ওমি এখন বাঁচতে চায়, তাই সবসময় সাবধানে থাকে। বন্য জন্তুরা যেভাবে আত্মরক্ষা করে, সেই ভাবে সে নিজেকে একটু একটু করে তৈরি করে নিচ্ছে।

এখন মাঝে মাঝে সে নীচের ঝোপড়ি দুটোর খুব কাছে নেমে

যায়। গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ওদের দেখে, ওদের কথা শোনে।

ওরা পাহাড়ী নয়, বাংলায় কথা বলে। তবে উচ্চারণ অন্যরকম। ওমিরা বাঙাল নয়, ওর বাবা-ঠাকুর্দা পশ্চিমবঙ্গেরই মানুষ, কিন্তু ওদের বাড়ির কাছাকাছি অনেক বাঙাল পরিবার থাকতো, ওমি বাঙাল ভাষা যথেষ্ট শুনেছে, কিন্তু এই ঝোপড়ির লোকগুলোর কথা যেন আরও অন্যরকম, সব কথা বোঝাই যায় না।

লোকগুলো নিরীহ চাষী। সকালে উঠেই পান্তা ভাত খায়, তারপর চাষের জন্য মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে, জঙ্গলের কাঠ কেটে উপত্যকায় গ্রামের হাটে বিক্রি করতে যায়। তাতেও ওদের ভালো করে খাবার জোটে না! দুটো বাচ্চা ছেলে মেয়ে এক এক সময় মা, ভাত দে বলে কাঁদে। ওদের মা ভাত দেবার বদলে ওদের মারতে আসে।

ওমি একটি অশরীরী আত্মার মতন লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের লক্ষ্য করে। কিছুতেই কাছে যায় না। কিসের যেন একটা লজ্জা তাকে পেয়ে বসে। অনেকদিন একা থাকতে থাকতে মানুষের সঙ্গে কথা বলতেই যেন সে ভুলে গেছে।

তবু মানুষ তাকে টানে। প্রায় নেশার মতন প্রত্যেকদিন সে ঝোপড়ি দুটোর কাছে যায়। ছেলেমেয়ে দুটোর সঙ্গে তার খেলতে ইচ্ছে করে। তবু সে ওদের দেখা দেয় না।

আর একদিন সন্ধ্যেবেলা এলো হাতির পাল।

হাতিরা গাছপালা ভেঙে শব্দ করতে করতে আসে। দূর থেকেই তাদের আগমন টের পাওয়া যায়। এবার ওমি গম্বুজ-ঘরে গিয়ে লুকোলো।

তখনো ভালো করে অন্ধকার হয়নি। ওমি দেখতে পেল মোট পাঁচটা হাতি, তাদের মধ্যে একটা বাচ্চাও আছে, হেলতে দুলতে প্রায় গম্বুজ-ঘরটার সামনে দিয়েই চলে গেল। ওদের দেখলে ভয় লাগে না। অনেকটা গণেশ ঠাকুরের মতনই দেখায়। মনে হয় যেন অতবড় চেহারা হলেও হাতিরা আসলে নিরীহ প্রাণী।

কিন্তু একটু পরেই ওমি শুনতে পেল মানুষের গলার আর্তনাদ। কান্না আর ভয় মেশানো সেই চিৎকার আসছে নীচের ঝোপড়ি

দুটোর কাছ থেকে। হাতির পাল ওদের ঝোপড়ি ভেঙ্গে দিচ্ছে। ঐটাই বোধহয় যাবার রাস্তা। ওদের পথে যা কিছু পড়ে সবই ওরা ভাঙতে ভাঙতে যায়, কিছু গ্রাহ্য করে না।

বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোর কান্নার আওয়াজ শুনে ওমির বুক মোচড়াতে লাগলো। হাতির পাল ওদের মেরে ফেলেছে নাকি? ওমির একবার ইচ্ছে হলো ছুটে যেতে। পরের মুহূর্তেই আবার ভাবলো, পাঁচটা হাতির বিরুদ্ধে সে কী করবে?

পরের দিন সকালবেলা ওমি সেখানে নেমে গেল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলো একটা করুণ দৃশ্য।

হাতির পাল সেই ঝোপড়ি দুটো একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শুয়ে আছে একজন বুড়ো মানুষ, দূর থেকে দেখলেও বোঝা যায় যে তার প্রাণ নেই। হাতিরাই তাকে মেরেছে না ভয়ের চোটে সে মারা গেছে, তা অবশ্য বোঝা যায় না।

দু'জন স্ত্রীলোক সেই মৃত দেহটির পাশে বসে খুন খুন করে কাঁদছে। আর দু'জন পুরুষ মানুষ, মনে হয় বাবা আর ছেলে, তারা জঙ্গলের বাঁশ ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে আবার ঘর বানাবার চেষ্টা করছে। মৃতদেহটির দিকে তারা তাকাচ্ছেও না একবার। তারা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। আর বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটি খেলা করছে ঝর্ণার ধারে, যেন কাল রাত্তিরে কিছুই ঘটেনি।

ওমির চোখে জল এসে গেল। ঐ বুড়োটিকে সে চেনে না, তার জন্য ওমির দুঃখ হবার কথা নয়। কিন্তু তার মনে হলো, একদিকে মৃত্যু, আর অন্যদিকে নতুন করে জীবন গড়ার চেষ্টা। কত কষ্টের মধ্যেও মানুষ বেঁচে থাকে। তাহলে সে এতদিন মরে যাবার জন্য তৈরি হয়েছিল কেন? কেন সে মরবে? যেমন করেই হোক, যেভাবেই হোক, যতদিন সম্ভব তাকে বাঁচতেই হবে।

॥ ৭ ॥

ওমির পক্ষে অবশ্য বিনা বাধায় জীবন কাটানো সম্ভব হলো না। গুরুং-এর শত্রুপক্ষের সেই লোকদুটি আর আসেনি বটে, কিন্তু তার বিপদ এলো সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে।

ওমির কাহিনী একেবারে কাল্পনিক নয়। আমি এই কাহিনীর লেখক হলেও মূল ঘটনাগুলো আমি শুনেছি একজন রিটায়ার্ড জজের কাছ থেকে। হাফলং-এর ডাকবাংলোয় তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সন্ধ্যের দিকে বাংলোর চওড়া বারান্দায় পাশাপাশি দুটো ইজিচেয়ারে আমরা বসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার অল্প আলাপ হয়েছিল। বিচারকটি চুপচাপ ধবনের মানুষ, নিজের থেকে বিশেষ কথা বলতে চান না, হঠাৎ সেদিন তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, আমার জীবনের একটা ঘটনা শুনবেন ?

এই কাহিনীতে ঐ বিচারকের ভূমিকা একটু পরে আসবে।

ওমির রূপ ছিল না, বিশেষ কোনো গুণ ছিল না, স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না। কোনো পুরুষের আকর্ষণ ছিল না তার প্রতি, সে ছিল তার বাপ মায়ের একটা বোঝা। ওমির মতন অনেক মেয়েই একটা বঞ্চিত জীবন কাটিয়ে যায়। মনে মনে রাগে-দুঃখে ফোঁসে, কিন্তু কোনোদিন প্রতিবাদ করার সাহস পায় না, মেনে নেয় সব কিছু। ক্বচিৎ দু'একজন আত্মহত্যা করে।

ওমিও ছিল একটা ভীতু, মুখচোরা মেয়ে। সে শেষ পর্যন্ত সব কিছু মেনে নেবার বদলে মরতেই চেয়েছিল। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভাগ্যের টানে ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পৌঁছোলো আসামের এক পাহাড়ী জঙ্গলে। সহজে মৃত্যু এলো না তার কাছে, তার বদলে সে বাঁচার স্বাদ পেল। একজন পুরুষ তার নারীত্বের মূল্য দিল।

ওমি বুঝতে পারলো, মৃত্যু মানেই একেবারে ফুরিয়ে যাওয়া, আর বেঁচে থাকার মধ্যে কিছু না কিছু আনন্দ-উপভোগ পাওয়া যায় ঠিকই। বাঁচতে চাইলে বাঁচাও যায়। জীবন ধারণের মতন খাদ্য জুটে যায়। একজন মানুষের 'তো বেশি কিছু লাগে না।

জঙ্গলের জীবনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল ওমি। জঙ্গলকে সে ভালোবাসতে শিখেছিল। ছেলেবেলা থেকেই সবাই তাকে কুৎসিত বলতো বলে সে কোনো সৌন্দর্যও চিনতে শেখেনি। একা থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে তার চোখ খুলেছে। এখন সারাদিন ধরে আকাশের রং ফেরা সে মুগ্ধ হয়ে দেখে এক একদিন। কোনো একটা পাখির ডাক তার অবিকল কোনো গানের মতন মনে হয়। একটা পাতা ঝরে যাওয়া গাছে আস্তে আস্তে নতুন পাতা আসে, তা দেখে সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ঝর্ণার জলে নিজের মুখখানা দেখেও সে চমকে ওঠে। স্বাস্থ্যের আভা লেগেছে বলে তার মুখখানা অনেকটা বদলে গেছে। নিজেকে তার এখন আর তেমন অসুন্দর মনে হয় না। সে এখন অন্য ওমি।

কয়েকবার হাট থেকে কিছু জিনিসপত্র কিনে এনে সে মোটামুটি একটা সংসারও সাজিয়ে ফেলেছে। এখন তার কিছুরই অভাব নেই। সে প্রায়ই স্বপ্ন দেখে, গুরুং আবার ফিরে আসবে। গুরুং-এর জন্য সে অনেক কিছু জমিয়ে রাখে।

এর মধ্যে হাটে গিয়ে দু'বার কাঁঠাল বিক্রি করে এসেছে ওমি। এখন কাঁঠাল শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আরও একটা জিনিস বিক্রি করার আছে। ওমি দেখেছিল, এখানকার একরকম গাছের গায়ে অনেক আঠা জমে, পাহাড়ী মেয়েরা এসে সেই আঠা তুলে নিয়ে যায়। ওই আঠা দিয়ে কী হয় ওমি জানতো না, একদিন হাটে গিয়ে দেখলো, ঐ আঠাও বিক্রি হচ্ছে। পৃথিবীতে সব কিছুই কাজে লাগে, সব কিছুই বিক্রি হয়?

ওমি ঐ রকম গাছ অনেক দেখেছে! তাল তাল সেই আঠা জমিয়ে সে হাটে বিক্রি করে দিয়ে এলো একদিন। বেশ ভালোই পয়সা পেল। এরপর থেকে ঐ আঠা বিক্রি করেই তার খাবার খরচ চলে যাবে।

আঠা সংগ্রহ করতে গিয়ে একদিন সে মুখোমুখি পড়ে গেল তিনটি পাহাড়ী মেয়ের।

এই মেয়ে তিনটিকে ওমি আগেও দূর থেকে দেখেছে কয়েকবার। তার গম্বুজ-ঘরের কাছাকাছি ঝর্ণায় এসে এরা হাত-পা ধোয়, সেখানে বসে গল্প করে। কিন্তু ওমির সঙ্গে কোনোদিন কথা হয়নি, কাছাকাছিও যায়নি।

সেদিন একটি মেয়ে ভাঙা ভাঙা বাংলায় তাকে জিজ্ঞেস করলো, বহিন, তুমি এই জঙ্গলে একলা থাকো, তোমার ডর লাগে না?

ওমি দু'দিকে মাথা নাড়লো।

অন্য একটি মেয়ে বললো, ভয় লাগবে কেন? এই জঙ্গলে কি বাঘ আছে না ভাল্লুক আছে?

প্রথমে মেয়েটি বললো, আরে বাঘ, ভাল্লুক না। ভয় তো মানুষকে। পুরুষ মানুষেরা কোনো মেয়েকে কি একেলা থাকতে দেয়?

অন্য মেয়েটি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বললো, আমি পুরুষ মানুষদের ভয় পাই না। পুরুষ মানুষ কী করবে? জোর করে এক সঙ্গে শুনতে চাইবে তো? তাতে কী ক্ষতি আছে?

প্রথম মেয়েটি বললো, শুধু শুতে চায় না। তারপর মারে। কষ্ট দেয়।

অন্য মেয়েটি বললো, আমায় কোনো পুরুষ মানুষ মারতে এলে আমিও মারবো।

গোলাপী রঙের মেখলা পরা একটি মেয়ে চুপচাপ ছিল, সে এবার বললো, গুরুং এখন আর তোমার কাছে আসে না?

ওমি চমকে উঠলো। এরা গুরুং-এর কথা জানে?

অন্য একজন বললো, কোন্ গুরুং? যে আর্মস স্মাগ্‌ল করে? হ্যাঁ, ওকে মাঝে মাঝে পাহাড়ে আসতে দেখেচি। তাকে তো অনেক খুঁজছে?

গোলাপী পোশাকের মেয়েটি বললো, ওদের দলের মধ্যে মারামারি হয়েছে। গুরুং নাকি একজনের নাক কেটে দিয়েছে, সে চিকিৎসা করতে লামডিং চলে গেছে। আর গুরুং লুকিয়ে আছে কোথায় যেন।

প্রথম মেয়েটি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো, স্মাগলাররা তো প্রায়ই মারামারি করে নিজেদের মধ্যে। একজন মরে, আর একজন তার শোধ নেয়।

ওমির ঠোঁট কাঁপছে, তার চোখে জল এসে যাচ্ছে।

গোলাপী পোশাক পরা মেয়েটি ওমির কাঁধে হাত দিয়ে কোমল গলায় বললে, বহিন, তুমি কিছুদিন অন্য জায়গায় চলে যাও।

এখানে থেকো না। গুরুং-এর শত্রুরা এখানে তাকে খুঁজতে আসবেই। তোমাকে পেলে তারা ছাড়বে না।

ওমি দিশেহারার মতন বললো, আমি কোথায় যাবো?

সেই মেয়েটি বললো, বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যাও! সেখানে তোমার নিজের লোকদের সঙ্গে কিছুদিন থাকো।

ওমি বললো, বাংলাদেশ? সে দেশ তো আমি চিনি না?

মেয়েটি খানিকটা আশ্বাসের সুরে বললো, তুমি বাংলাদেশ চেনো না? তুমি সেখান থেকে আসো নি?

ওমি দু'দিকে ঘাড় নাড়লো।

অন্য একটি মেয়ে বললো, তাহলে অন্য কোনো পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। ঐ স্মাগলাররা বড় ডেঞ্জারাস হয়!

একটু পরে চলে গেল সেই মেয়েরা।

ওমি একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলো। এই গম্বুজ-ঘর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে? এটা যেন তার নিজস্ব বাড়ি হয়ে গেছে। এর কাছাকাছি জঙ্গল, ঝর্ণা, এই সবই যেন তার নিজস্ব। দেখতে দেখতে এখানে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল। এ জায়গা সে ছাড়বে কেন?

কিন্তু ঐ মেয়েরা নিশ্চয়ই শুধু শুধু ভয় দেখায়নি! যে-লোকটার সে নাক কেটে দিয়েছিল, সে চিকিৎসা করাতে গেছে। তার হয়ে অন্য কেউ প্রতিশোধ নিতে আসবে। এই গম্বুজ-ঘর ছেড়ে ওমি পালিয়ে গেলে ওরা আর তাকে খুঁজে পাবে না।

মেয়ে তিনটি তাকে বললো বাংলাদেশে চলে যেতে। বাংলাদেশ কোনদিকে? ওমির কোনো ধারণাই নেই। সে দেশের কারুকে তো সে চেনেও না। না, ওমি অতদূরে কোথাও যাবে না।

তা ছাড়া, আর একটা কথাও তার মনে পড়লো। গুরুং-এর শত্রুরা যেখানে সেখানে খুঁজতে আসবে, তেমনি গুরুং-ও তো লুকিয়ে লুকিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে। ওমি অন্য কোথাও চলে গেলে আর গুরুং-এর সঙ্গে দেখা হবে না!

ঐ মেয়ে তিনটির কাছ থেকে একটা খবর অন্তত জানা গেল। গুরুং বেঁচে আছে।

এখন গ্রীষ্মকাল, এখন পাহাড়ে মাঝে মাঝেই মানুষজন দেখা

যায়। শীতে কিংবা বর্ষায় বিশেষ কেউ আসে না। দিনের বেলা গুরুং-এর শত্রুরা ওমির কোনো ক্ষতি করতে বোধহয় সাহস পাবে না। তারা রাত্তিরে আসতে পারে। প্রত্যেক রাত্তিরে ওমিকে সাবধানে থাকতে হবে।

পরদিন দুপুরে ওমি ঝর্ণা থেকে স্নান করে এসে দেখলো তার গম্বুজ-ঘরটার সামনেই কয়েকজন মানুষ বসে আছে, সঙ্গে তাদের টিনের বাক্স আর পোঁটলা-পুঁটলি। মনে হয় তারা অনেক দূর থেকে আসছে। একজন স্ত্রীলোক উঁকি ঝুঁকি মারছে তার ঘরে। দুটি বাচ্চা ছেলে তার বেগুন ক্ষেত থেকে বেগুন ছিঁড়েছে।

এরা কারা? ওমি বেশ রেগে গেল।

একজন স্ত্রীলোক তাকে জিজ্ঞেস করলো, দিদি, আপনি এইখানে থাকেন?

ওমি গম্ভীরভাবে বললো, হুঁ! এটা আমার ঘর!

স্ত্রীলোকটি অপরাধীর মতন মুখ করে বললো, দরজা নাই, তাই ভিতরটা একবার দ্যাখলাম। আমরা অনেক দূর থিকা আসত্যাছি। এদিকে গ্রাম কত দূরে?

ওমি বললো, ঐ পাহাড়ের নীচে।

আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

সেই দলটি ঝর্ণার ধারে বসে চিঁড়ে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খেল। তারপর তারা নেমে গেল গ্রামের দিকে। ওমি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ওরা কাছাকাছি ঘর বেঁধে থাকলে ওমি আপত্তি জানাতে পারতো না, সে তো আর এই পাহাড়টার মালিক নয়। কিন্তু এত কাছাকাছি লোকজন থাকা তার মোটেই পছন্দ নয়?

ওমি এখন হাটবারগুলো হিসেব রাখে। কাল সকাল থেকেই নীচের গ্রামে হাট বসবে। ওমির চাল ফুরিয়ে গেছে, তাকে একবার হাটে যেতে হবে। হাটের দু একজন দোকানদারের সঙ্গেও তার মুখ-চেনা হয়ে গেছে।

পাহাড়ের পাকদণ্ডি ধরে নামছে ওমি, দূরে শুনতে পেল একটা গোলমাল। ঝোপড়ি দুটোর কাছ থেকেই মানুষের চ্যাঁচামিচি ভেসে আসছে। ওমি একবার থমকে গেল। আবার হাতির পাল

এলো নাকি? ওরা অনেক কষ্ট করে আবার কোনোরকমে মাথা গোঁজার জায়গা তৈরি করেছিল, হাতিরা এসে আবার ভেঙে দিচ্ছে?

ওমি খানিকক্ষণ নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইলো। হাতির পাল কোন দিকে যাবে কে জানে! হঠাৎ সামনে পড়ে গেলে কী দৌড়ে পালানো সম্ভব?

কিন্তু হাতির ডাক কিংবা সে-রকম কোনো গাছপালা দুরমুশ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, শুধু মানুষেরই চিৎকার। অনেকটা যেন মারামারির মতন। এই শান্ত নির্জন জঙ্গলে আগে এ ধরনের উৎপাত ছিল না, মানুষ এসে সব নষ্ট করে দিচ্ছে।

খানিকক্ষণ পর গণ্ডগোলটা থেমে গেল, হাতির কোনো চিহ্ন নেই। ওমিও যেন তার ষষ্ঠ অনুভূতি দিয়ে বুঝলো, ওটা হাতিদের ব্যাপার নয়।

ওমি আবার নামতে লাগলো নিচের দিকে। দুদিন ধরে তার ঘরে এক দানাও চাল নেই, আজ একটু তার ভাত খেতে ইচ্ছে করছে। দুটি গরম ভাত পেটে পড়লে বেঁচে থাকার সব আনন্দ যেন ফিরে আসে। গরম ভাতের মতন স্বাদ আর কিছুতে নেই!

উপত্যকার প্রায় কাছে নেমে আসার পর ওমি টের পেল কারা যেন ওপর থেকে ছুটে আসছে। ওমি পেছন ফিরে তিন চারজনকে দেখতে পেলেও ভয় পেল না। সামনে কিছু নারী পুরুষ যাচ্ছে হাটের দিকে! দিনের বেলা, এত মানুষ জনের মধ্যে নিশ্চয়ই গুরুং-এর শত্রুরা তার ওপর প্রতিশোধ নিতে আসবে না।

জনা চারেক খাকি পোশাক পরা লোক কাছে এসে ওমিকে ঘিরে দাঁড়ালো। একজনের হাতে একটা বন্দুক, অন্যদের হাতে লাঠি। তাদের একজন খপ করে ওমির হাত চেপে ধরে স্থানীয় ভাষায় বললো, পালাচ্ছিস কোথায়?

ওমি শুকনো গলায় বললো, আমি তো পালাইনি। আমি যাচ্ছি।

যার হাতে বন্দুক, সে ইংরিজিতে বললো, অ্যানাদার ফরেনার!

অন্যান্য হাটের যাত্রীরা ফিরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখলো, কেউ কোনো মন্তব্য করলো না।

বন্দুকধারীটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই মেয়েছেলেটি কি তোমাদের গ্রামের লোক ?

তবু তারা কেউ উত্তর দিল না।

একজন লাঠিদারী পুলিশ বললো, এই বেটী জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। স্মাগলারদের সাহায্য করে !

একটা দড়ি দিয়ে ওমির হাত বেঁধে ওরা নিয়ে গেল টানতে টানতে।

অনেকটা পথ হাঁটিয়ে এনে, লোকালয়ের মধ্যে একটা বাড়ির গুদাম ঘরের মধ্যে তারা ঠেলে ফেলে দিল ওমিকে।

ওমি দেখলো, সেখানে আরও প্রায় পনেরো কুড়ি জন মানুষ রয়েছে। তার মধ্যে তার প্রতিবেশী, সেই ঝোপড়ি ঘর দুটোর লোকজনেরাও। এমনকি বাচ্চাদেরও ধরে আনা হয়েছে। লোক-গুলোর মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের যে কী অপরাধ, তা তারা এখনো জানে না।

তারপর সারাদিন কেউ তাদের খোঁজখবর নিতে এলো না। ভয় কিংবা খিদের জ্বালায় বাচ্চারা এবং তাদের মায়েরা কাঁদতে আরম্ভ করলো একসময়। দাড়িওয়ালা একজন বয়স্ক পুরুষ বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগলো, ও বাবুরা, একটু পানি দাও ! মরে গেলাম একটু পানি দাও !

সন্ধের সময় খুলে গেল সেই বন্ধ দরজা। একজন খাকি পোশাক পরা পুলিশ দুটি বালতি হাতে নিয়ে ঢুকলো। একটাতে রয়েছে কয়েক ডজন চাপাটি, আর একটিতে ডাল। বালতি দুটি নামিয়ে রেখে সে হেঁকে বললো, ভাগ করে খেয়ে নাও ! কেউ দুটোর বেশি খাবে না !

দাড়িওয়ালা লম্বা লোকটি খ্যাসখেসে গলায় বললো, পানি ! ও কত্তা, একটু পানি দ্যান !

পুলিশটি ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে পেছন দিকের একটা দরজার তালা খুলে দিল। সেখানে একটি বাথরুম।

কয়েকজন ছুটে গেল জল খেতে, কয়েকজন ডাল-চাপাটির জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

ওমি শুধু উঠলো না ! সারাদিন সে একটুও কাঁদেনি। শুকনো

চোখে সে বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। তার নিয়তি এবার তাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সে শুধু সেই কথাই ভাবছে!

॥ ৮ ॥

এর পরের অংশটুকু একজন বিচারকের দৃষ্টিকোণ থেকেই শোনা যাক।

অবনীভূষণ মিশ্র ওড়িশার হাইকোর্ট থেকে রিটায়ার করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। রিটায়ার করার ঠিক আগে একবার হার্টের অসুখে শরীর ভেঙে গিয়েছিল, নার্সিং হোমে থাকতে হয়েছিল বেশ কিছুদিন। তারপর থেকে ভালোই আছেন, খাওয়া-দাওয়া-ঘুম বিষয়ে ডাক্তারদের নির্দেশ কঠোরভাবে মেনে চলেন। তাঁর পারিবারিক ডাক্তার বলেছেন, এইভাবে চললে তিনি আরও কুড়ি-পঁচিশ বছর সুস্থভাবে বাঁচতে পারবেন অনায়াসে।

কিন্তু মুস্কিল হলো অন্যদিক থেকে। তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য ছিল অটুট, কখনো বড় রকমের রোগ ভোগ হয়নি, অথচ তিনিই হঠাৎ মারা গেলেন মাত্র একদিনের জ্বরে। কী যে রোগ হয়েছিল ধরাই গেল না। ডাক্তাররা বললেন, ভাইরাস অ্যাটাক!

বিচারপতি অবনীভূষণ মিশ্র তার মাস ছয়েক আগে রিটায়ার করেছেন। সঞ্চিত অর্থ দিয়ে তিনি একটি নিজস্ব বাড়ি বানাচ্ছিলেন বালেশ্বর শহরে, এই বাড়ির ব্যাপারে তাঁর স্ত্রী হেমলতার খুব শখ ছিল. তিনিই সব কিছু করছিলেন, অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় সেই বাড়ি রেখে তিনি মিলিয়ে গেলেন মহাশূন্যে।

তখন একবারে ভেঙে পড়েছিলেন অবনীভূষণ। হেমলতাকে বাদ দিয়ে তাঁর বেঁচে থাকার কোনো অর্থই খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁদের কোনো সন্তানও হয়নি, এই পৃথিবীতে অবনীভূষণ হয়ে পড়লেন একেবারে নিঃসঙ্গ।

হাইকোর্টের জজ থাকার সময় অনেক মানুষ আসতো, অনেক খাতির করতো, অনেকেই নির্লজ্জ তোষামোদ করতো, কিন্তু সে সবই তাঁর ক্ষমতার জন্য। ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে তিনি সরে আসতেই সেইসব তোষামুদের দল আস্তে আস্তে সরে পড়লো।

তারপর আর অবনীভূষণের সময় কাটে না। বাড়িটা তৈরি হলো শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সেই বাড়িতে তিনি একা। কয়েকজন আত্মীয় স্বজন সেখানে ভিড় জমাতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের ব্যবহারে উগ্র স্বার্থের গন্ধ পেয়ে অবনীভূষণ তাদের কারুকেই থাকতে দেননি নিজের বাড়িতে।

রিটায়ার করার পর পড়াশুনো নিয়ে থাকবেন, বই লিখবেন, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। আগে আদালতের কাজ নিয়ে ও অনুরাগীদের সমাগমে সবসময়ে ব্যস্ত থাকতেন, বই পড়ার সময় পেতেন না। কিন্তু হাতে যখন অঢেল সময়, সারাদিনে কিছুই করবার নেই, তখন আর সর্বক্ষণ বই পড়তেও ইচ্ছে করে না।

দিনের পর দিন মন-মরা অবস্থায় থাকতে থাকতে তাঁর আবার শরীর খারাপ হতে লাগলো।

তাঁর বন্ধু গৃহচিকিৎসক বললেন, কিছু একটা কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখা দরকার। কাজই তো মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা দেয়!

অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা অনেক ট্রাইবুনালের মেম্বার হন, অনেক তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান হয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন। অবনীভূষণের সেসব কাজ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তাঁর টাকা পয়সার আর প্রয়োজন নেই। দু একটা ট্রাইবুনালে যোগ দিয়েও তাঁর মন টেকেনি।

এই সময়ে খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন তাঁর চোখে পড়লো।

আসাম সরকার একটা বিশেষ কাজে কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে নিয়োগ করতে চান। মাইনে ভালো, অনেক সুযোগ সুবিধেও আছে, কিন্তু থাকতে হবে সীমান্তের নির্জন এলাকায়। বিজ্ঞাপনটি দেখে ঝোঁকের মাথায় অবনীভূষণ দরখাস্ত করে দিলেন।

তিনি আসামে কখনো যাননি। আগে তাঁর বেড়াবার বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এখন তিনি ভাবলেন, এই কাজটা নিলে নতুন নতুন জায়গাও দেখা হবে, কিছুটা কাজের মধ্যে ডুবে থাকাও যাবে। অচেনা মানুষ জনের মধ্যে থাকলে তাঁর ভালো লাগতেও পারে।

নিয়োগ পত্র পেয়ে তিনি চলে এলেন গৌহাটি।

আসাম সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের চুক্তি অনুযায়ী কাজ

চলছে বিদেশী বিতাড়নের। ছিয়াত্তর সালের পর যারা আসামে এসেছে তাদের খুঁজে বার করা হচ্ছে। যারা তার আগে এসেছে, এমনকি দু এক পুরুষ ধরে আছে, তারাও ঠিক মতন পরিচয় পত্র দিতে না পেরে নাজেহাল হচ্ছে প্রায়ই। কেন্দ্ররাজ্য চুক্তির একটা শর্ত এই যে অভিযুক্তদের একটি ট্রাইবুনালের সামনে আনতে হবে, যার মধ্যে একজন বিচারক থাকবেন, যিনি অসমীয়া নন। একতরফা বিচার যাতে না হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

গৌহাটি পেঁছোবার পর অবনীভূষণকে একটা সুন্দর ডাকবাংলো দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে একটি সর্বক্ষণের জন্য ড্রাইভার সমেত গাড়ি। সরকার থেকে তাঁকে বলা হলো, তিনি গৌহাটিতে থেকে আরাম করুন, মাঝে মাঝে তাঁর কাছে কাগজপত্র এনে দেওয়া হবে, তিনি সই করে দিলেই চলবে।

কয়েক সপ্তাহ কাটাবার পর অবনীভূষণ অনুভব করলেন যে কাজটা যেন ঠিক হচ্ছে না। চাকরি-জীবনে তিনি সবসময় বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী চলেছেন, তাঁর নামে কেউ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ দিতে পারেনি। কিন্তু এখানে তিনি মানুষগুলোকে না দেখে, তাদের বক্তব্য না শুনেই রায় দিয়ে দিচ্ছেন।

একজন ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে সেই ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, এইসব লোক বেশিরভাগই ধরা পড়ে সীমান্ত এলাকায়, পাহাড়-জঙ্গলে সেখান থেকে তাদের এতদূর গৌহাটি পর্যন্ত আনার কোনো মানে হয় না। ঐসব জায়গা থেকেই তাদের বিতাড়িত করা সুবিধে।

অবনীভূষণ বললেন, তাহলে আমাদেরই তো উচিত সেই রকম কোনো জায়গায় আদালত বসানো।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, সেসব জায়গায় আপনি বেশিদিন থাকতে পারবেন না। জোঁক আর মশা মাছির উৎপাত লেগেই আছে, সারা বছরই প্রায় বৃষ্টি হয়, থাকবার ভালো ব্যবস্থাও নেই।

অবনীভূষণ তবু জেদ ধরলেন, তিনি মানুষ-জনের কথা না শুনে তাদের বিরুদ্ধে কোনো রায় দিতে পারবেন না। তিনি ঐসব সীমান্ত এলাকায় ঘুরতে রাজী আছেন।

তখন সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে পাঠানো হলো এমনই একটা

জায়গায়, যেখানে সত্যিই থাকা-খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা নেই, কাজও বিশেষ নেই।

গৌহাটি থেকে বহু দূরে, অনেকগুলো পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি চলে এলেন উত্তর কাছাড়ের হাফলং-এ। জঙ্গল ঘেরা পাহাড়ের ওপর সুন্দর ছোট্ট একটি শহর। নিরিবিলি, শান্ত। কয়েকটি মাত্র সরকারি অফিস, দু তিনটি হোটেল। মাঝে মাঝে টুরিস্টরা আসে।

অবনীভূষণ এখানে আলাদা কোনো বাড়ি পেলেন না। মহকুমা হাকিম জানালেন যে নতুন কিছু সরকারি কোয়ার্টার তৈরি হচ্ছে, সেগুলি শেষ হলে তারপর তাঁকে বাড়ি দেওয়া হবে। আপাতত তাঁকে দেওয়া হলো সারকিট হাউজের একটি ঘর।

ছোট্ট একটি টিলার ওপরে এই সারকিট হাউজ, সাহেবী আমলে বানানো। এখান থেকে চতুর্দিকে অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়। সাহেবরা খুঁজে খুঁজে এই রকম জায়গা বার করতো, এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, দুটোই খুব বর্ণাঢ্য।

প্রথম প্রথম অবনীভূষণ মুগ্ধ হয়ে সেই দৃশ্য দেখতেন, তারপর তাঁর একঘেয়েমি এসে গেল। এখানে প্রায় কোনোই কাজ নেই। প্রায় দিনই সারকিট হাউজের অন্য ঘরগুলো খালি থাকে, সারা দিনে কোনো লোকের মুখই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে সরকারি কর্মচারিরা গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন, রাত না কাটিয়েই ফিরে যান আবার। এখানকার খাওয়া-দাওয়াও সুবিধের নয়। তরি-তরকারি প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। ডালের খুব দাম! সারকিট হাউজের রান্না মানে শুধু মুরগীর ঝোল আর রুটি কিংবা ভাত। সেদ্ধ চাল পাওয়া যায় না, আলো চালে তেমন যেন স্বাদ নেই। অবনীভূষণ শাক-সবজি ভালোবাসেন, সেসব এখানে দেখতে পাওয়াই যায় না প্রায়।

খাবারের স্বাদ ঠিক মতন না পেলে কি আর শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে মন ভরে?

মাঝে মাঝে তিনি হাঁটতে বেরোন। ডাক্তাররা তাঁকে দিনে দু'তিন মাইল হাটতে বলেছেন, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা যেমন বারণ, তেমন পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই। কিন্তু এখানে তো সমতল

রাস্তা প্রায় নেই-ই বলতে গেলে। বাংলোটা টিলার ওপরে, কোনো জায়গায় যেতে গেলেই উঁচু নিচুতে ওঠা-নামা করতে হবে।

সেসব করেও তাঁর স্বাস্থ্যটি বেশ ভালোই হতে লাগলো দিন দিন। আবহাওয়া সুন্দর। গরম একেবারেই নেই, মাঝে মাঝে ঝেঁপে ঝেঁপে বৃষ্টি আসে, কিন্তু সে বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। কখনো কখনো পুরো সারকিট হাউজটাই ঢেকে যায় মেঘে, আবার একটু পরেই ঝকঝকে রোদ ওঠে।

একদিন তিনি মহকুমা হাকিমের কাছে গিয়ে বললেন, আমাকে যে এখানে পাঠানো হলো, কাজ কই?

মহকুমা হাকিম তাঁর চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট, তিনি সম্ভ্রম করে করে বললেন, স্যার, আপনি কাজের জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমাদের দেশে এসেছেন, কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিন।

অবনীভূষণ বললেন, কিছু কাজ করবো না, বসে বসে মাইনে নেবো, সেটা কি ঠিক? আমার মন খচখচ করে। আমার অফিস কোথায় হবে, সেটাই তো এখনো ঠিক হলো না!

হাকিম বললেন, ধরে নিন, ঐ সারকিট হাউজই আপনার অফিস।

অবনীভূষণ বললেন, ধরে নেবো মানে? সেখানে তো কোনো লোকই আসে না। আমি সারাদিন চুপ করে বসে থাকি। কথা বলার জন্যেও একটা মানুষ পাই না।

হাকিম বললেন, কাল থেকে একজন আর্দালি পাঠিয়ে দেবো।

অবনীভূষণ এবার খানিকটা কড়া হয়ে বললেন, আর্দালি পাঠাবার কথা বলছি না। সরকার আমাকে যে কাজের জন্য এনেছে, আমি সেই ডিউটি পুরোপুরি ডিসচার্জ করতে চাই। আপনাদের আসামে ফরেনারের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকলে আপনাদেরই তো ক্ষতি! এদের ডিটেক্ট করে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। সে কাজ ফেলে রাখছেন কেন? কাজ শুরু না হলে আমি সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য হবো!

অবনীভূষণের ধমকে খানিকটা কাজ হলো। কয়েকদিন পর থেকে পুলিশ দলে দলে লোক ধরে আনতে লাগলো তাঁর কাছে।

অবনীভূষণের মতন একজন কর্তব্যপরায়ণ বিচারকের জন্যই ওমির মতন একটি নির্জন সংসার ভেঙে গেল।

যাদের ধরে আনা হয়, তাদের প্রত্যেককে জেরা করেন অবনীভূষণ নিজে। আসাম সরকারের একজন অফিসারও থাকেন তাঁর সঙ্গে। অফিসারটির নাম অনন্ত দাস। প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর সঙ্গে অবনীভূষণের মতের মিল হয় না।

এই অঞ্চলে কাছাড়ি জাতিরই বাস। বাইরে থেকে জীবিকা সূত্রে আরও অনেক মানুষ এসেছে, তাদের মধ্যে আছে বাঙালী, বিহারী, নেপালী, বার্মিজ। বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। দেশ বিভাগের আগে থেকেই বহু বাঙালী এসেছে আসামে, দেশ বিভাগের পরে দলে দলে যে যেখানে পারে আশ্রয় নিয়েছে, সেই স্রোত এখনো পুরোপুরি থামেনি। বাংলাদেশে হঠাৎ বড় রকমের কোনো গোলমাল হলে অনেকে এদিকে চলে আসে, ওদিকে খাদ্যাভাব হলেও এদিকে খাদ্যের সন্ধানে আসে মানুষ, কেউ কেউ আবার ফিরে যায়, অনেকে কোনোরকমে রাস্তার ধারে কিংবা নদীর চরে কিংবা বনে-জঙ্গলে ঝোপড়ি বানিয়ে থেকে যায়।

এতবড় সীমান্ত ঠিকঠাক পাহারা দেবার ব্যবস্থা নেই। যেখানে সীমান্ত রক্ষীরা আছে, তারাও সাধারণ চাকুরিজীবী মানুষ, পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা অতিরিক্ত উপার্জন হলে তারা আইনের ব্যাপারে চোখ বুঁজে থাকে।

এখানে এসে অবনীভূষণ ইতিহাসের একটি প্রাচীন ধারা যেন জলজ্যান্ত ভাবে প্রত্যক্ষ করলেন। মানুষ চিরকালই যাযাবর প্রাণী। এক জায়গায় খাদ্য ফুরিয়ে গেলে মানুষ খাদ্য আশ্রয়ের সন্ধানে দল বেঁধে গেছে অন্য জায়গায়। মানুষ গ্রাম কিংবা শহর গড়েছে কিন্তু সেখানে রোগের উপদ্রব কিংবা প্রকৃতির তাণ্ডব দেখা দিলে সেইসব গ্রাম নগর পরিত্যাগ করে মানুষ অন্য কোনোখানে গিয়ে আবার বসতি গড়েছে! ইতিহাসে এরকম কত পরিত্যক্ত নগরীর সন্ধান পাওয়া যায়।

এখনও তো মানুষ চাকরী কিংবা জীবিকার খোঁজে দূর দূর দেশে চলে যায়। মা-বাবাকে ছেড়ে সন্তানেরা অন্য কোনো দেশে গিয়ে সংসার বানায়।

পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ এখনো সারাটা দিন শুধু কাটায় গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায়। সেটুকুও যখন জোটে না, তখন মরিয়া হয়ে তারা অন্য কোথাও যাবেই। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বেড়া নিয়ে মানুষকে বেঁধে রাখার চেষ্টা চলেছে।

অবনীভূষণ সারা জীবন অনেক খুন-জখম, ধর্ষণ, সম্পত্তি গ্রাস, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া ইত্যাদি বহু রকমের মামলার রায় দিয়েছেন। কিন্তু হাজার হাজার ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষ যাদের শুধু কোনোক্রমে একটু অন্ন সংগ্রহ আর মাথা গোঁজার জায়গা রাখার অধিকার দেওয়া হবে কিনা সেই বিচার করতে গিয়ে তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। কোন আইনে তিনি এদের বিচার করবেন। মানবতাকে বাদ দিয়ে কি আইন হতে পারে?

বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে, তাদের মধ্যে হিন্দুও আছে, মুসলমানও আছে। নিজেদের ঘর বাড়ি ছেড়ে এরা চলে আসে নিশ্চিত ক্ষুধার তাড়নায় আর নিরাপত্তার লোভে! এদের মধ্যে হিন্দুদের রেখে মুসলমানদের ঠেলে ফেরৎ পাঠাতে হবে। ক্ষুধার্তের আর ধর্ম কী?

হিন্দু বাঙালীদেরও আবার আসামে রাখা চলবে না। অসমীয়াদের চোখে তারাও বিদেশী। তাদের তাড়ানো হবে কোথায়? আবার বাংলাদেশে? অথচ নেপাল থেকে যারা আসে, তাদের ফেরৎ পাঠাবার কোনো প্রশ্নই নেই। নেপালের অধিবাসীরা যতদিন খুশী ভারতেব যে-কোনো জায়গায় এসে থাকতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশীরা পারবে না। বার্মা থেকে সীমান্ত পেরিয়ে যারা আসে, তারা পাহাড়ী উপজাতিদের মধ্যে মিশে যায়, তাদের ধরবার উপায় নেই।

অনন্ত দাসের সঙ্গে এই সব প্রশ্ন নিয়ে অবনীভূষণের তর্ক হয়।

অনন্ত দাস মানুষটি বেশ বুদ্ধিমান, তিনি মাত্র কয়েক মাস আগে তেজপুর থেকে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। কাজে খুব উৎসাহ আছে। এখানে ভালো কাজ দেখাতে পারলে তিনি খুব তাড়াতাড়ি গৌহাটিতে বদলি হতে পারবেন, এই আশা আছে।

তিনি অবনীভূষণের কথা শুনে বললেন, স্যার, আপনার কথা আমি মেনে নিচ্ছি। এই লোকগুলো অধিকাংশই গরিব। বাংলাদেশ

থেকে এখন যারা আসছে কিংবা গত দশ-পনেরো বছর ধরে যারা এসেছে, তারা খাদ্যের সন্ধানে, এখানে কোনো একটা কাজ জুটিয়ে নেবার আশায় কিংবা চাষের জমির লোভে দলে দলে আসছে। কিন্তু এই সব গরিবদের সমস্যা মেটাবার ভার অসমীয়ারা নেবে কেন? আমাদের নিজেদের মধ্যেই কি গরিব কিছু কম আছে?

অবনীভূষণ বললেন, গরিবরা আবার আমাদের-তোমাদের কী? চোখের সামনে যদি দেখি একটা লোক না খেতে পেয়ে ধুঁকছে. তা হলে কি তাকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি বাঙালী না অসমীয়া তা আগে বলো? কিংবা তুমি হিন্দু না মুসলমান? এইসব জেনে শুনে তারপর তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবো?

অনন্ত দাস বললেন, স্যার একজন ইনডিভিজুয়ালের বিবেকের সঙ্গে একটা রাষ্ট্র কিংবা সরকারের কর্তব্যের বোধহয় তুলনা দেওয়া যায় না। আমার বাড়ির সামনে যদি কেউ দুটি খাদ্যের জন্য হাত পাতে আমি কিছু না কিজ্ঞেস করেই তাকে সাহায্য করবো। কিন্তু যদি এরকম লক্ষ লক্ষ গরিব লোক আসতে শুরু করে, তাহলে আসাম সরকারের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমি নিশ্চয়ই ভাববো যে এইসব বহিরাগত গরিবদের আশ্রয় দিলে আমাদের নিজেদের লোকেরা আরও গরিব হয়ে যাবে। তা ছাড়া এর আরও একটা দিক আছে। সেটা আপনি মোটেই ভেবে দেখছেন না স্যার।

—কোন দিকটা?

—এই রকম ভাবে যদি লাখ লাখ বাঙালী এসে আমাদের আসামে সেট্‌ল করে, তাহলে এই রাজ্যে একদিন বাঙালীর সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে যাবে না? আমাদের ভাষা, আমাদের কালচার মুছে যাবে। দেখুন না, পাশের রাজ্য ত্রিপুরায় কী হয়েছে! আজ সেখানে বাঙালীদের এমনই আধিপত্য যে সেখানকার পুরোনো অধি-বাসীদের সব পরিচয় চাপা পড়ে গেছে। ত্রিপুরা এখন তো একটা বাঙালীদেরই রাজ্য!

—আপনারা অসমীয়া, আপনাদের ভাষা আর কালচারের সঙ্গে বাঙালীদের তো খুব একটা তফাৎ নেই। এক সঙ্গে মিলে মিশে থাকলেই হয়!

—হুঃ, আপনি এই কথা বলছেন স্যার! আপনাদের ওড়িশার

লোকদের সঙ্গেও তো বাঙালীদের ভাষা কিংবা কালচারের খুব একটা তফাৎ নেই। বাঙালীদের সঙ্গে আপনাদের বেশ ভাব আছে। কিন্তু এখন যদি কয়েক কোটি বাঙালী ওড়িশায় গিয়ে ঘর-বাড়ি বানিয়ে থেকে যেতে চায়, আপনারা তা মেনে নেবেন? আপনাদের সরকার রাজি হবে?

—তা বোধহয় রাজি হবে না।

—বোধহয় কেন, নিশ্চিত রাজি হবে না। বাঙালীদের সংখ্যা অ্যালার্মিং ভাবে বাড়তে শুরু করলে ওড়িশাতেও দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে।

—কিন্তু মিঃ দাস, আপনাদের কেসটা বোধহয় একটু আলাদা। আপনাদের এখানে দাস-ভট্টাচার্যি-দত্ত এইসব পদবীর অনেক লোক দেখছি, বাঙালীদের মধ্যেও আছে এই পদবী। আপনারা তো মাত্র কয়েক পুরুষ আগে আসাম এসে সেট্‌ল করেছেন। কয়েক শো বছরের মোটে তফাৎ। আসাম রাজ্যটা তো ছিল আসলে পাহাড়ী, আদিবাসীদের। আপনারাও বহিরাগত, বাঙালীরাও বহিরাগত।

—আপনার এ যুক্তিটাও ঠিক মানতে পারছি না স্যার। মানুষ ইতিহাস নিয়ে বাঁচে না, বর্তমান নিয়ে বাঁচে। কে কবে এসেছে, সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। বর্তমানে যারা অসমীয়া ভাষা বলে তারাই অসমীয়া জাতি। ভাষার ভিত্তিতেই ইণ্ডিয়ার রাজ্যগুলি ভাগ করা হয়েছে না? আপনাদের ওড়িশায় আদিবাসী নেই? কোনো এক সময় আপনাদের মতন বাইরের লোকেরা গিয়েই আদিবাসীদের ওপর রাজত্ব করেছে। সে সব কথা এখন আর তুলে লাভ কী? এখন আপনারা যেমন ওড়িয়া ভাষা কিংবা কালচার বাঙালীদের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে রাজি হবেন না, তেমনি আমরা অসমীয়ারাই বা রাজি হবো কেন?

অবনীভূষণ আর যুক্তি না খুঁজে পেয়ে চুপ করে যান।

অনন্ত দাস সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি হাসতে থাকেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবনীভূষণ বললেন, এখানে এসে আমার এক একসময় কী মনে হয় জানেন, মিঃ দাস? আমরা অসমীয়া, বাঙালী আর ওড়িয়ারা যদি এক হয়ে যেতে পারতাম, আমাদের ভাষা আর সংস্কৃতি মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে নিতে

পারতাম, তা হলে আমরা পূর্ব ভারতে একটা শক্তিশালী জাতি হতে পারতাম, কেন্দ্রীয় সরকারে আমাদের ক্ষমতা অনেক বেশি হতো!

অনন্ত দাস বললেন, এ চিন্তাটা আকাশ-কুসুমের মতন। এরকম মিল কোনোদিনই হবে না। আমরা বা আপনারা, আমাদের আলাদা আইডেনটিটি কোনোদিনই ছাড়বো না। তা ছাড়া, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, বাঙালীদের মধ্যে একটা উন্নাসিকতার ভাব আছে, সেটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

অবনীভূষণের মনটা খুঁত খুঁত করে। চাকরি জীবনে তিনিও উন্নাসিক বাঙালী দেখেছেন বেশ কিছু। যারা নিজেদের সব ব্যাপারে বড় মনে করে। আবার কিছু কিছু মার্জিত উদার মানুষও দেখেছেন। কিন্তু সে সব তো ভদ্রলোক শ্রেণী, তারাই বাঙালী সমাজের মিশ্রিত প্রতিভূ। কিন্তু এই যে গরিবের দল যারা অন্য কোনো ভাষা জানে না বলে বাংলায় কথা বলে, এদের মধ্যে আর বাঙালীত্ব কী আছে?

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, কিন্তু এই সব লোকগুলোকে বাংলাদেশে ঠেলে ফেরৎ পাঠাতে গেলে বাংলাদেশ সরকার নেবে কেন? তারা যদি দায়িত্ব অস্বীকার করে? তারা যদি বলে ইণ্ডিয়া থেকেই লোকজন ঢুকছে বাংলাদেশে?

অনন্ত দাস বললেন, সে ব্যাপার ভারত সরকার বুঝবে! সে দায়িত্ব সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্টের। বাংলাদেশ ওদের ফেরৎ নিতে না চায়, ওরা পশ্চিম বাংলায় যাক, বিহারে যাক কিংবা নাগাল্যাণ্ডে ঢুকুক, যেখানে খুশী যাক, মোট কথা, আসামে এদের স্থান হবে না।

—কিন্তু আমি কী দেখছি জানেন? একটা দলকে ডিপোর্টেসান অর্ডার দিয়ে ফেরৎ পাঠানো হলো, সাতদিন দশদিন বাদে সেই দলটাকেই পুলিশ আবার ধরে আনছে। তার মানে ওরা একবার বর্ডারের ওপাশে গিয়ে আবার কয়েকদিন পরেই লুকিয়ে অন্য জায়গা দিয়ে আসামে ঢুকছে। এতে লাভ হচ্ছে কী? আসাম সরকারের শুধু শুধু খরচ বাড়ছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

এবার অনন্ত দাসের দীর্ঘশ্বাস ফেলার পালা।

তিনি আফশোসের সুরে বললেন, সেটা কি আমিও জানি না

ভাবছেন ? একই লোক ফিরে আসছে নাম ভাঁড়িয়ে। যেখানে দু'-দেশের মধ্যে এমন সফ্‌ট বর্ডার, সেখানে এমন ভাবে লোক তাড়ানো প্রাকটিক্যালি সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের তো চাকরি বাঁচাতে হবে। কাগজে-কলমে আমরা দেখাচ্ছি যে কত লোক বিতাড়ন করা হলো। এই এরিয়ায় আমাদের কোটা পঁচিশ হাজার, তা প্রায় ফুলফিল্‌ড হয়ে এসেছে। অথচ আমি জানি, এক হাজার জনও শেষপর্যন্ত আসাম ছেড়ে যায়নি।

—কাঁটা তারের বেড়া দিয়েও কি কিছু লাভ হবে ? ক্ষুধার্ত মানুষ, অসহায় মানুষ সেই কাঁটা তারের বেড়া ডিঙ্গিয়েও আসবে না ?

—কাঁটা তারের বেড়া যারা লাগাবে, সেই কন্ট্রাকটারদের প্রচুর লাভ হবে। তারাই বেড়া ছিঁড়ে দেবে, আবার লাগাবে এই ভাবেই চলবে।

অবনীভূষণ ও অনন্ত দাস একদিন এইসব আলোচনা করছিলেন, এমন সময় একজন পুলিশ এসে খবর দিল যে 'ফরেনার' বলে যাদের ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে একটি যুবতী মেয়ে তিনদিন ধরে কিছু খাচ্ছে না। সে এক ফোঁটা জলও মুখে দেয়নি নাকি। তার সঙ্গে অন্য যাদের ধরা হয়েছিল, তারা কেউ এ মেয়েটিকে চেনে না, তার সঙ্গে আর কে ছিল তাও কেউ জানে না। হাজার প্রশ্ন করলেও মেয়েটি কেনো কথার উত্তর দেয় না।

অনন্ত দাস শুনেই বললেন, নিশ্চয়ই রেপ কেস ! এখানে ওরকম আকছার হচ্ছে। রেপ-এর পর অনেক মেয়ে পাগল হয়ে যায় !

অবনীভূষণ পুলিশটিকে ধমক দিয়ে বললেন, তিন দিন ধরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে, তবু তাকে আমাদের সামনে একবারও আনা হয়নি কেন ?

পুলিশটি একটু বাদে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে ওমিকে নিয়ে এলো বিচারকের সামনে।

ওমির পরনে একটা সস্তা ডুরে শাড়ি, খোলা চুলে অনেক ধুলো জমেছে, শীর্ণ হয়ে গেছে মুখখানা, শুধু জ্বল জ্বল করছে চোখ দুটি।

অবনীভূষণ কোমল গলায় বললেন, বসো।

সার্কিট হাউজের সামনের বাগানে কয়েকটা চেয়ার আর বেঞ্চ পেতে ট্রাইবুনাল বসে। বিকেল হয়ে এসেছে। পাহাড়ের ওপাশে সদ্য মিলিয়ে যাচ্ছে সূর্য। এখনও কিছুক্ষণ আকাশে একটা আলোর আভা থাকবে।

অবনীভূষণের কথা শুনে ওমি একটা টুলে বসলো।

অবনীভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

ওমি দু'দিকে মাথা নাড়লো, কোনো শব্দ করলো না মুখ দিয়ে।

অবনীভূষণ আবার বললেন, বেশ তো বোঝা গেল যে তোমার কোনো নাম নেই। তুমি কিছু খেতে চাইছ না কেন? তোমার খিদে পায় না?

ওমি একই রকম ভাবে মাথা নাড়লো আবার।

অবনীভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, বেশ, তোমার খিদেও পায় না বোঝা গেল। কিন্তু তুমি কোনো কথা বলছো না কেন? তুমি কি বোবা? তোমার ভয় নেই। তোমার বাড়ি কোথায় ছিল?

ওমি এবারেও কিছু বললো না।

অবনীভূষণ অনন্ত দাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনার কি মনে হয় মেয়েটি বোবা? যদি বোবাই হয়, তাহলে ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনে এর স্থান কোথায় হবে?

অবনীভূষণের গলায় একটু ঠাট্টার সুর ছিল, তাই অনন্ত দাস ও ঠাট্টার ভঙ্গিতে বললেন, বোবাদের বাপ-মা থাকে, তারা এমনি এমনি জন্মায় না। তা ছাড়া ও বোবা কিনা তা ওর হাতে একটা আলপিন ফুটিয়ে দিলেই বোঝা যাবে।

যে-পুলিশটি ওমিকে নিয়ে এসেছে, সে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। সে বললো, স্যার, ওকে দু'একটা চড়-চাপড় মেরে দেখা হয়েছে, তাও কোনো শব্দ করে না!

অনন্ত দাস বললেন, তাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে ও বোবা নয়। বোবারাও মার খেলে শব্দ করে কাঁদে।

অবনীভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, ও সত্যিই কিছু খায়নি?

পুলিশটি বললো, স্যার, এক ফোঁটা জল পর্যন্ত খায়নি।

অবনীভূষণ অনন্ত দাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, মহাত্মা গান্ধী জেলখানায় অনশন করলে ব্রিটিশরাও তাকে ছেড়ে দিত। একে আমরা কী করবো ?

অনন্ত দাস বললেন, আপনার ইচ্ছে হলে ওকে ছেড়ে দিতে পারেন। এ রকম একটা-আধটা কেস নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।

অবনীভূষণ বললেন, কিন্তু ও কেন চুপ করে আছে, কেন কিছু খাচ্ছে না ? ওকে এখন একা-একা ছেড়ে দিলে ও আরও বেশি বিপদে পড়বে না ? সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়।

অনন্ত দাস বললেন, এরকম বিপন্ন মেয়ে তো আমাদের দেশে কম নেই। তাদের ক'জনের দায়িত্ব আমরা নিতে পারি ?

অবনীভূষণ পুলিশটিকে বললেন, আজকের রাতটার মতন ওকে যেখানে রেখেছিলে, সেখানেই রাখো। ওকে খাবার দিও ! তারপর কাল সকালে দেখা যাবে।

পুলিশটি ওমিকে নিয়ে চলে গেল। অনন্ত দাসও বিদায় নিলেন।

অবনীভূষণ বাগানে পায়চারি করলেন খানিকক্ষণ। এক কাপ চা খেলেন তারপর নিজের ঘরে গিয়ে বই পড়তে লাগলেন।

এখানে আলোর জোর খুব কম। অবনীভূষণের চোখে প্রায় নতুন চশমা, তবু তিনি ঝাপসা দেখেন। বাইরে নিস্তব্ধতা ঝিমঝিম করছে। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি !

ঠিক সাড়ে আটটার সময় বাংলোর চৌকিদার এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, স্যার খাবার দেবো ?

অবনীভূষণ উঠে বাথরুমে উঠে গিয়ে চোখে ভালো করে জলের ঝাপটা দিলেন। রিটায়ার করার আগে কোনোদিন রাত একটা-দেড়টার আগে তিনি ঘুমোতে যেতেন না। বালাশোরের বাড়িতে অন্তত বারোটা পর্যন্ত জেগে বই পড়তেন। এখানে সন্ধের পর থেকেই ঘুম পায়। আর তো কিছু করারও নেই।

চৌকিদার তাঁর ঘরেই খাবার এনে দেয়। সে টেবিলে সব কিছু সাজিয়ে দিল। আজও ভাত, ছোলার ডাল, খানিকটা পেঁপের তরকারি আর মুর্গীর মাংস। মুর্গী খেতে তাঁর অভক্তি জন্মে গেছে ! তবে ছোলার ডালটা তাঁর পছন্দ।

চেয়ারে বসে ভাতে হাত দিতে দিতে গিয়েই তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো দুটি জ্বলজ্বলে চোখ!

ঐ বোবা মেয়েটি তিনদিন না খেয়ে আছে। জলও স্পর্শ করেনি। কেন? রাগ না অভিমান? পুলিশের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে রাগ বা অভিমান করেও কি কোনো লাভ আছে? মেয়েটা কেঁদে-কেটে দয়া চাইলে বরং কিছু কাজ হতে পারতো। যুবতী মেয়েদের অনেকেই দয়া করে?

হঠাৎ অবনীভূষণের পেটটা গুলিয়ে উঠলো।

হাত সরিয়ে নিয়ে তিনি চৌকিদারকে বললেন, একবার থানায় যাও তো! পুলিশদের জিজ্ঞেস করবে, যে-মেয়েটি তিনদিন ধরে উপোস করে ছিল, সে কি কিছু খেয়েছে? যদি না খেয়ে থাকে তাহলে একজন পুলিশকে বলো, তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসতে।

চৌকিদারটি খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বললো, এখন মেয়েটাকে নিয়ে আসবে স্যার? এই রাত্তিরে? বাংলোতে?

অবনীভূষণ তার চোখের দিকে তাকালেন। তাঁর এই কথার অন্য একটি অর্থ হতে পারে। রাত্তিরবেলা তিনি একটি যুবতী মেয়েকে নির্জন সারকিট হাউজে পাঠাতে বলছেন! এ দেশের মানুষ এই নিয়ে অনেক মুখরোচক গল্প বানাবে!

একটু দ্বিধা করে তিনি বললেন, হ্যাঁ, ডেকে আনো, আমি বাইরে বসছি।

তিনি উঠে এলেন বারান্দায়। আজকের বাতাস খুব মনোরম। অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে, সামনের পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে। নীচের উপত্যকায় কে যেন বাজাচ্ছে বাঁশী। হয়তো উৎসব হচ্ছে কোনো বাড়িতে।

চৌকিদার ফিরে এলো কুড়ি মিনিটের মধ্যে। অবনীভূষণ এর মধ্যে তাঁর খাবারের বাটিগুলো নিয়ে এসেছেন বাইরের টেবিলে। আর একটি প্লেট ও কয়েকটা বাটি কিচেন থেকে এনে তিনি সব খাবার দুটি ভাগে সাজিয়েছেন। সামনে রেখেছেন দুটি জলভর্তি গেলাস।

ওমির সঙ্গে যে পুলিশটি এসেছে, তাকে বললেন, এক ঘণ্টা বাদে ঘুরে এসো।

ওমি দাঁড়িয়ে আছে মুখ গোঁজ করে, অবনীভূষণ তার হাত ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে খাও।

ওমি কোনো কথা না বলে দু'দিকে ঘাড় নাড়লো সেই আগের একই ভঙ্গিতে।

অবনীভূষণ বললেন, আমি জানি, তুমি বোবা নও। বোবারা কানেও শুনতে পায় না। আমার সঙ্গে তোমার খেতে আপত্তি কী? আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করছি। তুমি যদি না খাও, তা হলে আমিও খাবো না।

ওমি তবু মুখ তুলে তাকালো না। অবনীভূষণ একটা সিগারেট ধরালেন। তিনি দিনে পাঁচটার বেশি সিগারেট খান না। তার মধ্যে শেষটা রাত্তিরে ঘুমোতে যাবার আগে, সেটা এখনই শেষ করে ফেললেন।

দু'জনেই বসে রইলেন মুখোমুখি। ওমির মুখটা নীচু করা, অবনীভূষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর ওমি একবার মুখ তুলে তাকালো এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে।

অবনীভূষণ মৃদু গলায় বললেন, এবার খাবে?

ওমি আবার মাথা নাড়লো।

অবনীভূষণ বললেন, তাহলে আমারও বসে থাকতে আপত্তি নেই।

আরও কিছু সময় পরে অবনীভূষণ একবার উঠলেন, যদিও তিনি একটা সোয়েটার পরে আছেন, তবু তাঁর শীত করছে। ওমি শুধু একটা সুতির শাড়ি পরেছে। ঘর থেকে দুটি চাদর এনে তিনি একটা নিজে নিয়ে অন্যটা জড়িয়ে দিলেন ওমির গায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে ওমি কান্নায় নুয়ে পড়লো। ফোঁপানির চোটে কাঁপতে লাগলো তার শরীর।

অবনীভূষণ তার মাথায় হাত রেখে বললেন, ভয় নেই, আমার কাছে তোমার কোনো ভয় নেই।

ওমি জলভরা চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, আমার জন্য আপনি খাবেন না কেন? আপনি খান।

অবনীভূষণ এবার হেসে ফেলে বললেন, জানতাম, তুমি পারবে

না। আমাদের দেশের মেয়েরা নিজেরা না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু অন্যদের উপোস সহ্য করতে পারে না। শোনো, আমার বয়েস হয়েছে, এক রাত কিছু না খেলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমার মতন একটা মেয়ে তিন দিন না খেয়ে থাকবে কেন?

ওমি বললো, আমি বাঁচতে চাই না।

অবনীভূষণ বললেন, তুমি আত্মহত্যা করতে চাও? জানো তো, আমাদের দেশে অনেকে না খেয়ে মরে বটে কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা আইনের চোখে অপরাধ? তোমার সঙ্গের অন্য লোকজন কোথায় গেল?

ওমি বললো, আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। আমার কেউ নেই।

অবনীভূষণ খানিকটা অবাক ভাবে বললেন, বাংলাদেশ থেকে তুমি একলা চলে এসেছো? কিংবা কেউ তোমাকে জোর করে ধরে এনেছিল?

ওমি বললো, বাংলাদেশ কোথায় আমি চিনি না।

অবনীভূষণ বললেন, তোমার কথায় বাংলাদেশী টান নেই, তাও ঠিক তা হলে তোমার বাড়ি ছিল কোথায়?

ওমি বললো, আমার কোথাও বাড়ি নেই। এই পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, আমায় কেউ চায় না! আমি মরে গেলে কারুর কোনো ক্ষতি নেই।

অবনীভূষণ বললেন, মরে গেলে শুধু নিজের ক্ষতি। সব মানুষই বাঁচতে চায় নিজের জন্য।

অবনীভূষণের অনেক চেষ্টার পর ওমি আস্তে আস্তে নিজের সব কথা খুলে বললো।

সবটা শোনার পর অবনীভূষণ বললেন, এসো, এবারে আমরা খেয়ে নিই। তুমি তিন দিন কিছু খাওনি তো, আগে একটু চিনির জল খাও। দাঁড়াও, তোমাকে একটু চিনি এনে দিচ্ছি।

ডাকবাংলোর চৌকিদার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল, ও শুনছিল, সে তাড়াতাড়ি চিনি এনে দিল। ওমির কাহিনী শুনে সেও খানিকটা অভিভূত হয়েছে।

সে বললো, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো স্যার? এই বন-জঙ্গল-পাহাড়, এ সব তো ভগবান সৃষ্টি করেছেন। মানুষও ভগবানের

হাতে গড়া। কোনো মানুষ যদি ইচ্ছে মতন জঙ্গলে একা থাকতে চায়, তবু পুলিশ তাকে ধরে কেন?

অবনীভূষণ বললেন, আজকাল কিছুই আর ভগবানের নয়। সবই গভর্নমেন্টের সম্পত্তি। সরকারের জমিতে কেউ এমনি এমনি থাকতে পারে না।

চৌকিদার বললো, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী যে পাহাড়ে থাকে?

অবনীভূষণ বললেন, হুঁ, সাধুরা থাকে, তা ঠিক। কিন্তু এই বয়েসের একটা মেয়ে থাকতে পারবে না।

তারপর তিনি ওমির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি বাঁচবার জন্য এতখানি মনের জোর দেখিয়েছিলে, এখন হেরে যাচ্ছো কেন? মরে যাওয়া তো সোজা। বেঁচে থাকার মধ্যেই মানুষের সবচেয়ে বেশী সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

ওমি বললো, আমি আর পারছি না।

অবনীভূষণ ঝুঁকে তার হাতটা ধরলেন।

এই ভাবে দু'জন মানুষের মধ্যে যোগাযোগ হলো, যারা এসেছে সংসারের একেবারে দুই প্রান্ত থেকে। হাইকোর্টের জজ হিসেবে অবনীভূষণ এক সময় মান সম্মানের দিক থেকে সমাজের একেবারে চূড়ায় ছিলেন, টাকা-পয়সারও কোনো দিন অভাব হয় নি। আর ওমির জীবন প্রায় জন্ম থেকেই বিড়ম্বিত, কেউ তাকে আপন করতে চায়নি। বাবা-মায়ের কাছ থেকেও স্নেহ পায়নি। তবু দু'জনের জীবনের একটা মিল, দু'জনের জীবনই শূন্য!

পুলিশটি ফিরে এসেছে ওমিকে নিতে। অবনীভূষণ তাকে বললেন, এই মেয়েটিকে থানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোনো দরকার নেই। ওকে ভুল করে ধরা হয়েছে। কলকাতার মানুষ আসামের কোনো জায়গায় এসে থাকতে পারবে না, এমন কোনো আইন নেই। মেয়েটি আজ রাতটা সারকিট হাউজেই থাকবে, এখানে অনেক ঘর খালি আছে।

ওমিকে অন্য একটা ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে অবনীভূষণ নিজের বিছানায় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। জীবনে তিনি বহু অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছেন, ফাঁসীর আদেশও দিয়েছেন অন্তত তিন জনকে, কিন্তু কারুকে কি কখনো বাঁচিয়েছেন? তিনি জানেন যে

তাঁর আদালত থেকে এমন অনেক আসামী খালাস পেয়ে গেছে, যারা আসলে অপরাধী, কিন্তু উকিল-ব্যারিস্টারদের কূট যুক্তি জালে তাদের অপরাধ প্রমাণ করা যায় নি।

ওমি মেয়েটির অপরাধ, তার রূপ নেই। মেয়ে হয়ে জন্মালে তার যেন রূপ থাকতেই হবে। জগজীবন রাম কিংবা কামরাজ নামে এক কালে দু'জন নামী মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কেউ ভুল করেও সুপুরুষ বলবে না। পুরুষদের চেহারা কদাকার হলেও সমাজে তাদের চলাফেরা করার অসুবিধে নেই, কিন্তু কুরূপা মেয়েদের সারা জীবন ভরাই বিড়ম্বনা।

রূপ কাকে বলে? এই পরিণত বয়েসে এসে অবনীভূষণ যেন রূপের অন্য অর্থ বুঝেছেন। ওমি নামের এই মেয়েটি যে অসম্ভব মনের জোর দেখিয়েছে, সেই জন্যই যেন তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে। তা ছাড়া তার গায়ের রং কালো হতে পারে, কিন্তু সে তো কুৎসিত নয়। আগে তার স্বাস্থ্যটাও খারাপ ছিল, তার হতভাগ্য বাবা-মা সেটুকু যত্নও নিতে পারেনি!

ওমির সঙ্গে তাঁর আরও কথা বলতে ইচ্ছে হলো। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? বারান্দা পেরিয়ে কোণের ঘরটিতে গিয়ে ওমিকে ডাকবেন বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপরেই তাঁর মনে পড়লো, এত রাতে একটি মেয়ের ঘরে গেলে সবাই তাঁকে লম্পট বলবে নিশ্চিত। অসহায় যুবতী মেয়েদের ওপর অনেকেই এরকম সুযোগ নিতে চায়। অনন্ত দাস ওমির কথা শুনেই বলেছিলেন রেপ কেস!

তিনি চৌকিদারকে ডাকলেন, রূপলাল! রূপলাল!

চৌকিদারটি তখন শুয়ে পড়েছিল, ডাক শুনে উঠে এলো। এই ভালোমানুষ প্রকৃতির জজটিকে সে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে।

অবনীভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, রূপলাল, ওই যে মেয়েটিকে আমি সারকিট হাউজে রেখে দিলাম, এজন্য লোকে কি আমাকে মন্দ বলবে?

চৌকিদার বললো, না স্যার! আমি সাক্ষী দেবো! মেয়েটা অন্য ঘরে শুয়েছে, তাতে দোষের কি আছে? কিন্তু মেয়েটার কী হবে স্যার? ও তো বলছে নিজের বাড়িতে আর ফিরে যাবে না, এখানেই বা থাকবে কী করে?

অবনীভূষণ বললেন, তাই তো আমিও ভাবছি। কী করা যায় বলো তো?

চৌকিদার বললো, আপনার কাছেই রেখে দিন না স্যার। আপনার দেখাশুনা করবে। আপনি তো বললেন, দুনিয়ায় আপনারও কেউ নেই। মেয়েটা আপনার কাছে থাকলে বেঁচে যাবে।

অবনীভূষণ বললেন, আমার কাছে থাকবে? কিন্তু কী ভাবে থাকবে? লোকে বলবে, আমি একটা রিফিউজি মেয়েকে রক্ষিতা রেখেছি। বলবে না?

চৌকিদার বললো, বলুক না যার যা খুশী, তবু তো মেয়েটা বাঁচবে। অন্য কেউ তো বাঁচাতে আসে না। শুধু নিন্দে করতে পারে।

অবনীভূষণ ভুরু কুঁচকে বললেন, আমি যদি ওকে বিয়ে করি? আমাদের দেশে বিয়ে করে নিলেই সব দোষ কেটে যায়!

চৌকিদার বললো, আপনি বিয়ে করবেন স্যার? তা হলে তো খুব ভালো হয়! ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

অবনীভূষণ বললেন, কিন্তু ঐ মেয়েটি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে কী? রূপলাল, তুমি যাও তো, জিজ্ঞেস করে এসো!

চৌকিদার বললো, স্যার, এ কথাটা কি আমার জিজ্ঞেস করা উচিত? আপনি নিজের মুখে বললেই ভালো হয়।

অবনীভূষণ বললো তা হলে চলো। ওকে ডাকো। তোমার সামনেই বলবো। তুমি সাক্ষী থাকবে।

চৌকিদার বললো, স্যার, এত রাতে কি এসব কথা আলোচনা করা ঠিক হবে? বরং কাল সকালে, ধীরে সুস্থে, আমার মনে হয়, এখন আপনি স্যার শুয়ে পড়ুন। বেশি রাত জাগলে আপনার শরীর খারাপ হবে!

অবনীভূষণ এরপর শুতে গেলেন বটে, কিন্তু সারা রাত তার ঘুম এলো না। বিছানায় শুয়ে তিনি উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলেন। ওমি নামে একটি অসহায় মেয়েকে বিয়ে করে তিনি যে খুব একটা মহৎ কাজ করতে যাচ্ছেন, এরকম কথা তাঁর একবারও মাথায় এলো না। তিনি শুধু ভাবলেন, এই মেয়েটিকে নিয়ে

নতুন ভাবে তাঁর জীবন শুরু হবে। যে মেয়ে এত কষ্ট পেয়েও বেঁচে থাকতে পেরেছে, সে তাঁকেও বাঁচার প্রেরণা দেবে।

পরদিন ভোরবেলাতেই সারকিট হাউজে এসে উপস্থিত হলো গুরুং!

এই পর্যন্ত কাহিনীটা বলে বিচারক অবনীভূষণ মিশ্র থামলেন। আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন একটা সিগারেট। আমরা দু'জনেই চুপ করে রইলাম খানিকক্ষণ।

এই কাহিনীর পরিণতিটা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ওমির সঙ্গে অবনীভূষণের জীবন জড়িয়ে যায়নি। অবনীভূষণ এখনও নিঃসঙ্গ জীবনই যাপন করছেন।

আমি একটু পরে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি গুরুং-এর সঙ্গে ওমিকে চলে যেতে দিলেন বুঝি?

অবনীভূষণ বললেন, গুরুং নামে সেই লোকটার একটা চোখ কানা হয়ে গেছে। একটা পাও ভাঙা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। তার শত্রুপক্ষ তাকে বেদম মেরেছে, সে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে আছে। ভবিষ্যতে সে কী করে রোজগার করবে তার কোনো ঠিক নেই। তবু তার সঙ্গে কোনো মেয়ে যায়? বলুন! আমার সঙ্গে যদি থাকতো, ওমির আর ভবিষ্যত নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হত না, আমি মরে গেলেও আমার বিষয়-সম্পত্তি আমার স্ত্রী হিসেবে সে-ই পেত। এই সবই আমি বলেছিলাম তাকে। কিন্তু ওমি গ্রাহ্যই করলো না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, গুরুং এসে কী বললো তাকে?

অবনীভূষণ বললেন, কিছু না। সে দৃশ্যটা আপনি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। বারান্দার ঠিক এই জায়গাটাতেই বসে ছিলাম আমরা সকালবেলা। ওমিকে ঘুম থেকে তুলে আমি আমার সব কথা বলেছি। ওমি হ্যাঁ-না কিছু বলেনি, চুপ করে শুনে যাচ্ছিল, তার চোখ দিয়ে জল পড়ছিল ফোঁটা ফোঁটা। আমি তার হাত ধরে আছি। সে হাত ছাড়িয়ে নেয় নি। রূপলাল গেছে চা করে আনতে। এই সময় সেই কানা গুরুং খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দাঁড়ালো ঐ গেটের ধারে। মুখে কিছুই না বলে শুধু তাকিয়ে রইলো এদিকে।

ওমি প্রথমে তাকে দেখতে পায়নি। আমার দৃষ্টি অনুযায়ী তাকে দেখেই যেন আর্তনাদ করে উঠলো, গুরুং!

তারপর সে লাফিয়ে নেমে গেলো বারান্দা থেকে। গুরুং-এর সারা গায়ে সে হাত বুলোলো, খোঁড়া পা-টা দেখলো। দু'জনে কিছু কথা হলো কিনা আমি শুনতেও পেলাম না।

একবার আমার দিকে ফিরে ওমি বললো, আমরা চলে যাচ্ছি? যাবো?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে ওরা ঐ যে বাগানের রেলিং টপকে নেমে গেল পাহাড়ের দিকে, ওখানে কোনো রাস্তা নেই। তবু কী করে গেল কে জানে! ওরা মিলিয়ে গেল জঙ্গলে। এ পর্যন্ত আর ওদের কেউ দেখেনি।

দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অবনীভূষণ বললেন, রাত্তির-বেলায় এখানে বসে মাঝে মাঝে দূরের পাহাড়ে দেখতে পাই টিপ টিপ করে আলো জ্বলছে। আলো নয়, নিশ্চয়ই কেউ আগুন জ্বালে। হয়তো ঐ রকম কোনো জায়গাতেই ওমি আর গুরুং থাকে। বুঝলেন, জল যেমন জলকে চায়, সেই রকম যৌবনও যৌবনকে টানে। সেই জন্যই ওমি আমার কাছে থাকলো না?

অবনীভূষণের কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা হয়ে এলো। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না, এটা ওমির জীবনের সার্থকতার কাহিনী না বিচারপতি অবনীভূষণের ব্যর্থ প্রেমের গল্প।

———